M.Phil.

আখতার সোবহান খান

RB
B
335.401
KHB
C-3

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯২

M.Phil.

382750

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চার ধারা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের এম. ফিল. ডিগ্রীর
জন্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক : আখতার সোবহান খান

তত্ত্বাবধায়ক : অধ্যাপক হাসনা বেগম

এবং

ডঃ প্রদীপ কুমার রায়

Dhaka University Library
382750

382750

দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৯২

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচী পত্র

		পৃষ্ঠা নং
	ভূমিকা	
প্রথম অধ্যায়		
১.	মার্কসীয় দর্শন ও ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা	১-২৮
১.১	মার্কসীয় দর্শনের পটভূমি	১-১১
১.২	দর্শন ও মার্কসীয় দর্শন	১১-১৭
১.৩	মার্কসীয় দর্শন	১৮-২৩
	মার্কসের দার্শনিক বস্তুবাদ	
	দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি	
	দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূল সূত্র সমূহ	
১.৪	ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা	২৩-২৮
দ্বিতীয় অধ্যায়		
২.	বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন ও মার্কসীয় রাজনীতি বিকাশে মার্কসবাদী রাজনৈতিক দলের ভূমিকা	২৮-৯৯
২.১	বাংলা-ভারতে মার্কসবাদী আন্দোলন বিকাশের রাজনৈতিক পটভূমি	২৮-৩৩
২.২	উপমহাদেশে ও বাংলায় কমিউনিষ্ট আন্দোলনের বিকাশ	৩৪-৪৬
২.৩	বাংলাদেশে মার্কসীয় আন্দোলন	৪৬-৮৫
২.৪	আন্তর্জাতিক পরিসরে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় : বাংলাদেশের কতিপয় মার্কসবাদী দলের অবস্থান	৮৫-৯৯

382750

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

৩. বাংলাদেশে মার্কসবাদ চর্চায় ব্যক্তির ভূমিকা ১০০-১২৪

৩.১ বাংলায় সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদের প্রাথমিক পরিচয় পর্ব ১০০-১০৮

৩.২ বাংলায় মার্কসবাদের সৃজনশীল প্রাথমিক প্রয়োগ পর্যায় ১০৮-১১৪

৩.৩ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট নেতৃত্ব ১১৫-১১৯

৩.৪ বাংলাদেশে মার্কসীয় সাহিত্যের বিকাশ ১২০-১২৪

চতুর্থ অধ্যায়

৪. বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চা ১২৫-১৭৬

৫. উপসংহার ১৭৭-১৮৫

৬. গ্রন্থপঞ্জী ১৮৬-২০৪

৭. পরিশিষ্ট ২০৫

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চার একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে । বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চার ধারা ও তার প্রায়োগিক প্রচেষ্টার অনুসন্ধান করা হয়েছে।

বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চার এই সুদীর্ঘ ইতিহাস থাকলেও এ সম্পর্কে পূর্ণাংগ ও ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হয়েছে বলে মনে হয় না । তবে প্রাপ্ত গ্রন্থ, জার্ণাল, পত্রিকা ও বিভিন্ন মার্কসবাদী দলের ইতিহাস থেকে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে তা থেকেই তথ্যাদি সংগ্রহ ও মূল্যায়ণ করে এ অভিসন্দর্ভটি রচনার চেষ্টা করা হয়েছে ।

প্রথম অধ্যায়ে মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন উদ্ভবের যোগসূত্র খোঁজার মধ্যদিয়ে দ্বান্দ্বিক বস্তুতান্ত্রিক দর্শনকে তুলে ধরা হয়েছে । দর্শনের ইতিহাসের আলোকে মার্কসীয় দর্শনের সাথে অন্যান্য দর্শনের যোগসূত্রগুলি উপলব্ধির মধ্যদিয়ে মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে একটি সামগ্রিক বোধ অর্জন করা সম্ভব । সাধারণ পাশ্চাত্য দর্শনের ধারাবাহিকতায় মার্কসীয় দর্শনের উদ্ভব ঘটলেও পাশ্চাত্য দর্শন থেকে মার্কসীয় দর্শনের কতগুলি বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে তাই পাশ্চাত্য দর্শনের সাথে মার্কসীয় দর্শনের পার্থক্য আলোচিত হয়েছে । মার্কসের বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের সাথে তাঁর ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের একটা সংযোগ রয়েছে । তাই প্রাসংগিক ভাবেই প্রথম অধ্যায়ে ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । এই অধ্যায়ে মার্কসীয় দর্শন বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ এবং ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে মূল বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে ।

মার্কসীয় দর্শন চর্চা বলতে শুধুমাত্র বিমূর্ত ধারণাগত চর্চা বুঝায় না । আর তাই তত্ত্বগত বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার আওতায় ফেলে মার্কসীয় দর্শন চর্চার ইতিহাস উপলব্ধি করা সম্ভব নয় । এ কারণেই মার্কসবাদকে বলা হয়ে থাকে অনুশীলনের দর্শন বা 'Philosophy of praxis'। চিন্তা বা তত্ত্বকে বাস্তব অনুশীলনের মধ্য দিয়ে বাস্তবে অনূদিত করা এবং অভিজ্ঞতার আলোকে চিন্তার যথার্থতা নির্ণয় ও বাস্তবতা থেকে নতুন চিন্তা বিনির্মাণ হলো

Dhaka University Institutional Repository

এর মূল কথা । দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ইতিহাস ঘনিষ্ঠ প্রায়োগিক প্রচেষ্টাকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চা সম্পর্কে কোন পূর্ণাংগ জ্ঞান সম্ভব নয় । এই বিবেচনা থেকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশে মার্কসবাদী বাস্তব সংগ্রাম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক অর্থাৎ মার্কসবাদী রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের প্রধান দিকগুলি সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হয়েছে । বাংলাদেশে মার্কসবাদী রাজনীতির ইতিহাস পর্যালোচনার মধ্যদিয়ে এদেশে কিভাবে মার্কসীয় দর্শন ও মার্কসবাদ চর্চা হয়েছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে ।

এই উপমহাদেশ এক সময়ে অবিভক্ত ছিল । উপমহাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টিও ছিল অবিভক্ত । তাই বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাসের একটা পর্যায় উপমহাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাসের সাথে অবিচ্ছিন্ন । ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে প্রসংগক্রমে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অতীত ইতিহাস থেকেই শুরু করতে হয়েছে । এতে করে বাংলাদেশে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রবণতা সমূহের যোগ সূত্র ও সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাবে । মার্কসবাদী চিন্তার বর্তমান পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের কয়েকটি মার্কসবাদী রাজনৈতিক দলের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে । সামগ্রিকভাবে এই অধ্যায়ে একটি দিক নির্দেশনাও খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে ।

কেবলমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক বা মার্কসবাদী রাজনৈতিক দলের তৎপরতার ইতিহাসের দিক দেখাটা খণ্ডিত হয়ে পড়ে । মার্কসবাদী রাজনৈতিক দলের বাইরেও অনেক মার্কসীয় চিন্তাবিদ বাংলাদেশে মার্কসবাদী চিন্তার বিকাশে ভূমিকা রেখেছেন । তাদের অনেকেই যেমন দলীয়ভাবে তৎপর ছিলেন, দলের বাইরেও আবার তাদের বিশেষ ব্যক্তিগত উদযোগ ও ভূমিকা রয়েছে । আবার কেউ কেউ সরাসরি কোন দলভুক্ত না হয়েও মার্কসীয় চিন্তার বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন । এ সকল বিবেচনা থেকে পূর্ণাংগতার প্রত্যাশায় তৃতীয় অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তাকারে বাংলাদেশে মার্কসীয় চিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চার পর্যালোচনা করা হয়েছে। মার্কসবাদের বহুবিধ দিক রয়েছে। কিন্তু এ অধ্যায়ে মার্কসীয় দর্শন চর্চা আলোচনার ক্ষেত্রে বিষয় বস্তুর দিক থেকে কেবলমাত্র মার্কসীয় দর্শন সংক্রান্ত কিম্বা দর্শন সম্পর্কিত বা দর্শন ঘনিষ্ঠ বিষয়গুলোকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সংক্রান্ত বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত রচনাবলীর পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চার বিভিন্ন ধারা ও প্রবণতাসমূহকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কালিক দিক থেকে ১৯৭১ সালের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মার্কসীয় দর্শন বিষয়ে প্রকাশিত রচনাবলীর পর্যালোচনা করা হয়েছে। তদুপরি স্বাধীনতা পূর্বকালীন মার্কসীয় দর্শন সংক্রান্ত রচনাবলী সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এবং তা কেবল প্রসংগক্রমেই আলোচনার মধ্যে এসেছে। এ অধ্যায়ে মার্কসীয় দর্শন সংক্রান্ত রচনাবলীর আলোচনা পর্যালোচনার সাথে প্রাসংগিক সমালোচনা তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চার ধারা ও প্রবণতা সমূহকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

গবেষণার মধ্যদিয়ে নিম্নলিখিত যে তিনটি সিদ্ধান্তকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে তা হল ঃ

১. বাংলাদেশে মার্কসবাদ প্রধানত একটি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মতবাদ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। দর্শন হিসেবে গ্রহণ ও চর্চা হয়েছে কম।

২. বাংলাদেশে মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ চর্চার ক্ষেত্রে স্থূল বস্তুবাদ, দ্বৈতবাদ ও একত্ববাদ এই তিনটি ধারা বিদ্যমান। বাংলাদেশে মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ চর্চার নামে স্থূলবস্তুবাদ চর্চা হয়েছে বেশী। বাংলাদেশে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের নামে এই স্থূল বস্তুবাদই প্রধান আধিপত্যশীল ধারা।

৩. বাংলাদেশে মার্কসবাদের নামে স্থূল বস্তুবাদী ধারার প্রাধান্যের কারণে চিন্তার পদ্ধতির মধ্যেও একটি যান্ত্রিক প্রকরণ গড়ে ওঠেছে। ফলে বাংলাদেশের মার্কসীয়

Dhaka University Institutional Repository

চর্চার মধ্যে স্থূল বস্তুবাদীতার প্রভাবে তার রাজনৈতিক প্রতিফলন হিসেবে মার্কসবাদী রাজনীতিতে ঐতিহাসিক নির্ধারণবাদ, অদৃষ্টবাদ, যান্ত্রিকতা, সরলীকরণ, শাস্ত্রবদ্ধতা, গোঁড়ামী, অনুকরণীয়তা প্রভৃতি নানাবিধ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে বাংলাদেশের মার্কসবাদী ধারার মধ্যে চিন্তার সৃজনশীল পর্যালোচনামূলক চিন্তাশীল ধারা শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি বলে মনে হয়।

এই অভিসন্দর্ভ রচনার ব্যাপারে আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক হাসনা বেগম ও ডঃ প্রদীপ কুমার রায় আমাকে তাঁদের মূল্যবান সময় দিয়ে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন, নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন, গবেষণা সম্পূর্ণ করতে আমাকে সক্ষম করে তুলেছেন। আমি তাঁদের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি।

বিভাগীয় শিক্ষক অধ্যাপক ডঃ আবদুল মতীন, অধ্যাপক ডঃ আবদুল জলিল মিয়া, ডঃ কাজী নুরুল ইসলাম, ডঃ শাজাহান মিয়া, জনাব হারুন রশীদ প্রমুখ অভিসন্দর্ভটি রচনার সময় আমাকে নানাভাবে পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। আমি তাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

গবেষণা-কর্ম চলাকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ও পি.এইচ.ডি গবেষকদের মধ্যে নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, আবদুল্লাহ আল মামুন, কালী প্রসন্ন, ফরিদ আহমেদ, মুহাম্মদ সামাদ, মোবাশ্বেরা খানম, আবদুল খালেক, জামাল চৌধুরী প্রমুখের সাহচর্য ও পরামর্শ আমাকে প্রতিদিনই অনুপ্রাণিত করেছে।

গবেষণাকালীন সময়ে আমার অনেক বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী আমাকে প্রেরণা দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন। তাদের অনেকের মধ্যে রতন সরকার, মনোয়ারা মনু, খায়রুল আনাম শাহীন, নাহিদ জামাল রিয়ানন, সুলতানা সাদেক পলি উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণাকালীন সময়ে যাঁদের অসামান্য সহযোগিতা ছাড়া এ কাজ সম্পূর্ণ হতো না তারা হলেন জনাব আনোয়ার হোসেন ও আমার বোন শাহনাজ খান ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরীর কর্মকর্তাবৃন্দ ও কর্মচারীবৃন্দ দীর্ঘ সময় আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন । তাঁদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগারিক ডঃ সিরাজুল ইসলাম, রিসার্চ অফিসার ময়েজউদ্দিন খান, মোহাম্মদ আমানউল্লাহ, রতন কুমার দাস, মজিবর রহমান, আবুল কাশেম বকাউল প্রমুখের নাম উল্লেখ করতে হয় । অভিসন্দর্ভটি যত্নসহকারে টাইপ করেছেন জনাব মাইনউদ্দিন ।

আখতার সোবহান খান
(আখতার সোবহান খান)

দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তাং- ২৭-১০-৯২

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

মার্কসীয় দর্শন
ও
ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

১. মার্কসীয় দর্শন ও ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা

১.১ মার্কসীয় দর্শনের পটভূমি

যে কোন দার্শনিক চিন্তাই তার পূর্ববর্তী চিন্তার বিকাশ প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় উদ্ভূত হয়। দর্শনের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় যে, তার পূর্ববর্তী দর্শনকে নাকচ করে অথবা সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পরবর্তী দার্শনিক চিন্তার অভ্যুদয় ঘটেছে। তেমনি-ভাবে মার্কসীয় দর্শনের উদ্ভবের একটি দার্শনিক ও সামাজিক পটভূমি রয়েছে।

চিরায়ত জার্মান দর্শন, বৃটিশ অর্থশাস্ত্র ও ফরাসী সমাজতন্ত্র এই তিনটি উৎস ও তার মর্মমূল অনুসন্ধান করে যে নির্যাস বেরিয়ে আসে, সে পটভূমির উপরই উৎপত্তি ঘটে মার্কসীয় দর্শনের। এ প্রসংগে ভ.ই. লেনিন বলেন - "উনিশ শতকের এই তিনটি প্রধান ভাবাদর্শগত প্রবাহের ধারাবাহক ও প্রতিভাধর পূর্ণতা সাধক হলেন মার্কস।"[১]

মার্কসের দর্শন হলো বস্তুবাদী দর্শন। কিন্তু এই বস্তুবাদী দর্শন নতুন কিছু নয়, দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এই বস্তুবাদী দার্শনিক চিন্তা-ধারা গ্রীক দর্শনে বিদ্যমান ছিল। তাই বস্তুবাদ কার্ল মার্কসের আবিষ্কার নয়। এক ঐতিহাসিক ধারায় বস্তুবাদ মার্কসীয় দর্শনে পূর্ণতা পেয়েছে। "মার্কসবাদ হলো সমকালীন বস্তুবাদ, জগৎ সম্পর্কে যে- দৃষ্টিভংগীর বুনিয়া প্রাচীন গ্রীসে ডেমোক্রিস্টাস এবং অংশত তাঁর পূর্ববর্তী আইওনীয় চিন্তানায়করা স্থাপন করেছিলেন, বর্তমানে তারই বিকাশে সর্বোচ্চ সুর। হাইলোজোইজম নামে যা পরিচিত, তা সরল বস্তুবাদ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। বর্তমান কালের বস্তুবাদ বিশদীকরণের প্রধান কৃতিত্ব সন্দেহাতীত ভাবেই কার্ল মার্কস ও তাঁর বন্ধু ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের।"[২] উল্লেখ্য যে, গ্রীক দর্শনের যাত্রায় বস্তুবাদী চিন্তাধারা দিয়ে শুরু হলেও ডেমোক্রিস্টাসের পরবর্তীকালে বেকন পূর্ব দর্শনে বস্তুবাদী ধারা তেমন লক্ষ্য করা যায়নি। এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের বক্তব্যে, "সপ্তদশ শতক থেকে শুরু করে আধুনিক সমস্ত বস্তুবাদেরই আদি

---

১. ভ.ই. লেনিন, "কার্ল মার্কস", মার্ক্স এঙ্গেলস - মার্কসবাদ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৬৯, পৃ. ১০।

২. গেওর্গি প্লেখানভ, মার্কসবাদের মূল সমস্যা, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪, পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি হলো ইংল্যান্ড। বস্তুবাদ গ্রেট বৃটেনের আত্মজ সন্তান . . . ইংরেজী বস্তুবাদের আসল প্রবর্তক হলেন বেকন। তাঁর কাছে প্রাকৃতিক দর্শনই হলো একমাত্র সত্য দর্শন।"[১]

ফ্রান্সিস বেকন আধুনিক বস্তুবাদের স্রষ্টা। তাঁর বস্তুবাদ ছিল অবিকশিত। কিন্তু একটা সর্বাঙ্গীন বিকাশের সম্ভাবনা বেকনের বস্তুবাদে ছিল। বেকন মনে করতেন "প্রকৃতির পথানুসারী ও প্রকৃতি-রাজ্যের বিশ্লেষক হিসেবে মানুষ বিশ্ব প্রকৃতির যতটুকু পর্যবেক্ষণ করেছে ও চিন্তা করেছে, ঠিক ততটুকু মাত্র তার বোধ্য ও অধিগম্য, এর বাইরে আর সব কিছুই তার অবোধ্য ও অসাধ্য"। [২]

বেকনের বস্তুবাদ ছিল একপেশে এবং অবিকশিত। বেকনের বস্তুবাদ অ্যাফরিজমের ধর্মীয় প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। অনুসন্ধান প্রক্রিয়া থেকে তিনি ধর্ম তত্ত্বকে বিযুক্ত করতে চেষ্টা করেন। এ প্রসংগে প্রখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন-" **He accepted orthodox religion . . . . he thought that reason could show the existence of God . . . "**[৩]

বেকনের এই সুবিরোধী, অবিকশিত ও একপেশে বস্তুবাদকে সুসংহত রূপ দেন টমাস হবস। হবস ছিলেন অভিজ্ঞতাবাদী এবং গণিতের বিমূর্ত পদ্ধতিতে আস্থাবান। জ্ঞানের ক্ষেত্রে হবস মনে করতেন বাহ্য জগতের, দৈহিক বস্তুর প্রত্যক্ষণ থেকে যে সংবেদন উৎপন্ন হয় সে সব নিয়েই দার্শনিক কাজ শুরু হয়। হবস অদৈহিক কোন বস্তুর জ্ঞান সম্ভব নয় বলে মনে করতেন। অদৈহিক কোন কিছুর অস্তিত্ব হবস স্বীকার করেন নি। কিন্তু হবস গণিতের বিমূর্ত পদ্ধতিতে আস্থাবান থাকায় তার মধ্যে একটা বৌদ্ধিক প্রবণতা ছিল।

---

১. ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, "ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র" কার্লমার্কস-ফ্রেডারিক এঙ্গেলস রচনা সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২, পৃ. ৯২।

২. ফ্রান্সিস বেকন, "নোভাম অর্গানম" বিজ্ঞানের দার্শনিক স্যাকস কামিংস ও রবার্ট এন লিনস্কট (সম্পাদিত)। অনুবাদ - ফজলুল করিম, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫, পৃ. ৪৭।

৩. **Bertrand Russell, History of Western Philosophy. London, George Allen & Unwin Ltd., 1975, p. 527.**

Dhaka University Institutional Repository

হবস বেকনের বস্তুবাদকে গুছিয়ে তুললেও ইন্দ্রিয়ের জগৎ থেকেই যে সমস্ত মানবিক জ্ঞানের উদ্ভব ঘটে, বেকনের এই মূল প্রতিপাদ্যকে প্রমাণ করেননি। বেকনের এই মূল নীতিকে প্রমাণ করেন জন লক তাঁর 'An Essay Concerning Human understanding' গ্রন্থে। বুদ্ধিবাদীরা, বিশেষকরে রেঁনে ডেকার্ট মনে করেন যে, মানুষ কতগুলি সহজাত ধারণা নিয়ে জন্মায়। এসব সহজাত ধারণা আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাই না। কিংবা কল্পনার সাহায্যে সৃষ্টি করি না। জন্ম থেকেই এসব ধারণা মানুষের মনে মুদ্রিত থাকে।সহজাত ধারণার মূল কথা হলো," Our knowledge is based upon certain innate principles, which are supposed to be "Stamped upon the mind of man"[১]

ডেকার্ট সহজাত ধারণা নীতিকে সুসংবদ্ধ রূপ দেন। কিন্তু সহজাত ধারণা বিষয়টি ডেকার্ট পূর্ব দার্শনিকদের মধ্যেও ছিল। "প্লেটো থেকে শুরু করে ডেকার্ট পর্য্যন্ত বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা ধরে নিয়েছেন যে, সত্য (অন্ততঃ অধিবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের সত্যাবলী) মানব মনের সহজাত সম্পদ। তাঁরা এও মনে করেছেন যে, বুদ্ধি বা প্রজ্ঞাই জ্ঞানানুশীলনের একমাত্র উৎস এবং প্রজ্ঞার সাহায্যে মানুষ তার সহজাত ধারণাবলীর জ্ঞান পেতে পারে। প্রজ্ঞার সাহায্যে সহজাত ধারণা থেকে এ জ্ঞান সুনিশ্চিত ও সর্বজন স্বীকৃত জ্ঞান।"[২] জন লক ডেকার্টের সহজাত ধারণা খণ্ডন করে বলেন, মানব মন কোন পূর্ব ধারণা নিয়ে জন্মায় না। জন্মের সময় মন থাকে একটি অলিখিত সাদা কাগজ" (Tabula Rasa)-এর মত। অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই শূন্য মনে ধারণা ও জ্ঞান জমা হতে থাকে। এ থেকে জন লক বলেন, 'বুদ্ধিতে এমন কিছু নেই, যা আগে ইন্দ্রিয়ে ছিল না'- এ হলো সহজাত ধারণার বিরুদ্ধে লকের অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞান সূত্র। লক সহজাত ধারণার বিরুদ্ধে আরো মনে করেন, বিভিন্ন পরিবেশ, এমনকি একই পরিবেশে বিভিন্ন জনের ধারণা বিভিন্ন রকম, কিন্তু ধারণা সহজাত হলে তা সর্বজনীন হতো। আবার সর্বজনীন হলেই কোন ধারণা সহজাত হবে এমন কথা বলা যাবে না বলেও লক মনে করতেন।

---

১. Frank N. Magill, Masterpieces of world philosophy. London, George Allen & Unwin Ltd. 1963, p. 429.

২. আমিনুল ইসলাম, আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন, বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৪, পৃ. ১৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্দশ শতকে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার সমাজ ও অর্থনীতিতে যেমন বিরাট পরিবর্তন সাধন করেছিল তেমনি শিল্প - সাহিত্য এবং দর্শনেও এক বিরাট বৈপ্লবিক উত্তরণ ঘটিয়েছিল । এই নবতর উন্মেষের সম্মিলন ঘটেছিল রেঁনেসাঁয় । রেঁনেসাঁ-এই মহান যুগটি থেকে আধুনিক প্রকৃতি বিজ্ঞানের একটা সার্বিক বিকাশ ঘটতে থাকে । অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞানের আরও ব্যাপক বিকাশ ঘটলেও বিজ্ঞান তখনও ধর্মতত্ত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে নি ।

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জমিদারতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে উত্থান ঘটে ব্যবসায়ী মধ্য শ্রেণীর, যারা বুর্জোয়া শ্রেণী হিসেবে সমধিক পরিচিত । মধ্যযুগীয় গোঁড়া খ্রীষ্টান চার্চের কু-সংস্কারাচ্ছন্ন খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের নিগড় ভেংগে সমাজ ও দর্শন বেরিয়ে আসে এক নতুন মুক্ত স্বাধীন চিন্তার জগতে । দর্শন চার্চের শৃংখল থেকে মুক্তি লাভ করে, এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটে ।

বেকনের হাতে ইংল্যাণ্ডে আধুনিক বস্তুবাদের পত্তন ঘটলেও পরবর্তীতে ইংল্যাণ্ডে এ ধারার আর তেমন কোন বিকাশ লক্ষ্য করা যায় না । পরবর্তীকালে এই বস্তুবাদী দর্শনের বিকাশ ঘটে ফ্রান্সে । ফ্রান্সে ডেকার্টীয় দার্শনিক চিন্তাধারার বস্তু তথা পদার্থ বিদ্যা সম্পর্কে ধারণা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ডেকার্ট বিস্তৃতিকেই পদার্থের মূল ধর্ম বা মূল তত্ত্ব বলে অভিহিত করেন । ডেকার্টের কাছে পদার্থ বা দেহ হচ্ছে - " The body is part of mechanical nature "[১]

---

১. Paul Edwards (ed.), The Encyclopedia of Philosophy, Vol. 2, complete and Unabridged, Macmillan Publishing co., Inc. The free press, New York, Collier Macmillan publishers, London, p. 353.

Dhaka University Institutional Repository

ফরাসী বস্তুবাদ উৎপত্তির যোগসূত্র মার্কস খুঁজে পেয়েছিলেন ডেকার্টের পদার্থের ধারণা ও জন লকের ধারণা সংএশনু মতবাদের মধ্যে। ডেকার্টের দর্শনে পদার্থের ধারণা ও তার সাথে ফরাসী বস্তুবাদের যোগসূত্র সম্পর্কে মার্কস বলেন, **"Descartes in his physics endowed matter with self creative power and conceived mechanical motion as the manifestation of its life. He completely separated his physics from his metaphysics, with in his physics, matter is the sole substance, the sole basis of being and of knowledge. Mechanical French materialism adopted Descartes' Physics in opposition to his metaphysics"** [১]

দর্শনের ইতিহাসে, ফরাসী দর্শনে ডেকার্টের পদার্থ বিদ্যার ধারণা যেমন আলোচিত ও প্রভাবিত করেছে দার্শনিকদের, তেমনি তার সহজাত ধারণা বিষয়ক আলোচনাও দার্শনিকগণ গুরুত্বের সংগে বিবেচনা করেছেন। জন লক ডেকার্টের সহজাত ধারণার বিরুদ্ধে প্রমাণ করেছেন যে, কোন সহজাত ধারণা নেই। জন লকের এই শিক্ষাকে ফরাসী বস্তুবাদীরা গ্রহণ করে তাকে আরো সুসংহত রূপ দেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ফরাসী বস্তুবাদ ডেকার্টের পদার্থের ধারণা ও জন লকের সহজাত ধারণা বিরোধী অভিজ্ঞতামূলক ধরণা - এই দুই দার্শনিক চিন্তাধারা থেকে উৎপত্তি ঘটে ফরাসী বস্তুবাদের।

---

১. Karl Marx and Frederick Engles, "The Holy Family" Karl Marx Frederyick Engels collected works, Progress Publishers, Moscow, 1975, Vol. 4, p. 125.

Dhaka University Institutional Repository

ফরাসী বস্তুবাদীরা ছিলেন সংবেদনবাদী। ফরাসী বস্তুবাদ সংগত ভাবেই সেই সময়ের বিজ্ঞানের যতটুকু অগ্রগতি হয়েছিল তাকে অতিক্রম করতে পারেনি। ফরাসী বস্তুবাদের মধ্যে যুগের বা কালের সীমাবদ্ধতা প্রতিফলিত হয়েছে। ফরাসী বস্তুবাদীরা ছিলেন যান্ত্রিক বস্তুবাদী, মার্কস একে বলেছেন আধিবিদ্যক বস্তুবাদ (**Metaphysical materialism**) বা ইতর বস্তুবাদ (**Vulgar materialism**)। ফরাসী বস্তুবাদীরা মূলতঃ ছিলেন যান্ত্রিক। এই যান্ত্রিক বস্তুবাদ মানব রূপকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়নি। ফরাসী বস্তুবাদের বৈশিষ্টগুলি হল ঃ

(ক) ফরাসী বস্তুবাদীরা মানব ক্রিয়াকে সংবেদনে পর্যবসিত করেন;

(খ) বস্তু, বাস্তবতা ও সংবেদনকে ফরাসী বস্তুবাদ বিষয় হিসাবে গুরুত্ব দিয়েছে, কর্তার দিক থেকে দেখেনি;

(গ) ফরাসী বস্তুবাদীরা সব কিছুকেই বস্তুতে পর্যবসিত করেছেন, এবং

(ঘ) ফরাসী বস্তুবাদীরা বস্তুর গতির নিয়মকে ব্যাখ্যা করতে পারেননি।

অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের পরই দেখা যায় নতুন জার্মান দর্শন। এই জার্মান দর্শনের পরিণতি হল হেগেল। হেগেল ছিলেন ভাববাদের দিকপাল। দর্শনের ইতিহাসে হেগেলের দর্শন বিরাট প্রভাব তৈরী করতে সক্ষম হয়। হেগেলের দর্শনের প্রধান গুণ ছিল যুক্তির উচ্চতম ধরণ হিসাবে দ্বান্দ্বিকতার পুনঃপ্রবর্তন করা। হেগেলের মতে বাস্তব জগত হলো 'চিন্না' (**Spirit**)-এর প্রকাশ বা প্রতিমূর্ত রূপ। প্রকৃতি, সমাজ, মানবিক বুদ্ধিবৃত্তি, মানুষের ইতিহাস হলো এই চিন্নার প্রতিমূর্তকরণ। হেগেলের কাছে চিন্না হলো কর্তা, উদ্দেশ্য বা সত্তা। হেগেল চিন্নাকেই বাস্তব জগতের মহা নির্মাতা হিসাবে দেখেছেন। প্রপঞ্চও মনেরই অভিপ্রকাশ। হেগেল দেখাতে চেয়েছেন কি করে মন তার নিজকে প্রমূর্ত করে তোলে। কিভাবে বিষয় ও বিষয়ীয় সম্মিলন ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

হেগেলের সত্তা হলো 'চিন্তা' (**Spirit**) এবং হেগেলের সত্তা (**Being**) হলো অনির্ধারিত । হেগেলের ভাষায় এই সত্তা হলো " **Pure Being without any further determination** ".[১] এটা হচ্ছে শুরু । এই অনির্ধারিত বা নির্গুণ সত্তার ধারণা হচ্ছে মৌল ধারণা । কিন্তু অনির্ধারিত স্থিতি অবস্থায় সত্তা থাকতে পারে না । সত্তা থেকে তৈরী হয় অসত্তার (**Not Being or nothing**) । এই অসত্তাই হলো গতি । অসত্তা হলো " **Nothing, pure nothing : It is simple equality with itself, complete emptiness, without determination or content : undifferentiatedness in itself.**" [২] বিরুদ্ধতা সম্পন্ন সত্তা অ-সত্তার বিরোধ থেকে ঘটে পরিবর্তন । এই পরিবর্তনকে হেগেল বলেছেন **'Becoming'** সত্তা ও অ-সত্তার বৈপরিত্য থেকে ঘটে পরিবর্তন । তেমনিভাবে গুণ থেকে বিপরীত পরিমাণের উৎপত্তি ঘটে । এবং এই দুইয়ের সংযুক্তি থেকে নতুন মাত্রার উদ্ভব হয় । হেগেলের দর্শনে বিপরীতের একত্ব থেকে পরিবর্তনে নতুনের উদ্ভব ঘটে । হেগেল এগুলিকে নয়, **Thesis**) প্রতিনয় (**Antithesis**) ও সমন্বয় (**Synthesis**) হিসেবে দেখিয়েছেন । প্রতিক্ষেত্রেই নয়, প্রতিনয়, থেকে সমন্বয়ের ত্রয়ী (**Triad**) পাওয়া যায় । হেগেল এদের সম্পর্ককে যৌক্তিক ও অনিবার্য হিসেবে দেখেছেন । এই বিপরীতের একত্ব ও পরিবর্তন হেগেলের দর্শনের কেন্দ্রীয় ভিত্তি । এটাই তার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ।

হেগেল তার **'Phenomenology of Mind'** গ্রন্থে মন বা চিন্তা কি করে নিজকে আত্মীকরণের মধ্যদিয়ে পরম সত্যে উপনীত হয় তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন । মনের এই অভিপ্রকাশকে কয়েকটি সুরে দেখিয়েছেন, এগুলো হলো :

১। চেতনার সুর (**the stage of consciousness**);

---

১. George W.F.Hegel, Hegel's Science of Logic. Trans by W.H. Johnston, B.A., and L.G. Struthers, M.A., London, George Allen & Unwin Ltd., New york, The Macmillan Company, Third Impression, 1961, Vol. 1, p. 94

২. Ibid., p. 94.

Dhaka University Institutional Repository

২। আত্ম সচেতনতার স্তর (**the stage of self consciouness**);

৩। যুক্তির স্তর (**the stage of Reason**);

৪। পরম সত্যের স্তর (**the stage of Absolute knowledge**).

হেগেলের মতে মনের এই বিকাশের মাধ্যম হলো যুক্তি বিজ্ঞান। মন যুক্তিবিজ্ঞানের বিশুদ্ধ অনুধ্যানী প্রক্রিয়ায় তার বিকাশ শুরু করে আত্ম সচেতন ও আত্ম আত্মীকরণ (**self comprehending**) মাধ্যমে দার্শনিক বা বিশুদ্ধ বিমূর্ত মন (**Absolute abstract mind**) পরমসত্যে (**Absolute knowledge**) উপনীত হয়। হেগেলের মতে বিমূর্ত চিন্তার বহিঃস্থতা (**Externality**) হলো প্রকৃতি। প্রকৃতি হলো মনের আত্মনিয়োজন (**Its self loss**) এবং চিন্তা প্রকৃতিকে আত্মস্থ করে তার বহিঃস্থকরণ ভংগীতে। আত্মবিচ্ছিন্ন বিমূর্ত চিন্তা (**Alienated abstract thinking**) হচ্ছে জগৎ ও প্রকৃতি।

চূড়ান্ত পর্যায়ে মন তার উৎস বিন্দুতে প্রত্যাবর্তন করে। চিন্তা নৃতাত্ত্বিক, প্রপঞ্চগত, রূপগত, মনস্তাত্ত্বিক, নৈতিক, শৈল্পিক ও ধর্মীয় মনরূপে নিজেই (**itself**) বৈধতা পায়না, যতক্ষণ সে তার আত্ম কে খুঁজে না পায়, পরমজ্ঞানে (**Absoute knowledge**) বিমূর্ত মনে (**Abstract mind**)।

এইভাবে অস্তিত্বমান ধরণ ও তার বিনিয়োজিত চেতনার (**conciousness embodiment**) মধ্যে সম্মিলন ঘটে। হেগেলের মতে অস্তিত্বমান ধরণের সত্যিকার রূপ হচ্ছে বিমূর্তকরণ (**Abstraction**)। হেগেলের বিচ্ছিন্নকরণ প্রক্রিয়া হলো আত্ম-অসচেতন (**In itself**) স্তর থেকে আত্ম-সচেতন (**for itself**) স্তরে উত্তরণ।

Dhaka University Institutional Repository

হেগেল সমাজ ইতিহাসকে দেখেছিলেন মনের প্রমূর্তকরণের এক যৌক্তিক প্রক্রিয়া হিসাবে। হেগেল বলেন "... **that the history in question has constituted the rational necessary course of the world spirit ...**" [১]

হেগেল তার দর্শনে কতগুলি যুগানুকারী প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। তাঁর উত্থাপিত প্রশ্ন দর্শনের ইতিহাসে এক বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। এংগেলস এর মতে " হেগেলের দর্শন যে সমস্যা তুলে ধরেছিল তার সমাধান সে দর্শন দিতে পারেনি, সেটা বড় কথা নয়। হেগেলের দর্শনে যুগানুকারী অবদান এই যে, হেগেল সমস্যাকে নির্দিষ্ট করেছিলেন।" [২]

হেগেলের দর্শনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ছিল ফরাসী বিপ্লব। ফরাসী বিপ্লবে' যুক্তির অমোঘ মানদণ্ড' (**Reason right**) প্রতিষ্ঠার যে তাড়া ছিল হেগেলের দর্শনে ফরাসী বিপ্লবের সেই অনুস্থ রাজনৈতিক যুক্তির একটা সম্মিলন ঘটেছিল। "**Hegel himself related his concept of reason to the French Revolution, and did so with the greatest of emphasis**". [৩]

হেগেলোত্তর নৃতাত্ত্বিক বস্তুবাদী ফয়েরবাখ হেগেলের ভাববাদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। ফয়েরবাখ হেগেলকে উল্টে দিয়ে বলেন, সত্তা হলো কর্তা আর চিন্তা হলো কর্ম। সত্তা নিয়ন্ত্রন করে চিন্তাকে, চিন্তা সত্তাকে নয়। সত্তা হলো উদ্দেশ্য। সত্তা নিজের দ্বারাই নিরূপিত হয়, সত্তার ভিত্তি তার নিজেরই মধ্যে, বাইরে নয়।

---

১ **George W.F. Hegel, Philosophy of History, Great Books of the Western world, William Benton Publishers, Encyclaopaedia Britannica, Inc., 1952, Vol. 46, p. 157.**

২. এফ. এঙ্গেলস, এ্যান্টি ডুরিং, সরদার ফজলুল করিম অনুদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২০।

৩. **Herbert Marcuse, Reason and Revolution, Routledge and Kegan Paul Ltd., London, 2nd Edition, 1964. p. 5.**

Dhaka University Institutional Repository

এইভাবে হেগেলের ভাববাদকে উল্টে দিয়ে ফয়েরবাখ বস্তুবাদের ধারণা দাঁড় করালেন । "সত্তা ও চিন্তার মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে এই অভিমত, মার্কস ও এঙ্গেলস যাকে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার বুনিয়াদ করেছিলেন, তা হেগেলের ভাববাদের সমালোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুকূল, ফয়েরবাখ ইতিমধ্যেই প্রধান প্রধান বিষয়ে সেই সমালোচনার কাজ সম্পূর্ণ করেছিলেন ।"[১]

ফয়েরবাখ তাঁর দর্শনে মানবতা, নৈতিকতা, প্রেম এসব প্রসংগে বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন । কিন্তু ফয়েরবাখের ইতিহাস চেতনা ও মানুষ সম্পর্কে তাঁর ধারণা বস্তুবাদী হয়ে ওঠেনি । আধারের (Content) দিক থেকে ফয়েরবাখ বস্তুবাদী হলেও মানুষ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল বিমূর্ত মানুষের ধারণা । ফয়েরবাখ মানুষকে দেখেছেন বিমূর্তভাবে, ইতিহাস বিযুক্তভাবে । এ প্রসংগে ফ্রেডারিক এংগেলস বলেন, " ফয়েরবাখের অমূর্ত মানুষ থেকে বাস্তব জীবন্ত মানুষে পৌঁছুবার একমাত্র উপায় হলো তাকে ইতিহাসের অংশ হিসাবে দেখা ।"[২]

ফয়েরবাখ বস্তুবাদকে দাঁড় করিয়েছিলেন কিন্তু বিকাশের দ্বান্দ্বিক নিয়মটি তিনি ধরতে পারেন নি । আর এই জায়গাটিতেই থেকে গিয়েছিল তাঁর বস্তুবাদের মূল দূর্বলতা । তা সত্ত্বেও " মার্কস যদি হেগেলের অধিকারের দর্শনের সমালোচনা করে ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর বস্তুবাদী ব্যাখ্যার বিশদীকরণ করে থাকেন, তা তিনি করতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র এই কারণে হেগেলের দূরকল্পী দর্শন সম্পর্কে ফয়েরবাখ তাঁর সমালোচনা সম্পূর্ণ করেছিলেন ।"[৩]

হেগেলের দ্বান্দ্বিকতা ও ফয়েরবাখের বস্তুবাদ এই দার্শনিক ভিত্তির উপর গড়ে উঠে মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ।

---

১. গেওর্গি প্লেখানভ, মার্কসবাদের মূল সমস্যা, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮০, পৃঃ ১৮, ১৯ ।

২. ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, " ল্যুদভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান," কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস রচনা সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২, পৃ. ৬৪ ।

৩. গেওর্গি প্লেখানভ, মার্কসবাদের মূল সমস্যা, পৃ. ২২-২৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রীক বস্তুবাদ থেকে শুরু হয়ে বৃটিশ বস্তুবাদ, বৃটিশ বস্তুবাদ থেকে ফরাসী বস্তু-বাদ এবং পরবর্তীতে চিরায়ত জার্মান দর্শনে হেগেলের দর্শনের বিশ্বকৌষিক ব্যাপ্তি, তার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি এবং হেগেলের ভাববাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে ফয়েরবাখ কর্তৃক বস্তুবাদের ভিত্তি পত্তন, ফয়েরবাখের দর্শনের সীমাবদ্ধতা মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীদর্শনের উন্মেষের পথ করে দেয় ।

এ কারণেই বলা যায়, চিন্তার ইতিহাস বিচারে মার্কসীয় দর্শন উদ্ভবের প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই তার পূর্ববর্তী দর্শনের মধ্যেই তৈরী হয়েছিল ।

কার্ল মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন উদ্ভবের পটভূমির উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা দর্শন ও মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করবো ।

১.২ দর্শন ও মার্কসীয় দর্শন

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্নে মানুষের কৌতুহল থেকে দর্শনের উৎপত্তি । যুক্তির বিচারে, বুদ্ধির আলোকে দার্শনিকরা এসব সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে গড়ে তুলেছেন দর্শনের সুদীর্ঘ ইতিহাস । দর্শনের প্রাথমিক উন্মেষ ঘটেছিল প্রাচীন গ্রীসে । প্রাচীন গ্রীক দর্শন ও সংস্কৃতি পরবর্তীতে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন বিকাশে এক ঐতি-হাসিক ভূমিকা রেখেছে । গ্রীক দার্শনিকরা দর্শনের সেই শুরুর পর্যায়ে দর্শনকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন ' জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ ' বলে । কিন্তু পরবর্তীকালে দর্শনের ইতিহাসের বিকাশ ও সমৃদ্ধি দর্শনকে দেখবার বিচিত্র দৃষ্টিভংগী ও দার্শনিক প্রবণতা তৈরী করেছে ।

পাশ্চাত্য দর্শনের রয়েছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস । পাশ্চাত্য দর্শনের ধারাবাহিক বিকাশের একটি পর্যায়ে মার্কসীয় দর্শনের উৎপত্তি ঘটে । সাধারণভাবে মার্কসীয় দর্শন পাশ্চাত্য দর্শনেরই অংশ । মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ পাশ্চাত্য দর্শনের অংশ হলেও মার্কসীয়

Dhaka University Institutional Repository

দর্শন গতানুগতিক পাশ্চাত্য দর্শন থেকে কতগুলি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন । যার কারণে মার্কসের দর্শন পাশ্চাত্য দর্শনের অংশ হলেও এই দর্শনকে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র একটি দর্শন হিসাবে দেখা হয়ে থাকে । গতানুগতিক পাশ্চাত্য দর্শনের সাথে মার্কসীয় দর্শনের যে পার্থক্য রয়েছে, নিম্নে তা আলোচনা করা হলো ।

মার্কস-পূর্ব দার্শনিক ধারাগুলোর একটি প্রবণতা ছিল এই যে, তারা দর্শনকে 'সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান' বা সকল জ্ঞানের সমন্বিত সারমর্ম হিসেবে দেখতেন এবং যাবতীয় সমস্যার সমাধানের উপায় হিসেবে মনে করতেন । এই প্রবণতার মধ্যে দর্শনকে পরম সত্যে উপনীত হবার বিষয় হিসেবে দেখবার পরিচয় মেলে । কিন্তু মার্কসীয় দর্শন পরম সত্যে উপনীত হবার বিষয় হিসেবে দর্শনকে দেখেনি । দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ পরম সত্যের অস্তিত্বে আস্থাবানও নয় । "দ্বন্দ্বতাত্ত্বিক দর্শনের কাছে চূড়ান্ত, পরম বা পূত বলে কিছুই নেই ।"[১] মার্কস দর্শনকে দেখেছেন পরিবর্তনশীল বাস্তবতা থেকে উৎসজাত চিন্তা হিসেবে । (কার্ল মার্কসের ভাষায় " **Since every true philosophy is the intellectual quintessence of its time.".**)[২] ।

'Quintessence' শব্দটি মার্কস গ্রহণ করেছিলেন মর্মার্থের দিক থেকে । কালের বাস্তবতার বিমূর্ত জ্ঞান হলো মার্কসের কাছে দর্শন । এখানে মার্কসীয় দর্শনের সাথে গতানুগতিক পাশ্চাত্য দার্শনিক ধারার একটা পার্থক্য ঘটেছে ।

---

১. ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, ল্যুদভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান, কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস রচনা সংকলন, (দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ) প্রগতি প্রকাশন মস্কো, ১৯৭২, পৃ. ৪৫ ।

২. Karl Marx, **Karl Marx Fredrick Engels Collected Works,** Progress **Publishers, Moscow, 1975,Vol. 1, p. 195.**

Dhaka University Institutional Repository

গতানুগতিক পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে ভাববাদী, আধ্যাত্মবাদী চিন্তার প্রাবল্য বিদ্যমান ছিল যা জগতকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে চিন্তা দিয়ে। দর্শনকে কেন্দ্রীভূত করতে চেয়েছে বিমূর্ত চিন্তার উৎকালনিক বিষয়ে। এর বিপরীতে মার্কস দর্শনকে দেখেছেন বাস্তব সত্তার সামগ্রিকতা অর্জনের জ্ঞান-প্রক্রিয়া হিসাবে, বাস্তব সত্তা থেকে উৎসজাত বিমূর্ত চিন্তা হিসেবে। দর্শনের মধ্যে দিয়ে মানুষ জগতে তার অবস্থান সম্পর্কে জানে। মানুষ তার তৎপরতা, ক্রিয়া ও চেতনা যে নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয় তাকে উদ্‌ঘাটন করেন।

মার্কস পূর্ব দর্শনের মূল প্রবণতা ছিল চিন্তা দিয়ে জগৎকে ব্যাখ্যা করার। একটি পরম সত্তা আবিষ্কার করে তা দিয়ে সমগ্র জগৎকে ব্যাখ্যা করাই ছিল প্রধান দার্শনিক প্রবণতা। দর্শনকে তারা দেখতেন জগৎকে ব্যাখ্যা করার বিষয় হিসেবে। জগতের ব্যাখ্যা দান করাই ছিল পাশ্চাত্য তথা গতানুগতিক দর্শনের লক্ষ্য। কিন্তু মার্কস জগতের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিলেও দর্শনের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করেন পরিবর্তন সাধন করাকে। মার্কস তার "ফয়েরবাখ সম্বন্ধে থিসিস সমূহ"-তে এগারো নম্বর থিসিসে এই বিপ্লবী লক্ষ্য উচ্চকিত করে বলেন, "দার্শনিকেরা কেবল নানাভাবে জগৎকে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু আসল কথা হলো তাকে পরিবর্তন করা।"[১] এর মধ্য দিয়ে মার্কস প্রচলিত পাশ্চাত্য দর্শনের সাথে তার নিজস্ব দর্শনের লক্ষ্যের এক বড় পার্থক্য রচনা করেন। মার্কসের কাছে দর্শন হয়ে উঠল দুনিয়াকে রূপান্তরের এক দার্শনিক হাতিয়ার হিসেবে। এভাবে মার্কস দর্শনের সামনে এনে দাঁড় করালেন বৈপ্লবিক রূপান্তরের কর্তব্য। মার্কসের হাতে দর্শন প্রচলিত পাশ্চাত্য দর্শনের ব্যাখ্যা করার করণীয়ের বদলে পরিবর্তন সাধন করার প্রবণতা অর্জন করলো। দর্শন কেবল বিমূর্ত বিষয় না থেকে পরিবর্তনের তাত্ত্বিক হাতিয়ারে(**Theoritical weapon**)পরিণত হলো।

প্রচলিত পাশ্চাত্য দর্শনের সাথে মার্কসীয় দর্শনের অন্যতম পার্থক্য হলো সত্তা ও চিন্তার সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রশ্নে। মার্কসীয় দর্শন অনুসারে সত্তাই হচ্ছে বিমূর্ত চিন্তার উৎস ভূমি। কোন চিন্তাই শূন্য থেকে উদ্ভিত নয়। বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন প্রক্রিয়া মানুষের

---

১. কার্ল মার্কস, "ফয়েরবাখ সম্বন্ধে থিসিস সমূহ", কার্ল মার্কস - ফ্রেডারিক এংগেলস রচনা সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২, পৃ. ৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধি বৃত্তিক সৃষ্টিকে চূড়ান্ত অর্থে নির্ধারণ করে । মানুষের সত্তা বা চেতনা নির্ধারিত হয় মানুষের সামাজিক সত্তা দ্বারা । এভাবেই মার্কসীয় দর্শনে চিন্তা বা দর্শনের উৎস ভূমি হিসেবে রয়েছে সামাজিক সত্তা । দর্শন যেমন একটি নির্দিষ্ট কালের বা যুগের সৃষ্টি, তেমনি পাল্টাভাবে বলা যায় কোন যুগকে অনুধাবন করতে হলে সে কালের দর্শনকে বুঝতে হবে । গতানুগতিক পাশ্চাত্য দর্শন যেখানে চিন্তার ভিত্তিকে চিন্তার মধ্যেই অনুসন্ধান করেছে, মার্কস সেখানে দর্শনের ভিত্তিকেই অনুসন্ধান করেছেন নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্বের সামাজিক বাস্তবতা ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে । এভাবে মার্কসীয় দর্শনে একটি নির্দিষ্ট কালপর্বে একটি দর্শন গড়ে ওঠার কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় । মার্কসের ভাষায়, "দার্শনিকেরা ভুঁইফোড়ের মতো গজায় না, তারা তাদের কালের, তাদের জাতির উৎপাদ, , সেইকালের, জাতির অতি সূক্ষ্ম মূল্যবান ইন্দ্রিয়ের অগোচর অংগরস প্রবাহিত হয় দর্শনের ভাবধারণায় । যা শ্রমিকদের হাত দিয়ে রেলপথ নির্মান করায় সেই একই কর্মশক্তি বিভিন্ন দার্শনিক তন্ত্র গড়ে তোলে দার্শনিকদের মস্তিস্কে । যেমন মস্তিস্কটা পাকস্থলির মধ্যে অবস্থিত নয় বলে সেটার অস্তিত্বও মানুষের বাইরে নয় ।"[১] এভাবে মার্কস দর্শনকে সমাজের সংগে সংশ্লিষ্ট করে দর্শনের সংগে সমাজের সম্পর্ক দেখাতে চেয়েছেন ।

মার্কস দর্শন নিয়ে ভাবতে গিয়ে প্রবেশ করেছিলেন ইতিহাসের দর্শন অনুসন্ধানে, ইতিহাসের গতির নিয়ম আবিস্কারে, অর্থনৈতিক উৎপাদন সম্পর্কের খোঁজে, সমাজতত্ত্বে আর অর্থনীতিতে । একারণেই মার্কসীয় দর্শন অনেক বেশী ইতিহাস, সমাজ, অর্থনীতি মনস্ক । কিন্তু গতানুগতিক পাশ্চাত্য দর্শনে এমনটি দেখা যায় না । তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন হেগেল ।[২]

---

১. মার্কস এঙ্গেলস, ধর্ম প্রসংগে, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮১, পৃ. ২৯ ।

২. হেগেল সমাজ, ইতিহাস মনস্ক দার্শনিক ছিলেন । তিনি তাঁর ভাববাদী দর্শন অনুযায়ী চিন্তা দিয়ে সমাজ ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

গতানুগতিক পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তাদের দর্শনকে সমাজের কোন শ্রেণীর বা দলের দলীয় দার্শনিক চিন্তা হিসেবে দাবী করেননি। যদিও মার্কস তার পূর্বতন দর্শনকে সমাজের আধিপত্যশীল শ্রেণীর চিন্তা হিসেবে বিধৃত করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে একেবারেই ব্যতিক্রমভাবে মার্কস তাঁর দর্শনকে সমাজের নিপীড়িত শ্রেণী বা সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তির দর্শন হিসেবে দাবী করেন।

মার্কস ধ্যান-ধারণা, অভিমতও দর্শন গড়ে ওঠার সাথে সমাজ বাস্তবতা ও শ্রেণীর বিষয়টি যুক্ত করে দেখেছেন। পূর্ববর্তী দার্শনিক মতগুলিকে সমাজের শিক্ষিত শাসক শ্রেণীর মত হিসেবে দেখেছেন। এ প্রসংগে মার্কস তাঁর প্রখ্যাত 'কমিউনিষ্ট পার্টির ইস্তেহার'-এ বলেন "আপনাদের ধারণাগুলিই যে আপনাদের বুর্জোয়া উৎপাদন ও বুর্জোয়া মালিকানার পরিস্থিতি থেকেই উদ্ভূত, ঠিক যেমন আপনাদের শ্রেণীর ইচ্ছাটাই সকলের উপর আইন হিসেবে চাপিয়ে দেয়াটাই হলো আপনাদের আইন শাস্ত্র, আপনাদের এই ইচ্ছাটার মূল প্রকৃতি ও লক্ষ্যও আবার নির্ধারিত হচ্ছে আপনাদের শ্রেণীরই অস্তিত্বের অর্থনৈতিক অবস্থা দ্বারা।"[১] মার্কসের উপরোক্ত বক্তব্যের মধ্যদিয়ে দর্শনের সাথে শ্রেণীর সম্পর্কের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এংগেলসের হাতে যখন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের পত্তন হয়, তখন তারা একে নিপীড়িত শ্রেণীর মুক্তির দর্শন হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু তাদের দর্শনকে তারা পার্টি দর্শন বলেননি। পরবর্তীকালে লেনিন, ষ্ট্যালিন ও তাদের অনুসারীরা শ্রেণী পার্টির প্রয়োজনীয়তার বিশেষ গুরুত্ব তুলে ধরেন। নিপীড়িত শ্রেণীর পার্টি সংশ্লিষ্ট

---

১. কার্ল মার্কস, "কমিউনিষ্ট পার্টির ইস্তেহার", কার্ল মার্কস ফ্রেডরিক এংগেলস রচনা সংকলন, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২, পৃ. ৪১-৪২।

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্ব ও নীতিমালা গড়ে তুলতে গিয়ে তারা মার্কসীয় দর্শনকে সর্বহারা শ্রেণীর পার্টি দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেন। এ প্রসংগে জে.ভি. ষ্ট্যালিন বলেন "মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির দৃষ্টিভংগী হলো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ।"[১] এ ধারার বক্তব্যের আরো গোঁড়া মতামত পাওয়া যায় প্রখ্যাত বৃটিশ মার্কসবাদী দার্শনিক মরিস কর্নফোর্থ এর বক্তব্যে। কর্ণফোর্থ বলেন, "আমরা যতই খুঁজিনা কেন, দলানুগামী নয় (Non partisan) ও শ্রেণীগত নয় (Non class), এমন দর্শন আমরা খুঁজে পাব না।"[২]

মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে অনেকের দৃষ্টিভংগী আরো তীব্র। অনেক মার্কস বিশারদ মনে করেন যে, এই মার্কসীয় শ্রেণী দর্শন বা দলীয় দর্শন সত্যের অনুসন্ধান দিতে পারে। প্রখ্যাত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক জর্জ লুকাস মনে করেন দ্বান্দ্বিক নিয়মে মন ও বস্তুর, বিষয় ও বিষয়ীর সম্মিলন ঘটে ইতিহাসে। সর্বহারা শ্রেণী হচ্ছে সচেতনতা অর্জনে সবচেয়ে সক্ষম শ্রেণী। তার শ্রেণী অবস্থানই তাকে সমাজ সমগ্রতার জ্ঞানে দৃষ্টিমান করে তুলতে পারে। প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর মধ্যেই আত্মমুক্তির শর্ত ও সামাজিক বাস্তবতার উপলব্ধি ঘটে। সামগ্রিকতার এই জ্ঞান অর্জন তার ক্রিয়ার (action) প্রাক শর্ত। ইতিহাসে এই সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যেই তত্ত্ব ও বাস্তবতার, বিষয় ও বিষয়ীর সম্মিলন ঘটে। লুকাস তাই সর্বহারা শ্রেণীকে ইতিহাসের সচেতন বিষয়ী হিসেবে দেখেছেন। তিনি এ প্রসংগে বলেন, **"From its own point of view self knowledge coincides with knowledge of the whole so that the proletariat is at one and the same time the subject and object of its own knowledge "**[৩] লুকাস মনে করেন দ্বান্দ্বিক

---

১. জে.ভি. ষ্ট্যালিন, দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, প্রকাশ ভবন, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ১।

২. মরিস কর্ণফোর্থ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, পশ্চিম বংগ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৪।

৩. **Georg Lukacs, History and class Consciousness, Merlin Press, London, 2nd impression, 1971, p. 20.**

Dhaka University Institutional Repository

পদ্ধতিতে এভাবে এগিয়ে শ্রেণী অবস্থানই সত্যে পৌঁছে দিতে পারে। তাঁর ভাষায়," . . . **the knowledge of reality provided by the dialectical method is likewise inseparable from the class standpoint of the proletariat . "**[১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সাধারণ পাশ্চাত্য দর্শন ও মার্কসীয় দর্শনের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এবং মার্কসীয় দর্শনের যে বৈশিষ্ট্যগুলো বেরিয়ে এসেছে তা হলো নিম্নরূপ:

১। মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের মতে দর্শন পরম সত্যে উপনীত হবার বিষয় নয়;

২। দর্শন একটি কালপর্বের বিমূর্ত বুদ্ধিবৃত্তিক সারমর্ম,

৩। দর্শনের প্রধান লক্ষ্য হলো পরিবর্তন সাধন করা;

৪। মার্কসীয় দর্শন জগৎ সম্পর্কে বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রদান করে;

৫। মার্কসীয় দর্শন, দর্শনের ভিত্তি হিসেবে দেখেছে সামাজিক বাস্তবতাকে;

৬। মার্কসীয় দর্শন বস্তু ও চেতনার দ্বৈততা অপসারণ করে বস্তুবাদী একত্ববাদের কথা বলেছে। এ দর্শন চিন্তার ভিত্তি হিসেবে বাস্তব সত্তাকে স্বীকার করেছে;

৭। মার্কসীয় দর্শন সমাজ ইতিহাস ঘনিষ্ঠ দর্শন;

৮। মার্কসীয় দর্শন, দর্শনের মধ্যে আধিপত্যশীল শ্রেণীর চিন্তার প্রতিফলন, ও সম্পর্ককে বিবেচনা করেছে;

৯। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতারা এ দর্শনকে সমাজের নিপীড়িত শ্রেণীর দর্শন হিসেবে দাবী করেছেন।

---

[১] **Ibid, p. 21.**

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ মার্কসীয় দর্শন

মার্কসীয় দর্শন বস্তুবাদী দর্শন। মার্কসীয় বস্তুবাদী দর্শনের বহুমুখী দিক রয়েছে, যেমন দার্শনিক বস্তুবাদ, দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি, জ্ঞান তত্ত্ব, ইতিহাস দর্শন, নৈতিকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, মানব প্রত্যয় ও এই দর্শনের ইতিহাস ঘনিষ্ঠ দিক ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। এসব বৈচিত্রতা নিয়ে মার্কস একটি সিস্টেম গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। মার্কস শুধু বিমূর্ত দর্শনই গড়ে তোলেননি, মার্কস তাঁর দর্শনকে প্রয়োগ করেছিলেন ইতিহাসেও। মার্কসীয় দর্শন তাই ব্যতি-এম্মভাবে ইতিহাস সংযুক্ত দর্শন। অনেক মার্কস বিশারদ দাবী করেন যে, মার্কসবাদ একাধারে দর্শন ও বিজ্ঞান। মার্কসীয় দর্শনের এই ব্যাপক বিস্তৃত দৃষ্টিভংগী প্রসংগে অ্যালথুসার বলেন, **"Marxist - Leninist theory includes a science (historical materialism) and a philosophy (Dialectical materialism)".**[১]

মার্কসের দার্শনিক বস্তুবাদ

চিন্তা ও সত্তার সম্পর্ক বিষয়ক প্রসংগটি দর্শনের একটি মৌলিক সমস্যা। সুদীর্ঘকাল যাবৎ দর্শনে এ সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। "সমস্ত দর্শনের, বিশেষতঃ সাম্প্রতিকতম দর্শনের বৃহৎ বুনিয়াদী প্রশ্ন হল চিন্তা ও সত্তার সম্পর্ক সংএশনু প্রশ্ন।"[২] দর্শনের ইতিহাসে এ সম্পর্কে দু'টি মত দেখা যায়, তা হল ভাববাদ ও বস্তুবাদ। সাধারণভাবে বললে যারা চিন্তাকে আদি মনে করেন তারা ভাববাদী। অন্যদিকে যারা প্রকৃতি বা বস্তুকে আদি মনে করেন তারা বস্তুবাদী। এ প্রসংগে লেনিন বলেন, **"Materialism is fully in agreement with natural science, takes matter as primary and regards consciousness, thought, sensation as secondary."**[৩]

---

১. **Louis Althusser, Lenin and Philosophy and other Essays, Translated from the French By Ben Brewster, Monthly Review Press, Newyork and London, 1971, p. 13.**

২. ফ্রেডারিক এংগেলস, "ল্যুদভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান, মার্কস-এংগেলস রচনা সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২, পৃ. ৫১।

৩. **V.I. Lenin, Materialism and Empirio-criticism Foreign, Languages Press, Peking, 1976, p. 38.**

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে মার্কসের দার্শনিক বস্তুবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরা হলো ঃ

(ক) মার্কসের বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের মতে আদি সত্তা হলো বস্তু বা প্রকৃতি। বিশ্ব জগতের বিভিন্ন প্রকাশ তারই বিভিন্ন রূপ, বা তা থেকে উৎসজাত।

(খ) মার্কসীয় দর্শন হলো বস্তুবাদী একত্ববাদ (**materialist monism**)। এ দর্শন বস্তু ও চিন্তার, দেহ ও মনের দ্বৈততা স্বীকার করেনি। চিন্তা বস্তুজাত। চিন্তাকে বস্তু থেকে পৃথক করা যায় না। জৈব বস্তুর সর্বোচ্চ বিকাশের ফল হলো মানব মন। এই যে সর্বোচ্চ বিকশিত বস্তু যা চিন্তা করে, সেই বস্তু থেকে চিন্তাকে পৃথক করে স্বতন্ত্র কোন সত্তা হিসেবে চিন্তাকে মার্কসীয় দর্শন স্বীকার করে না। তাই মার্কসীয় দর্শনে চিন্তা ও বস্তুর দ্বিখণ্ডীকরণকে অস্বীকার করায় দ্বৈততার অবসান ঘটেছে বলে এ দর্শন দাবী করে। 'চিন্তা' কোন বস্তু নয়, তবে তা বস্তুজাত। এ প্রসংগে **Mikhailov** এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "**. . . thinking is not matter,not brain.But thinking is a function of the brain.**"[১]

(গ) দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন মনে করে যে, জ্ঞান তথা বস্তুজগতের জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। যদিও ইমানুয়েল কান্ট বলেছিলেন, প্রকৃত বস্তুকে (**Thing-in-it-self**) জানা যায় না। কান্টের অজ্ঞেয়বাদের বিরুদ্ধে এই বস্তুবাদী দর্শন মনে করে যে, প্রকৃত বস্তুকে জানা সম্ভব। মার্কসীয় বস্তুবাদীরা মনে করেন, আমরা যদি বস্তুর জ্ঞান অর্জন করতে পারি এবং বস্তুকে যদি আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে ইচ্ছা মাফিক ব্যবহার করতে পারি তা'হলে অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আমরা বস্তুকে জানতে পারি।

---

১. **F.T. Mikhailov, Riddle of the Self. Progress Publishers, Moscow, 1980, p. 13**

Dhaka University Institutional Repository

দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি

মার্কসের দর্শন হলো বস্তুবাদী দর্শন । আর এর পদ্ধতি হলো দ্বান্দ্বিক । এ কারণেই মার্কসের দর্শনকে বলা হয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ । মার্কস বস্তুবাদকে পরিণত রূপ দিয়েছেন । এই বস্তুবাদী দর্শনের ক্ষেত্রে মার্কসের আরেকটি অবদান হচ্ছে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির বিশদীকরণ ।

দর্শনে দ্বান্দ্বিকতার সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে । প্লেটো, হেরাক্লিটাস , এরিস্টটল ও কান্ট হয়ে হেগেলের দর্শনে দ্বান্দ্বিকতা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে । হেগেল দ্বান্দ্বিকতাকে পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করলেও তাঁর দ্বান্দ্বিকতা ছিল ভাববাদের খোলসে আবদ্ধ ।

হেগেলের দ্বান্দ্বিকতা অতিন্দ্রীয় রহস্যময় হলেও তিনিই প্রথম দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির কার্যকর রূপ দেন এবং তিনি দ্বন্দ্ববাদের প্রথম সর্বাংগীন সচেতন উপস্থাপনা করেন । হেগেলের কাছে 'চিন্তা' হলো কর্তা বা সত্তা । এই চিন্তা যে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় বিকশিত হয় হেগেল তা তুলে ধরেছেন । মার্কস হেগেলের 'চিন্তা' সত্তাকে উল্টে দিয়ে বস্তুকে সত্তা হিসেবে গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠিত করেন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ । মার্কস হেগেলের 'ভাব' কে দেখেন মানব মনে বাস্তব জগৎ প্রতিফলিত হয়ে চিন্তা রূপে পরিণত হওয়া হিসেবে । তাই মার্কসের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ছিল চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । **"That was a genuine revolution in theoretical thinking, in the creation of the scienctific method of investigation."** [১]

দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি একই সাথে পদ্ধতি এবং পদ্ধতিতত্ত্ব । কোন পদ্ধতির যখন নিজেরই যাচাই বা বিশ্লেষণের প্রসংগ উত্থাপিত হয় তখন বিজ্ঞানের আওতায় তা সম্ভব নয় । তখন এটি একটি দার্শনিক প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয় । দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ও বস্তুবাদ মিলিয়েই দ্বান্দ্বিক

---

১. John Somerville and Howard L. Persons(edited), Dialogues on the Philosophy of Marxism, Greenwood Press, West Port, Connecticut, London, England, 1974, p. 28.

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুবাদ, তা একই সাথে পদ্ধতি এবং পদ্ধতি তত্ত্ব: **When the method itself becomes the object of a special analysis, then the problem of methodology arises, which exceeds the bounds of the particular sciences. When scientific method is studied, it becomes the subject matter of philosophical investigation . . . . Materalistic dialectics as an integral component of dialectical materialism is both a scientific method of thinking, and scientific methodology, thinking about scientific method".**[১]

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূল সূত্র সমূহ

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুযায়ী জগতের মৌল উপাদান হচ্ছে বস্তু । বস্তুর বৈশিষ্ট্য হলো তার গতিময়তা । গতি ছাড়া বস্তুর কথা চিন্তা করা যায় না । বস্তুর ভেতরকার দ্বন্দ্ব থেকেই গতির উৎপত্তি হয় । দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূল বিষয়গুলিকে তিনটি মৌলিক সূত্রে সূত্রবদ্ধ করা যায় । নিয়মগুলি হলো ঃ

১। পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলে উল্লম্ফনের মাধ্যমে গুণগত পরিবর্তন সাধন,

২। বিপরীতের একত্ব ও দ্বন্দ্ব ; এবং

৩। নিষেধনের নিষেধন ।

এই তিনটি সূত্রই হেগেল তার 'Science of Logic' গ্রন্থে ভাববাদী দৃষ্টিকোন থেকে উপস্থাপন করেছিলেন । হেগেল এগুলিকে দেখেছেন চিন্তার নিয়ম হিসেবে । কিন্তু মার্কস ও

---

১. Ibid. p. 19.

Dhaka University Institutional Repository

এঙ্গেলস এগুলিকে বস্তুজগতের নিয়ম হিসেবে দাঁড় করান । নিম্নে নিয়মগুলি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো ঃ

পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলে উল্লম্ফনের মাধ্যমে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয় ।

এই সূত্রানুযায়ী বস্তুজগতে পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলে এক পর্যায়ে উল্লম্ফনের মাধ্যমে গুণগত পরিবর্তন ঘটে । উল্লম্ফনের মাধ্যমে পরিবর্তনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এন্ম-বিকাশ ও এন্ম পরিবর্তনের ধারণা ডারউইনের মধ্যে পাওয়া যায় । কিন্তু মার্কসের সাথে ডারউইনের বিবর্তনের ধারণার পার্থক্য রয়েছে । ডারউইন বিবর্তনের ক্ষেত্রে এন্মবিবর্তনের কথা উল্লেখ করেন । কিন্তু মার্কস সেক্ষেত্রে উল্লম্ফনের কথা বলেন । উল্লম্ফনে একটি ছেদ ঘটে । যা এন্মপরিবর্তনের ধারণায় অনুপস্থিত । পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলে যে বিন্দুতে উল্লম্ফনের মাধ্যমে গুণগত পরিবর্তন হয় তাকে সন্ধিবিন্দু (**Nodal Point**) বলা হয় । প্রকৃতি বিজ্ঞান থেকে অনেক উদাহরণ তুলে ধরে এঙ্গেলস তাঁর'**Dialectics of Nature**'গ্রন্থে বিষয়টি প্রমাণ করতে চেয়েছেন ।[১]

বিপরীতের একত্ব ও দ্বন্দ্ব

বিপরীতের একত্ব ও দ্বন্দ্ব এই সূত্র দিয়ে বিকাশের উৎস ও চালিকা শক্তির কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে । এই সূত্রানুযায়ী প্রতিটি বস্তুর মধ্যে পরস্পর বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট রয়েছে । তারা পরস্পর বিরোধী হলেও কোন দ্বন্দ্বমান দিকই একাকী থাকতে পারে না । বিপরীত দিকের অস্তিত্ব ছাড়া প্রত্যেকটি দিক তার অস্তিত্বের শর্ত হারিয়ে ফেলে । আর এই পরস্পর বিরোধিতা থেকে তৈরী হয় গতি ও পরিবর্তনের ।

---

১. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন- **F.Angels**, Dialectics of Nature, **Progress Publishers, Moscow, 1976.**

Dhaka University Institutional Repository

নিষেধনের নিষেধন

মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুযায়ী পরিবর্তনের মূল প্রক্রিয়াটি হচ্ছে নিষেধনের নিষেধন। বিকাশের ধারায় পুরাতন লুপ্ত হয়। পুরাতনের অস্তিত্বের আবশ্যিকতা দখল করে নতুন। পুরাতনকে নাকচ করে যে নতুনের আবির্ভাব ঘটে তা হলো উন্নততর পর্যায়ে উৎক্রমন। এই নতুনের আবির্ভাব যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি নয়। এই পরিবর্তন হচ্ছে প্রকৃত অভূতপূর্বের আবির্ভাব। সম্পূর্ণ নতুনের আরম্ভ। এই সূত্র থেকে পাওয়া যায় বিকাশের প্রগতিশীল ঘূর্ণায়মান বৈশিষ্ট্য, যা সরল রৈখিক নয়।

উন্নয়ন বিকাশ, বা পরিবর্তন এ কারণেই অসংখ্য নিষেধনের একের পর এক সমাবেশ এবং নতুন কর্তৃক পুরাতনকে নাকচ করার এক সীমাহীন প্রক্রিয়া।

মার্কসীয় দর্শনে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অবিচ্ছেদ্য। তাই মার্কসীয় দর্শনের পূর্ণাংগ আলোচনা করতে হলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রসংগে আলোচনা সঙ্গতভাবেই এসে পড়ে।

১.৪ ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে মানুষের বস্তুগত সমাজ জীবন ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের এই প্রয়োগকে বলা হয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। এঙ্গেলসই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কথাটির প্রচলন ঘটান। মার্কস ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কথাটি না বলে একে বলেছিলেন ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা **(Materialist conception of history)**। তবুও প্রচলিত অর্থে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলতে ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণাকেই বোঝানো হয়। যদিও কোন কোন মার্কস বিশারদ মনে করেন যে, ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার পরিবর্তে এঙ্গেলস ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রচলনের মধ্য দিয়ে মার্কসের ধারণাকে একটি যান্ত্রিক রূপ প্রদান করেছেন। তবুও ঐতিহাসিক

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুবাদ বলতে সাধারণ অর্থে ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণাকেই বোঝান হয়। "**The term [historical materialism] refers to that central body of doctrine, frequently known as the materialist conception of history, which constitutes the social scientific core of marxist theory**".[১]

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মূলতঃ দর্শন নয়, বরং এ হচ্ছে অভিজ্ঞতামূলকভাবে সমাজ বিশ্লেষণের এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। কোন কোন মার্কস বিশারদ মনে করেন মার্কস বিজ্ঞানের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। তা হলো 'ইতিহাস বিজ্ঞান', "**Marx founded a new science: the science of history . . . . Marx Opened up a third continent to scientific knowledge: the continent of History**"[২]।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ইতিহাস বিশ্লেষণের একটি সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এ হলো এক ইতিহাস তত্ত্ব, যার সাহায্যে ইতিহাস বিশ্লেষণ করে ইতিহাসের সত্য আবিষ্কার করা যায়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সাহায্যে ইতিহাসের চালিকা শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কেবলমাত্র ইতিহাস গবেষণা বা অনুসন্ধান পদ্ধতিই নয়। শোষিত, নিপীড়িত, প্রলেতারিয়েত শ্রেণী সমাজে তার অবস্থান, ক্ষমতা ও করণীয় নির্ধারণের

---

১. **Tom Bottomore (Edited), Dictionary of Marxist Thought, Blackwell Reference, Great Britain, 1983, p. 206.**

২. **Louis Althusser, Lenin and Philosophy and other Essays, Translated from French By Ben Brewster, Monthly Review Press, Newyork and London, 1971, p. 15.**

Dhaka University Institutional Repository

জন্য ঐতিহাসিক বস্তুবাদের একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এক্ষেত্রে ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতির চাইতে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রামের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের শক্তিশালী ভূমিকা রয়েছে। তাই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কেবল ইতিহাস গবেষণার সূত্রই নয়, এর রয়েছে ভিন্নতর অপরিসীম রাজনৈতিক তাৎপর্য্য। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সমাজে বিরাজমান বৈরী শ্রেণীর মধ্যে বিরোধকে তীব্রতর করে। নিপীড়িত শ্রেণীর কর্মের রাজনৈতিক নির্দেশনা প্রদান করে।

ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার প্রথম বিষয়টি হলো ব্যক্তি ও তার বস্তুগত জীবনের শর্ত। মার্কস বলেন, "**...the real individuals, their activity and the material conditions, of life . . . . The first premise of all human history is, of course, the existence of living human individuals**".[১]

ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার ভিত্তি হচ্ছে মানুষের বস্তুগত জীবন। এই মানুষ কোন বিমূর্ত মানুষ নয়। এই মানুষ ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে একটি নির্দিষ্ট কালপর্বের উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট, সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ মানুষ। মার্কস এর মানুষ কোন চিরন্তন (**Universal**) মানুষ নয়। এ মানুষ হলো একটি নির্দিষ্ট কালপর্বে ইতিহাস প্রসূত বাস্তব মানুষ। বাস্তব মানুষ সব সময়ই সামাজিক। তার চেতনাও সামাজিক চেতনা। মানুষ সামাজিক উৎপাদন ও সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে বাস্তব হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রথম প্রতিজ্ঞা হচ্ছে, মানুষের জীবনের ভরণ-পোষণের উপায় উৎপাদন এবং উৎপাদন এবং উৎপাদনের পরে উৎপাদিত বস্তুর বিনিময়। এ হলো সকল সমাজ কাঠামোর ভিত্তি। উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমাজে শ্রেণী / বর্গের তৈরী হয়। সামাজিক,

---

১. Karl Marx, German Ideology, Pregress Publishers, Moscow, 1976, pp. 36-37.

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক মৌলিক পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করতে হবে উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদন সম্পর্ক ও বিনিময়ের ধরণের পরিবর্তনের মধ্যে, প্রতিটি যুগের অর্থনীতির মধ্যে। এই অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শোষক কর্তৃক শোষিত হওয়ার রাজনৈতিক অভিপ্রকাশ হচ্ছে শ্রেণী বিরোধ, যা পরিণতি লাভ করে শ্রেণী সংগ্রামে। প্রাক ইতিহাস বাদ দিয়ে ইতিহাসকে মার্কস তাই শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস হিসেবে দেখেছেন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল বিষয়গুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

১. যে কোন সমাজের বুনিয়াদ বা ভিত্তি হচ্ছে অর্থনীতি। সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি, মতাদর্শ/ রাষ্ট্র হচ্ছে উপর কাঠামো। উপর কাঠামো চূড়ান্ত অর্থে (in the last instance) তার বুনিয়াদ অর্থনীতি দ্বারা নির্ধারিত হয়।

২. বস্তুগত জীবনের প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে মানুষ উৎপাদন করে। উৎপাদনের মধ্যদিয়ে মানুষ বস্তুগত মূল্য তৈরী করে। প্রকৃতির উপর শ্রম প্রয়োগ করে মানুষ উৎপাদন করে।

৩. উৎপাদনের দু'টি দিক রয়েছে -

(ক) উৎপাদিকা শক্তিঃ এতে প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্কের দিকটা পাওয়া যায়।

(খ) উৎপাদন সম্পর্ক ঃ উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক তৈরী হয় সে দিকটি পাওয়া যায়।

সর্বকালের সকল উৎপাদনই সামাজিক উৎপাদন। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বস্তুগত মূল্য তৈরীর মধ্য দিয়েই উৎপাদন সম্পর্ক তৈরী হয়।

৪. উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না। তা এগিয়ে গত বেড়ে চলে, পরিবর্তিত হয়। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ফলে পুরাতন

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদন সম্পর্ক আর খাপ খায় না । তখন গোটা উৎপাদন সম্পর্কটা পাল্টে যায়, আবির্ভূত হয় নতুন সমাজ ।

৫. পুরাতন সমাজের অভ্যন্তরেই নতুন উৎপাদিকা শক্তি তৈরী হয় । মানুষের ইচ্ছা নিরপেক্ষ ভাবেই উৎপাদিকা শক্তির এ বিকাশ সাধন ঘটে । এই বিকশিত নতুন উৎপাদিকা শক্তির সাথে পুরাতন উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধ তীব্র রূপ ধারণ করে, এ অবস্থা সামাজিক পরিবর্তনকে আবশ্যিক করে তোলে ।

৬. উৎপাদিকা শক্তির সাথে উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধ থেকে পরিবর্তন জরুরী হয়ে পড়লেও একাকী এ পরিবর্তন ঘটে না । মানবিক সচেতনতা, উদ্যোগ বা মানুষের কোন ভূমিকা ব্যতিরেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ পরিবর্তন সংঘটিত হয় না । বরং সচেতন মানবিক প্রয়াসে, বৈপ্লবিক পন্থায় পুরাতন উৎপাদন সম্পর্ককে উচ্ছেদ করে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে হয় । এটাই হলো বিপ্লব । পুঁজিতন্ত্রের যুগে তার বিপরীত শ্রেণীর দায়িত্ব হচ্ছে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা ।

মার্কস এঙ্গেলস প্রতিষ্ঠিত এই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবী ব্যাপী তাকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি । মার্কস-এঙ্গেলস প্রবর্তিত এ মতবাদকে কেন্দ্র করে বুর্জোয়া শ্রেণীকে উচ্ছেদ করার মধ্য দিয়েই শ্রেণীহীন-শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবী জুড়ে । এ উপ-মহাদেশেও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মার্কসবাদ প্রচন্ড আলোড়ন তোলে । শুরু হয় মার্কসবাদ চর্চা । সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গড়ে উঠে উপ-মহাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি । পরবর্তী অধ্যায়ে এ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে কেন্দ্র করে মার্কসবাদী আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হলো । মার্কসবাদী আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরা ও পর্যালোচনার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চা ও মার্কসবাদী আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বোঝা যাবে ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বি তী য় অ ধ্যা য়

বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন ও মার্কসীয় রাজনীতি বিকাশে মার্কসবাদী রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

২. বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন ও মার্কসীয় রাজনীতি বিকাশে মার্কসবাদী রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

২.১ বাংলা-ভারতে মার্কসবাদী আন্দোলন বিকাশের রাজনৈতিক পটভূমি

ভারতে মার্কসীয় চিন্তা ও সংগ্রাম বিকাশের একটি অব্যবহিত পূর্ব রাজনৈতিক পটভূমি রয়েছে। এই রাজনৈতিক পটভূমি-বিযুক্তকারে ভারতের মার্কসবাদী চিন্তার প্রসার বোঝা সম্ভব নয়।

১৭৫৭ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বাংলার স্বাধীনতা হরণ করে। ভারত বাংলায় বৃটিশের শোষণ-শাসন, অত্যাচার ও লুণ্ঠন তীব্র রূপ ধারণ করে। এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের উপর চলে সামন্তীয় জমিদারী শোষণ। ফলশ্রুতিতে বৃটিশ বিরোধী এবং সামন্ত জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ গড়ে উঠতে থাকে। উল্লেখ্য ১৮৩৮ থেকে ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত ফরাজী আন্দোলন, ১৮৫৯ থেকে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত নীল বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ, সন্যাস বিদ্রোহ এমনিভাবে অসংখ্য বিদ্রোহ ঘটে। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল এই একশত বছরে ভারত বাংলায় প্রতি বছর কোন না কোন বিদ্রোহ, আন্দোলন ঘটেছে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে।

১৮৫৭ সালে ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে ঘটে এক অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৮৫৭ সালে 'মহাবিদ্রোহ' ঘটে, যাকে বৃটিশ সরকার 'সিপাহী বিদ্রোহ' হিসেবে অভিহিত করে। এই মহা বিদ্রোহ পরবর্তীতে ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি বিকাশে বড় অবদান রেখেছে। "উত্তর ও উত্তরপূর্ব মহা-বিদ্রোহ এবং বাংলাদেশে শিক্ষিত মধ্য ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনার উদ্বোধন পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়"।[১] এই মহা-বিদ্রোহ ভারতের রাজনীতিতে দু'টি প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। মহাবিদ্রোহের সাথে ভারতের পরবর্তী

---

১. সুকুমার মিত্র, ১৮৫৭ ও বাংলাদেশ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী- প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৬০, পৃ. ব. গ।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক বিকাশ গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। "... ভারতের ইতিহাসে যুগান্তকারী 'মহাবিদ্রোহে'র পর একদিকে বিজয় গর্বে উন্মত্ত হইয়া ইংরেজ-শাসকগণ ভারতের উপর উৎপীড়ন ও শোষণের বন্যা বহাইয়া দিতে থাকে এবং অপরদিকে ভারতের সমাজের সকল-দিকে একটা আলোড়ন আরম্ভ হয়। সেই আলোড়নের মধ্যদিয়া ধীরে ধীরে এক নূতন ভারত বর্ষের, জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং নতুন জাতির আরম্ভ হয়"।[১]

বৃটিশ শাসনে ভারতের অর্থনীতির মূল ভিত্তি ধ্বংস হয়। বৃটিশ আগমনে বৃটিশদের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুতরা, নিরন্ন কৃষক এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা ইউরোপের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক চিন্তার সাথে পরিচিত ছিল তারা ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে এ পর্যায়ে মূল ভূমিকা গ্রহণ করে।

মহা-বিদ্রোহ পরাস্ত হলেও মহা-বিদ্রোহ থেকেই ভারতের রাজনীতির বিকাশ ঘটতে থাকে। উনিশ শতকের শেষার্ধে বিভিন্ন সংস্থা গঠিত হয়। ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন'। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভারতে জাতিসমূহের মধ্যে ঐক্য বিধান, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিরোধ নিরসন ও ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' গড়ে উঠে। এই সংগঠনটি সর্বভারতীয় মতামত তুলে ধরতে সক্ষম হয়। ফলশ্রুতিতে জাতীয়তাবাদী সর্ব-ভারতীয় রাজনীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। যার পরিনতিতে এই সংগঠনের বোম্বে সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক পরিণতি হিসেবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি ঘটে। ১৮৮৪ সালে এ্যালান একটাভিয়ান হিউমের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। বৃটিশ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী হিউম ভারতের নিম্ন শ্রেণীর মানুষের ব্যাপক গণবিদ্রোহের আশংকা থেকে প্রতিশেধক হিসেবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব দেন। তা' মোটেই ভারতের জাতীয়তাবাদী

১। সুপ্রকাশ রায়, ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম, কথা ও কাহিনী, কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রাম বিকাশের স্বার্থে ছিল না। কংগ্রেস ছিল ভারতের উদীয়মান ধনীক বণিকদের দল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন প্রতিষ্ঠাকালীন কংগ্রেস নেতৃত্ব। পরবর্তীতে কংগ্রেসের মধ্য-দিয়ে বৃটিশ স্বার্থের সাথে ভারতের নব্য ধনীক শ্রেণীর বিরোধের প্রতিফলন ঘটেছিল। শুরু থেকেই কংগ্রেস বৃটিশের সাথে আপোষ, আলোচনা ও সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে। ভারতের স্বাধীনতাকামী জনগণের এক বড় অংশ কংগ্রেসের এই সহযোগীতার নীতিকে মেনে নিতে পারেনি। তারা বৃটিশের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯০২ সালে গঠিত হয় "অনুশীলন সমিতি", গঠিত হয় "যুগান্তর", "উত্তরবঙ্গ সমিতি"। সুপ্রকাশ রায় ভারতের এই চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ উদ্ভবের জন্য চারটি কারণ চিহ্নিত করেছেন।[১] কারণগুলি হলো :

(ক) স্বেচ্ছাচারী বিদেশী শাসন, (খ) অর্থনৈতিক দুর্দশা, (গ) জাতীয় চেতনার উন্মেষ এবং (ঘ) কংগ্রেস নেতৃত্বের আপোষ নীতি।

এই চারটি কারণের ফলে ভারতের শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্ভব ঘটে চরম-পন্থী জাতীয়তাবাদের। ভারতে বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে দু'টি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি হলো বিক্ষিপ্ত সশস্ত্র আন্দোলন, দ্বিতীয় ধারাটি হলো নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম - যার পূর্ণতা ঘটেছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে। কিন্তু চরমপন্থী জঙ্গী জাতীয়বাদে জঙ্গী চরম-পন্থার সাথে যুক্ত হয়েছিল সর্বভারতীয়বোধ। " যেখানে প্রথম ধারাটি জঙ্গীআনার সাথে যুক্ত হয়েছিল দ্বিতীয় ধারাটির কংগ্রেস সর্বভারতীয়ত্ব... জঙ্গী জাতীয়তাবাদ, যা সশস্ত্র বিপ্লব ও জাতীয়তাবাদের আদর্শে বিশ্বাসী।"[২] এই সন্ত্রাসবাদী ধারা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পাশ্চাত্য শিক্ষা, ইয়ংবেঙ্গলদের চিন্তা এবং রাশিয়ার এনার্কিষ্টদের রাজনৈতিক সাংগঠনিক চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সবচেয়ে বেশী জোরদার হয়েছিল। বাংলায় এবং মহারাষ্ট্রে। তার কারণ হলো বাংগালী তার জাতিসত্তার দিক থেকে ছিল অধিকতর বিকশিত ও স্বকীয়তা সম্পন্ন। " বিশ শতকের গোড়ার দিকেও আগের মতোই

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

২. ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গদেশেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রটি অবস্থিত ছিল। ভারতীয় জাতিগুলির মধ্যে বাঙালীরা ছিল সর্বাধিক সুচিহ্নিত জাতীয় স্বকীয়তার অধিকারী এবং তাদের জাতীয় ঐক্য দেশের এই অংশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিকাশে উল্লেখ্য অবদান যুগিয়েছিল"।[১]

ভারতের হিন্দু- মুসলমান এ দু'টি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অবস্থান ও বিরোধ ভারতীয় রাজনীতির পরবর্তী বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। মোগলদের হাত থেকে বৃটিশ কর্তৃক ভারতের শাসন ক্ষমতা গ্রহণের কারণে মুসলমানরা বৃটিশ আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হয়। ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি বিকাশের এই পর্বের গোড়ার দিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের তেমন কোন ভূমিকা ছিল না। তারা ইংরেজী শিক্ষায় এগিয়ে আসেনি। তাদের মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয়নি। মহাবিদ্রোহের পর থেকে তাদের মধ্যে বিরাজ করছিল প্রচন্ড হতাশা। তারা ইংরেজ ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রতি ছিল প্রচন্ড বীতশ্রদ্ধ।

মুসলমানদের এই পশ্চাতপদতা অপসারণের লক্ষ্যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক হিন্দু বিদ্বেষী নয়, এমন ধারা হিসেবে ১৮৬৩ সালে মুসলমানদের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে নবাব আবদুল লতিফ "মহামেডান লিটারারী সোসাইটি" গঠন করেন। ১৮৭৭ সালে আমীর আলী খান এর উদ্যোগে "ন্যাশনাল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশন" গঠিত হয়। ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর আলীগড় আন্দোলনের নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও ঢাকার নবাব সলিমুল্লার উদ্যোগে গঠিত হয় 'মুসলিম লীগ'। " মুসলিম লীগের আদর্শ ও লক্ষ্যের মধ্যে ছিল ঃ (ক) মুসলমান সম্প্রদায়কে বৃটিশ সরকারের প্রতি ভক্ত ও অনুগত করে তোলা এবং সরকারের কার্য্যকলাপের কারণে তাদের মনে সংশয়ের উদয় হলে তার নিরসন করা, (খ) ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক এবং অন্যান্য অধিকারকে রক্ষা করা এবং তাদের দাবী দাওয়া সরকারের গোচরীভূত করা"।[২] কিন্তু স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রবর্তিত মুসলিম লীগের রাজনীতি ছিল বৃটিশ সহযোগিতা ও হিন্দু বিদ্বেষের রাজনীতি।

---

১. কো. আন্দ্রোনভা ও অন্যান্য - ভারত বর্ষের ইতিহাস, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃ. ৪১৭।

২. বশীর আল হেলাল, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ.৮।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম লীগের রাজনীতি হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে উঠার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি কারণ এই যে, "উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদ মূলতঃ ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ, আন্দোলনসমূহ ছিল হিন্দু ঐতিহ্য আশ্রয়ী"।[১] কিন্তু সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক ধারার এ উত্থান পরবর্তী ভারতের রাজনীতি ও ইতিহাসের পরিণতিকে প্রভাবিত করে, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারক হয়ে দেখা দেয় ।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করেন । এই বঙ্গভংগের উদ্দেশ্য ছিল বাংগালী জাতি সত্তাকে দ্বিখন্ডিত করে, বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের অভিমুখকে পাল্টে দিয়ে তাকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বিরোধের আবর্তে নিক্ষেপ করা । জাতিগত বিকাশের দিক থেকে বাংগালীরা ছিল অগ্রগামী । বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলিম বাংগালীর বিরোধ সত্বেও জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটে । এই বংগভংগের বিরুদ্ধে সারা ভারতে ব্যাপক বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয় । উনিশ শতকের শুরু থেকে জংগী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, পরবর্তীতে স্বদেশী আন্দোলনসহ বৃটিশ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন চলতে থাকে ।

ভারতে জঙ্গী জাতীয়তাবাদী ধারার সশস্ত্র বিদ্রোহ একমেই ব্যর্থ হতে থাকে । ফলে এই ধারার একাংশ নতুন পথের সন্ধান করতে শুরু করে । এদেরই একাংশ ১৯২০ সালের দিকে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে তুলতে প্রণোদিত হয় এবং পরবর্তীকালে বহু সন্ত্রাসবাদী ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন । এইভাবে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে উঠার সাথে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির একটা সম্পর্ক পাওয়া যায় ।

---

১. ডঃ নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, পৃ. ৫১ ।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও "প্যান ইসলামী" ভাবধারার অনুসারী খিলাফৎ আন্দোলনকারী একটি অংশ কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়। প্যান ইসলামবাদ ছিল বৃটিশ বিরোধী। সৈয়দ আহমদের মুসলমানদের বৃটিশ সহযোগিতার নীতির বিরুদ্ধে ছিল প্যান ইসলামী ভাবধারা। ভারত ত্যাগী মোহাজিরদের একাংশ কমিউনিষ্টদের সংস্পর্শে এসে যখন উপলব্ধি করল যে তুরস্কের কামাল পাশা খিলাফৎ প্রতিষ্ঠার জন্য নয় বরং নিজদেশ তুরস্কের স্বাধীনতার জন্যেই লড়ছেন। এই উপলব্ধি থেকে ১৯২০ সালের দিকে মোহাজির তরুনদের একাংশ প্রবাসে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, যে, ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট চেতনা ও সংগ্রাম বিকাশের রাজনৈতিক প্রধান পটভূমি ছিল ভারতে বৃটিশ ঔপনিবেশ এবং তার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম। ভারতের এই জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামই ছিল ভারতের রাজনীতির প্রধান স্রোতধারা। ভারতের এই স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে বিভিন্ন রাজনৈতিক ধারা লক্ষ্য করা যায় ঃ নিয়মতান্ত্রিক বে-সামরিক ধারা, জংগী জাতীয়তাবাদী সশস্ত্র ধারা ইত্যাদি। এছাড়াও ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম ধর্ম ভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রাবল্য যা ভারতের জাতীয় মুক্তির সংগ্রামকে বিভ্রান্ত ও দুর্বল করেছে। ভারতের রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত এহেন পরিস্থিতির মধ্যে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের ফলে এবং তার প্রভাবে ভারতে ১৯২০ সালের প্রথম মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট নামে আরো একটি রাজনৈতিক ধারার অভ্যুদয় ঘটতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

২.২ উপমহাদেশে ও বাংলায় কমিউনিষ্ট আন্দোলনের বিকাশ

উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইউরোপে মার্কসীয় দর্শন ও রাজনীতির প্রভাব গড়ে উঠতে থাকে। ১৮৪৮ সালে কার্ল মার্কসের 'কমিউনিষ্ট পার্টির ইশতেহার' সমগ্র ইউরোপে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই সময়কালে ইউরোপে সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিষ্ট ভাবাদর্শ অনুসারী রাজনৈতিক দল ও সংগ্রাম গড়ে উঠলেও তৎকালীন অখন্ড পাক-ভারত উপমহাদেশ-ভুক্ত অঞ্চলে কোন মার্কসবাদী দল গড়ে উঠেনি। বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে অনেকেই মার্কসীয় সাহিত্যের সাথে পরিচিত হয়ে উঠেন। বিত্তবাণ শ্রেণীর শিক্ষিত বাংগালীর অনেকেই উচ্চ শিক্ষার্থে ইউরোপ গমনের মধ্যদিয়ে সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদ এসকল ভাবধারার সাথে প্রাথমিকভাবে পরিচিত হন। কিন্তু মার্কসীয় ভাবধারার সাথে তাদের পরিচয় থাকলেও ভারতে মার্কসবাদ তখনও পর্যন্ত কোন দলীয়, সামাজিক বা রাজনৈতিক সংগ্রাম হিসাবে আবির্ভূত হয়নি।[১]

১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব শুধু ইউরোপেই নয়, সমগ্র দুনিয়া জুড়ে মার্কসবাদকে পরিচিত করে তোলে। রুশ বিপ্লবের উত্তাপ এসে ভারতবর্ষে আলোড়ন তোলে। রুশ বিপ্লব সমাজের শিক্ষিতদের মধ্যে প্রভাব তৈরী করে। " রুশ বিপ্লবের ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সোশ্যালিজম, কমিউনিজম, এনার্কিজম, প্রভৃতি কথাগুলি এবং মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, ট্রটস্কি প্রভৃতি নামগুলি বেশ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়"।[২] এ অঞ্চলে মজুর-নিপীড়িত শ্রেণী রুশ বিপ্লব অনুসরণে এদেশে শোষণ মুক্তির সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হয়েছিল'।[৩] রুশ বিপ্লব

---

১. উনিশ শতকে এদেশে মার্কসবাদী কোন দল গড়ে না উঠলেও, উনিশ শতকের শেষভাগে ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে সমাজতন্ত্রী, মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তি বিশেষের এই উদ্যোগ পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২. জ্ঞান চক্রবর্তী, ঢাকা জেলার কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অতীত যুগ, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৭, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের দেশের মজুরদের সামনেও আশার আলো তুলে ধরেছিল "।[১] এর প্রভাবে ১৯২০ সালে সারা ভারতে 'মজদুর ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা রুশ বিপ্লবের প্রভাবে গঠিত প্রথম গণসংগঠন। যদিও তখন পর্যন্ত মার্কসবাদ ভারতে কোন দলীয় আদর্শ হয়ে উঠেনি।

এই সময়কালে রুশ বিপ্লবের প্রভাবে 'শোষণ মুক্তি', 'মজদুর কৃষক রাজ', এসব রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শ্লোগানগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। এর মধ্য দিয়ে একটি বিষয় বেরিয়ে আসে তা'হলো এই যে, ভারতবর্ষে রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে যে আগ্রহ তৈরী হয়েছিল তা রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক মতবাদ হিসেবেই এদেশে আবির্ভূত হয়। মার্কসবাদের এই প্রারম্ভিক প্রবেশের সময় তা' দর্শন হিসাবে চিন্তাশীল বিচারমূলক গ্রহণের মধ্যদিয়ে গৃহীত হয়নি। এমনকি সে সময়ে সামাজিক অর্থনৈতিক মতবাদ হিসাবে মার্কসবাদ বিজ্ঞান হিসাবে নয়, প্রধানতঃ গৃহীত হয়েছিল নৈতিক বিবেচনায়। এর প্রমান মিলে দীপান্তরের বন্দী নলিনী দাসের স্বীকৃতিতে "কেউ জিজ্ঞাসা করলে তখনকার দিনে জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী আনুরিকভাবেই বলেছি: " আমরাওতো সমাজতন্ত্রবাদ চাই। প্রথমে ইংরেজকে তাড়াতে হবে, দেশকে স্বাধীন করতে হবে। আমাদের গরীব (অনুন্নত) ধর্মীয় গোড়ামীতে আচ্ছন্ন দেশের সকল মানুষের দুঃখ-কষ্ট ঘোচাব, সকল মানুষের সমঅধিকারই - কায়েম করব - এইতো স্বাধীনতা, ইত্যাদি "[২]। নলিনী দাসের উপরোক্ত উক্তি প্রমান করে সমাজতন্ত্র তখনও এদেশে বিজ্ঞান হয়ে উঠেনি, সমাজতন্ত্র গৃহীত হয়েছিল 'ভাল' কিছু একটা করার সৎ ও আনুরিক নীতিনিষ্ঠ আবেগ থেকে। ভারত ও বাংলায় মার্কসবাদী চিন্তার প্রাথমিক উন্মেষ ছিল আবেগ তাড়িত। তা দর্শন হিসাবে নয়, ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয় হিসাবে, জনশ্রুত ও ভাসা ভাসা ধারণা থেকে আবেগ উচ্ছ্বাসজনিত।

---

১. মুজফফর আহমদ, আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি, খান ব্রাদার্স এন্ড কোঃ, ঢাকা, বাংলাদেশ সংস্করণ, ১৯৭৭, পৃ. ১৪।

২. নলিনী দাস, স্বাধীনতা সংগ্রামে দীপান্তরের বন্দী, প্রকাশ ভবন, বাংলা বাজার, ১৯৭৫, পৃ. ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

জঙ্গী জাতীয়তাবাদী সশস্ত্র ধারার 'অনুশীলন সমিতি' থেকে পরবর্তীকালে অনেক মার্কসবাদী তৈরী হয় । এই সন্ত্রাসবাদী ধারা থেকে আগতদের উদ্যোগেই ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হয় । এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় ভারতের বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট নেতা মুজফফর আহমদের ভাষায়, "উনিশ' ত্রিশের দশকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা জেলখানায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পড়েছিলেন এবং তাদের ভিতর হতে বহুসংখ্যক লোক ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন"।[১]

উপরে উল্লেখিত পরিস্থিতিতে ১৯২০ সালে প্রবাসে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দ শহরে, ১৭ই অক্টোবর । এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মানবেন্দ্র নাথ রায় সহ অন্যান্যরা ।

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন ও মার্কসীয় ভাবাদর্শের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহণ

১৯২১ সালে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হয় "ইণ্ডিয়া হাউজে", এটি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম সূচনা । ইতিপূর্বে ১৯২০ সালে প্রবাসে ভারতের কমিউষ্ট পার্টির ভিত্তি স্থাপিত হলেও ভারতে কমিউনিষ্টদের বাস্তব কর্মকাণ্ড ১৯২১ সাল থেকে শুরু হয়েছিল । ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির বাস্তব কর্মকাণ্ড বিকাশে বাংলাদেশের সন্দ্বীপের সন্তান মুজফফর আহমদ ছিলেন অগ্রণী । ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের মধ্যদিয়ে মার্কসীয় ভাবাদর্শ এই প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহণ করে । কিন্তু এ সময় ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাগণ নিজেরা মার্কসবাদের দার্শনিক দিক সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না । ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মুজফফর আহমদ যে আত্ম স্বীকৃতি

---

১. মুজফফর আহমদ, আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি, পৃ. ১১ ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রদান করেছেন তা এ সত্যকেই প্রমাণ করে। মুজফ্ফর আহমদ বলেন, "আমার মার্কসবাদের জ্ঞান ছিল ভাসা ভাসা। তবে আমি দু'টি জিনিস সম্বল করে অকূল সাগরে ঝাঁপ দিয়েছিলাম'। তার একটি ছিল জনগনের উপর ভরসা আর দ্বিতীয়টি ছিল কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের নির্দেশের প্রতি অকুণ্ঠ নিষ্ঠা"।[১] এর মধ্যদিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তৎকালীন নেতৃত্ব মার্কসবাদ ও তার দর্শনের সচেতন সম্যক উপলব্ধির ভিত্তিতে কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে গড়ে তুলতে পারেনি। তা ছিল অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ততা, জনগনের উপর ভরসা ও কমিউনিষ্ট ইন্টার-ন্যাশনালের প্রতি আস্থা থেকে চালিত। মার্কসীয় চিন্তার সম্যক উপলব্ধি ছাড়াই এদেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলন মার্কসবাদের ভালত্বের কথা শুনেই মার্কসবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী দায়িত্ব পালন করতে চেষ্টা করে।

১৯২০ সালে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম মুদ্রিত ইস্যুহার প্রকাশিত হয়। এই ইস্যুহার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক করণীয় নির্ধারণের পাশাপাশি ইস্যুহারে কিছু দার্শনিক বক্তব্যও পরিলক্ষিত হয়। যেমন ইস্যুহারে বলা হয়েছে, "ভারতীয় জনসাধারণ কেবল বিদেশী শাসনের চাপেই নয়, আপন দেশের ধর্ম ও সমাজের হাজার কুসংস্কারের নাগ-পাশে অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে ডুবে রয়েছে", "জাতীয় কংগ্রেসকে কিছুতেই মুষ্টিমেয় ব্যক্তির ভাববাদী আদর্শের পথে ভেসে গেলে চলবে না", "রাজনৈতিক কচ-কচি আর সংস্কারবাদের পরিবর্তে কতগুলি ভাববাদী আদর্শ আর রাজনৈতিক বিভ্রান্তির মধ্যে গিয়ে পড়লেও বিশেষ কোন সুবিধে হবে না", "ধোঁয়াটে ভাববাদের স্বপ্ন চূড়া থেকে তাদের নিয়ে আসতে হবে",[২] ইত্যাদি ইত্যাদি।

---

১. মুজফ্ফর আহমদ, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ, প্রতিপক্ষ প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১০।

২. ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির ১৯২০ সালের প্রকাশিত প্রথম মুদ্রিত ইস্যুহারটি মুজফ্ফর আহমদের আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি, গ্রন্থে পূর্ণ আকারে রয়েছে। ইস্যুহারের উল্লেখিত উদ্ধৃতির জন্যে উক্ত গ্রন্থের ১২৭, ১২৮ ও ১২৯ পৃ. দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

এই ইস্যুহারে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ধর্ম ও ভাববাদের বিরোধিতা করলেও মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম পালনে হস্তক্ষেপ না করার পক্ষপাতী ছিল। এই ইস্যুহারে রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করে সেক্যুলার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছিল।

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির এই প্রথম মুদ্রিত ইস্যুহারের উপরোক্ত বক্তব্যগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এতে সাধারণভাবে ভাববাদ ও ধর্মীয় আধিপত্যের বিরোধিতা করা হয়েছে। কিন্তু ভাববাদের বিরোধিতা করা হলেও মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নিয়ে কোন কথা ছিল না। নিজস্ব দলীয় দর্শন সম্পর্কে কিছুই এতে বলা হয়নি। এমনকি মার্কসবাদ দলীয় মতাদর্শ এই স্বীকৃতিটুকুও পর্যন্ত ইস্যুহারে ছিলনা। এসবের মধ্যদিয়ে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মার্কসবাদ তখনও পর্যন্ত ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কাছে অর্থনৈতিক-সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবে অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। মার্কসবাদের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের দিকটি তেমন গুরুত্ব লাভ করেনি। মার্কসকে একজন অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক হিসাবেই তারা গ্রহণ করেছিলেন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে দর্শন হিসাবে বিচার বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে গ্রহণ করে ভাববাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয় নি। তবে পার্টির বিভিন্ন রচনায় ভাববাদ বিভ্রান্তিকর ও অগ্রহণযোগ্য এমন কিছু বিক্ষিপ্ত মন্তব্য পরিলক্ষিত হয়।

ভারতে সন্ত্রাসবাদের মধ্য থেকে মার্কসবাদের অভ্যুদয়

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে একটা বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়েছিল যা সন্ত্রাসবাদ হিসাবে সমধিক পরিচিত। এই সন্ত্রাসবাদী ধারার রাজনীতি সবচেয়ে বেশী জোরদার হয়েছিল বাংলায়। ভারত-বাংলায় মার্কসবাদী রাজনীতির পত্তন যাদের মধ্যদিয়ে হয়েছিল, তাদের অধিকাংশই ছিলেন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন থেকে আগত। ফলশ্রুতিতে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি ও মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রাধান্য লক্ষ্য করা

Dhaka University Institutional Repository

যায় । "মহান নভেম্বর বিপ্লবের পর থেকেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মূলতঃ দুইটি শ্রেণীর, ধনীক শ্রেণী ও সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর, দৃষ্টিভংগী স্পষ্ট প্রতিফলিত হতে শুরু করলেও প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৃতীয় তথা বিপ্লববাদী পথই নিয়েছিল"।[১]

বৃটিশ সরকারের বিভিন্ন বন্দী শিবিরগুলোতে সন্ত্রাসবাদীরা মার্কসবাদের সাথে পরিচিত হন । " আন্দামান, দেউলী ক্যাম্প, বক্সা ক্যাম্প, হিজলী ক্যাম্প, বহরমপুর ক্যাম্প ও অন্যান্য জেলে ও অনুরীণে হাজার হাজার বিপ্লবী কর্মী কমিউনিজম চর্চার ভিতর দিয়ে পথের নির্দেশ খুঁজিতে আরম্ভ করেন"।[২] জাতীয়তাবাদী সন্ত্রাসবাদী ধারার বিপ্লবীরা জেল খানায় মার্কসবাদ গ্রহণ করেন । এবং ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন । সন্ত্রাসবাদী বন্দীদের মধ্য থেকে প্রায় পঞ্চাশি ভাগ কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেয় । **"It was in Jails and deten camps in the early and mid 1930's that perhaps as many as fifty percent of the torrorist converted to Marxism"**[৩] এইভাবে সন্ত্রাসবাদী ধারার মধ্য থেকে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে উঠতে থাকে । ফলশ্রুতিতে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি মর্মের দিক থেকে এবং কার্যতঃ মার্কসীয় দর্শন ও ভাবাদর্শ ভিত্তিক কমিউনিষ্ট পার্টি না হয়ে বলা যায় মার্কসবাদ প্রভাবিত কমিউনিষ্ট নাম গ্রহণকারী মধ্যবিত্তের আবেগ উচ্ছাস ও সাহস সম্পন্ন দল হিসাবে গড়ে উঠেছিল । এ কারণেই ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিতে মার্কসবাদী ধারার সাথে সন্ত্রাসবাদী ধারার একটা বিরোধ ছিল । আর এসব কারণেই ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিতে মার্কসীয় দর্শনের যথার্থ চর্চা ও অনুশীলনের দুর্বলতা ছিল বলে মনে হয় ।

---

১. নলিনী দাস, স্বাধীনতা সংগ্রাম দীপান্তরের বন্দী, পৃ. ২৭ ।

২. জ্ঞান চক্রবর্তী, ঢাকা জেলার কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অতীত যুগ, পৃ. ১৬ ।

৩. **David M. Laushey, Bengal Terrorism and the Marxist left, Firma K.L. Mukho Padhyay, Calcutta, 1975, p. 86.**

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ঃ বহু মতাদর্শগত বিরোধ

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি বহু মতাদর্শ ও দর্শনে আস্থাবানদের সম্মিলনস্থল ছিল। এর অন্যতম কারণগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ-

ক) বৃটিশ বিরোধী জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম ;

খ) সন্ত্রাসবাদ ও বিভিন্ন মতাবলম্বীর প্রভাব ; এবং

গ) দলের অভ্যন্তরে মার্কসীয় ভাবাদর্শগত দুর্বলতা ।

ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তখনকার ঐতিহাসিক বাস্তবতায় ভারতের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম ছিল প্রধান রাজনৈতিক কর্মসূচী । জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ মনো-ভাব থেকেই মার্কসবাদী না হয়েও অনেকেই কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন । ভারতের কমি-উনিষ্ট পার্টি কর্তৃক 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' এর জন্য ১৯২২ সালে গৃহীত কর্মসূচী 'গয়া প্রোগ্রাম' হিসেবেও পরিচিত। এই গয়া প্রোগ্রামে বলা হয়," বস্তুতঃ আমাদের আন্দো-লনে যে নানান পথের নানান স্বার্থের লোকেরা যোগ দিয়েছেন তাঁরা নিজ নিজ মতলব অনু-যায়ী তা করছেন । এত অনিশ্চিত উদ্দেশ্য নিয়ে কোন আন্দোলন শক্তিশালী হতে পারে না। পক্ষান্তরে এইভাবে চালালে আন্দোলন দুর্বল হয়ে যায় । কংগ্রেসের পতাকাতলে যথাসম্ভব বিপ্লবী শক্তিসমূহকে সমবেত করার জন্যে একটি সংগ্রামশীল কাজের প্রোগ্রাম তাই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে" ।[১] উপরোক্ত ঘোষণায় স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল যে, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিতে 'নানা পথের' 'নানা স্বার্থের' লোক সমবেত হয়েছিল । এটা প্রমাণ করে যে ভার-তের কমিউনিষ্ট পার্টি মার্কসীয় দর্শনে সমভাবে আস্থাবানদের দল ছিল না ।

এই গয়া কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । প্রথম, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে প্রধান করণীয় হিসাবে নির্ধারণ করা, দ্বিতীয়তঃ এই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে কংগ্রেসের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে কংগ্রেসকে সহায়তা করার কৌশল

---

১. মুজফ্ফর আহমদ, আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি, পৃ. ২৪৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করা । গয়া ঘোষণার মধ্যদিয়ে প্রমাণ হয়ে যায় যে, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি মার্কসীয় দর্শন ভিত্তিক এক মতাদর্শ কেন্দ্রীক কোন দল ছিল না । জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম প্রধান হওয়ায় এবং পার্টি নিজেকে কংগ্রেসের সহযোগী হিসাবে কর্মকৌশল নির্ধারণ করার কারণে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি কার্যতঃ মার্কসীয় দর্শন ও রাজনীতিকে প্রধান বিষয় হিসাবে আনতে পারেনি । এ প্রসংগে - **W. Miller** বলেন, **"An observer of a Communist party is confronted with a special problem of analysis, for such a party functions not in one environment but in two. It is both an element of the international communist community and an element of a national political community. It interacts with both of these contexts, and it is thus enmeshed in an exceedingly complex web of... influences".**[১]

ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম, যা প্রধানতঃ শ্রেণী সংগ্রাম নয়,যেখানে শ্রেণী নির্বিশেষে জাতীয় মুক্তি অর্জনের বিষয়টি প্রধান । অপরদিকে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন । এই দুই প্রেক্ষাপটের জটিলতার মধ্যদিয়ে ভারতের মার্কসবাদী আন্দোলন অগ্রসর হয় ।

ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে মার্কসবাদ বনাম গান্ধীবাদ

করমচাঁদ গান্ধী ১৯১৫ সালে ভারতে এসে জাতীয় রাজনীতিতে যোগ দেন । এবং পরবর্তীকালে গান্ধী কংগ্রেসের ও ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন । গান্ধী ছিলেন ভাববাদী এবং রাজনৈতিক সংগ্রামে অহিংস গন্ধার অনুসারী । ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গান্ধীর নেতৃত্ব ও ভাবাদর্শ দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত

---

১. **Gene D. Overstreet, and Marshall Windmiller, Communism in India, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1959, p. 3.**

Dhaka University Institutional Repository

ছিল । জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে গান্ধীবাদের প্রভাব ছিল খুবই শক্তিশালী । গান্ধীবাদ সে সময় এতই শক্তিশালী ছিল যে, এর বিরুদ্ধে কথা বলা রীতিমত দুঃসাহসিক কাজ ছিল । এ প্রসংগে ভারতের প্রখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা মুজাফফর আহমদ বলেন, "ঐ সময় গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে কলম ধরার জন্য শক্ত বুকের পাটার দরকার ছিল" ।[১]

কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল বিরাজমান ব্যবস্থায় সাংবিধানিকভাবে অংশ গ্রহণ করা । **" The aim of the organization [Congress] was merely to secure, by constitutional means, greater Indian participation in the existing system of Government."**[২] বৃটিশ সহযোগী এই অহিংস সাংবিধানিক পন্থা ভারতের শিক্ষিত ও মধ্যবিত্তদের একটি বড় অংশই গ্রহণ করেনি । তারা গান্ধীবাদকে বৃটিশদের সহযোগিতা করার মতাদর্শ হিসাবে বিবেচনা করতেন । ভারত বাংলায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের একাংশ এসব কারণে সন্ত্রাসী পথ বেছে নিয়েছিলেন । অন্য অংশ তেমনি গ্রহণ করেছিল মার্কসবাদী চিন্তাধারা ও আদর্শ । তারা কেবল একে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির মতবাদ হিসাবেই নয়, গান্ধীবাদের বিকল্প মতাদর্শ হিসাবে মার্কসবাদকে একটি জীবন দর্শন হিসাবেও গ্রহণ করেন । এভাবে ভারতে সে সময়কার তরুন প্রজন্মের অনেকের কাছেই মার্কসবাদ গান্ধীবাদের বিকল্প মতাদর্শ হিসাবে গৃহীত হয় ।

---

১. মুজফফর আহমদ, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ, পৃ. ১১ ।

২. **Gene D. Overstreet and Marshall Windmiller, Communism in India, p. 14.**

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় মার্কসবাদী আন্দোলন

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির শাখা হিসেবে বাংলায় "কলিকাতা কমিটি" গঠন করা হয়েছিল ১৯২০ এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে। ভারতে বৃটিশ সরকার কর্তৃক মার্কসবাদী রাজনীতি শুরু থেকেই নিষিদ্ধ ছিল। তা সত্বেও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ১৯৩৫ সাল থেকে প্রকাশ্য কর্মকান্ড শুরু করে। ইতিপূর্বে গোপন তৎপরতা থাকার কারণে মার্কসবাদ ব্যাপক জনসাধারণের কাছে ছিল অপরিচিত। মার্কসবাদ সম্পর্কে যতটুকু ধারণা গড়ে উঠে-তা ছিল জনশ্রুত ও বিকৃত। কমিউনিষ্ট পার্টি প্রকাশ্যভাবে কাজ করার সিদ্ধান্তের ফলে ভারত বাংলায় মার্কসবাদ ব্যাপক মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে উঠবার সুযোগ ঘটে।

বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে বন্দী শিবিরগুলিতে আন্দোলন শুরু হয়। রাজনৈতিক দল সমূহ বন্দী মুক্তির দাবীতে বৃটিশ সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। ফলে সন্ত্রাসবাদী বন্দীরা মুক্তি পেতে থাকেন। সন্ত্রাসবাদী বন্দীরা জেলখানা থেকে মুক্ত হয়ে বাংলায় মার্কসবাদী আন্দোলন ও সংগঠন বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। ফলশ্রুতিতে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মকান্ড বিকশিত হতে থাকে। "আন্দামান জেল এবং বন্দী নিবাসগুলোতে যে সব বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কমিউনিষ্ট মতাদর্শ গ্রহণ করে-ছিলেন, তাঁদের একটা বড় অংশ ছিলেন পূর্ববঙ্গের সন্তান। ১৯৩৭-৩৮ সনে জেল ও বন্দী নিবাস থেকে মুক্ত হয়ে তাঁদের অনেকে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে নিজ নিজ জেলায় কমিউনিষ্ট পার্টি ও শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের কর্মতৎপরতার ফলে ১৯৩৭-৩৮ সন হতে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কমিউনিষ্ট সং-গঠন ও আন্দোলন গড়ে উঠতে শুরু করেছিল।"[১] এর পরবর্তীকালে পূর্ববাংলার অধিকাংশ জেলায় কমিউনিষ্ট পার্টির কমিটি গঠিত হয়েছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে জেলা কমিটি গঠিত

---

১. খোকা রায়, সংগ্রামের তিন দশক, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

হবার পূর্বেও পার্টির কর্মতৎপরতা ছিল, কিন্তু তখনো তা কমিটি হিসেবে ছিলনা। ১৯৪২ সালে বৃটিশ সরকার কমিউনিষ্ট পার্টি ও মার্কসবাদী রাজনীতির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। ফলে ভারত-বাংলায় মার্কসবাদ আইন সঙ্গত ভাবেই ব্যাপক জনগণের কাছে পৌঁছবার সুযোগ লাভ করে এবং বাংলায় মার্কসীয় রাজনীতি প্রকাশ্যরূপে প্রসার লাভ করতে থাকে। কিন্তু সে সময়কালে মার্কসবাদ যতোটানা দর্শন হিসেবে গৃহীত হয়েছে তার চাইতে কমিউনিষ্টদের ব্যক্তিগত সততা, জীবনবোধ এবং শোষণ মুক্তির কথা মানুষকে মার্কসবাদীদের প্রতি আকৃষ্ট করে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে কমিউনিষ্ট পার্টির ত্রাণ তৎপরতা জনগণের প্রশংসা লাভ করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারোধে কমিউনিষ্টদের ভূমিকা প্রশংসিত হয়। কিন্তু তবুও মানুষ মার্কসবাদ ও কমিউনিষ্টদের প্রতি আস্থাবান ছিলনা। এ প্রসঙ্গে প্রবীন কমিউনিষ্ট নেতা জ্ঞান চক্রবর্তী বলেন, "১৯৪২ সাল হইতে' ৪৫ সাল পর্যন্ত অবিরাম জনসাধারণের ভিতরে তাহাদের স্বার্থমূলক কাজ করিবার ফলে জিলার বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের বেশ কিছু প্রভাব সৃষ্টি হইয়াছিল ... কিন্তু যে পরিমান আমাদের জনপ্রিয়তা বাড়িয়াছিল সেই পরিমানে আমাদের রাজনৈতিক প্রভাব বাড়ে নাই। যাহাদের ভিতরে দীর্ঘদিন কাজ করিয়াছি তাহাদেরও অনেকের উপরে কংগ্রেস ও লীগের রাজনৈতিক প্রভাব ছিল বেশী। তাহাদের ধারণা ছিল আমরা ভাল লোক এবং জনসাধারণের স্বার্থে আমরা অনেক ত্যাগ স্বীকারও করিতে পারি এবং সেই দিক হইতে নির্ভরযোগ্য, কিন্তু তাহাদের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্খা পূরণ আমাদের মত ক্ষুদ্র একটি পার্টির মাধ্যমে সম্ভব নয়, উহার জন্য কংগ্রেস ও লীগই উপযুক্ত সংগঠন। জনসাধারণের ভিতরে এত কাজ করিয়াও আশানুরূপ রাজনৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করিতে না পারাতে পার্টির ভিতরেও বেশ কিছু সংখ্যকের মধ্যে একটা হতাশার সৃষ্টি হয়।"[১] জ্ঞান চক্রবর্তীর উপরোক্ত স্বীকৃতি থেকে উপলব্ধি করা যায় যে কমিউনিষ্টরা

---

১. জ্ঞান চক্রবর্তী - ঢাকা জেলার কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অতীত যুগ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৭, পৃ. ৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

'ভালমানুষ' 'জনদরদী' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল । কিন্তু মার্কসবাদী রাজনীতি ও দর্শন স্বীকৃতি পায়নি । এর অন্যতম একটি কারণ ছিলো ভারত-বাংলায় মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে ডানপন্থী ও ধর্ম ভিত্তিক দলগুলোর অভিযোগ ও প্রচারণা ছিল এই যে, মার্কসবাদীরা ধর্ম বিরোধী ও নাস্তিক । "কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে যথাক্রমে 'ধর্ম বিরোধী' ও 'ইসলাম বিরোধী' পরিচিতি তুলে ধরে সাধারণ মানুষদের মধ্যে ব্যাপক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।"[১] এর মধ্যদিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে অধ্যাত্মবাদ ও ধর্ম বিরোধী এ প্রচারণা এখানকার ধর্মভীরু মানুষের মধ্যে মার্কসীয় দর্শন গ্রহণযোগ্য না হয়ে উঠার ক্ষেত্রে অন্যতম কারণ হিসেবে বিরাজ করেছে । যদিও তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মার্কসীয় দর্শনের সাথে পরিচিত না থেকেই মার্কসবাদের প্রতি বিরূপ ছিল। ১৯৪৬ সালে ভারতের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । এই নির্বাচনে কমিউনিষ্ট পার্টি অংশ গ্রহণ করে । ১৫৮৩টি প্রাদেশিক পরিষদের আসনের মধ্যে ১০৮ জনকে মনোনয়ন দেয় এবং ৩ জন নির্বাচিত হন । নির্বাচনে কমিউনিষ্টরা প্রদত্ত ভোটের আড়াই শতাংশ পায় । ১৯৪৬-৪৭ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির কৃষক সংগঠন কৃষক সমিতির উদ্যোগে তেভাগা আন্দোলন এবং টংক প্রথা অবসানের দাবীতে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষতিপূরণ ছাড়া জমিদারী উচ্ছেদের দাবীতে 'লাঙ্গল যার জমি তার' - এই নীতির ভিত্তিতে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন হয়েছে । বাংলায় ১৯টি জেলায় প্রায় ৬০ লক্ষ কৃষক এ সকল আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে । সরকার এই কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে কঠোর নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ।

বাংলা ভারতের মার্কসবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলো এই যে, ভারতে মার্কসীয় আন্দোলন বিকাশের ক্ষেত্রে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি প্রধান ভূমিকা রাখলেও অনেক

---

১. জগলুল আলম, বাংলাদেশে বামপন্থী রাজনীতির গতিধারা, প্রতীক প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১১ ।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে ১৯৩০, ও ১৯৪০ এর দশকে 'দি লেবর-স্বরাজ পার্টি অফ দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' (১৯২৫), 'ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্টস পার্টি' (১৯২৫), দি বেঙ্গল পেজান্টস এণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি', (১৯২৬), 'ফরওয়ার্ড ব্লক' (১৯৩২), 'বলশেভিক পার্টি অফ ইণ্ডিয়া' (১৯৩৫), 'রেভ্যুলিউসনারী সোস্যালিষ্ট পার্টি' (১৯৪০),' রেডিক্যাল ডেমোএনটিক পার্টি' (১৯৪০), 'বলশেভিক লেনিনিষ্ট পার্টি' (১৯৪১), 'রেভ্যুলুসনারী কমিউনিষ্ট পার্টি' (১৯৪২), ভারত-বাংলায় মার্কসবাদী চিন্তার প্রসারে ভূমিকা রেখেছে ।

২. ৩ বাংলাদেশে মার্কসীয় আন্দোলন

ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের উৎপত্তি

ভারতের জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম বিকাশের পরিনতিতে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ আগষ্ট মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত স্বাধীন হয় । কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সাথে বৃটিশের সমঝোতার মাধ্যমে ভারতবর্ষকে হিন্দু ও মুসলিম এই দুই ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করে ভারত এবং পাকিস্তান নামক দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা হয় । এই দুই রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারিত হয় ধর্মের ভিত্তিতে। জাতীয়তা, ভাষা, সংস্কৃতির ভিত্তিতে নয় । ইতিপূর্বে ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ 'লাহোর প্রস্তাব' গ্রহণ করে যা পাকিস্তান প্রস্তাব হিসেবেও পরিচিত । এই লাহোর প্রস্তাবে মূল কথা ছিল ভারতের উপর পূর্ব ও উত্তর পশ্চিমাংশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র সমূহ (Independent States) প্রতিষ্ঠা করা।[১] কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ

---

১. States কথাটি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, অনেকে দাবী করে এতে দুটি রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে । জিন্নাহ একে ভুলবশত একটি অতিরিক্ত 's' এর ব্যবহার বলেন ।

Dhaka University Institutional Repository

ছিল উঠতি বণিকগোষ্ঠী ও সামন্তীয় ভূ-স্বামীদের দল । মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতিতত্ত্ব পূর্ব বাংলার শোষিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ধর্মানুসারী জনগণ গ্রহণ করে । এর অন্যতম কারণ ছিল এই যে- এখানকার জমিদারদের অধিকাংশ ঐতিহাসিক কারণে হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ছিল । জমিদারতন্ত্র থেকে মুক্তির জন্যে কৃষকরা পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল । তাই মর্মের দিক থেকে এ ছিল জমিদারতন্ত্র ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল লড়াই । কিন্তু সাম্প্রদায়িক মুসলিমলীগ দ্বিজাতিতত্ত্বের মোড়কে এর সাম্প্রদায়িক অভিব্যাক্তি দিতে সক্ষম হয় । অপরদিকে কংগ্রেসের নেতৃত্বর অধিকাংশ হিন্দু সম্প্রদায় থেকে আগত হওয়ার কারণে তা মুসলমানদের কাছে হিন্দুদের দল হিসেবেই থেকে যায় । "এভাবেই মর্মের দিক থেকে উপনিবেশবাদ বিরোধী প্রগতিশীল আন্দোলন, এই উপমহাদেশে, রূপের দিক থেকে সাম্প্রদায়িকরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে" ।[১] ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ও বিভক্তির ক্ষেত্রে কমিউনিষ্ট পার্টি কোন নির্ধারক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি । এতে করে ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলন এক বিপর্যয় ও সংকটের মধ্যে পড়ে । যদিও শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলনে কমিউনিষ্টদের শক্তিশালী সাংগঠনিক ভিত্তি ছিল । বড় বড় কৃষক আন্দোলন, তাঁরাই গড়ে তুলেছিলেন ।

১৯৪৮ সালে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলকাতায় ৬ই মার্চ পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম হয় । অবিভক্ত ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সাজ্জাদ জহির পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক হন । এই সময় পূর্ব বাংলায় কমিউনিষ্ট পার্টির প্রায় ১২ হাজারের মতো সদস্য ছিল ।

---

১. নুরুল কবীর, গণতান্ত্রিক মুক্তি আন্দোলনঃ মানুষের সৃজনশীল উত্থান প্রসংগে, নদী প্রকাশনা, ১৯৯১, পৃ. ১৩৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৮ সালের ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে বি.টি. রনদীভের রাজনৈতিক থিসিস গৃহীত হয়। পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত রনদীভের লাইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির মূল রাজনৈতিক শ্লোগান ছিল ' এই স্বাধীনতা হলো মিথ্যে স্বাধীনতা, লক্ষ মানুষ অনাহারে ' (ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়, লাখো ইনসান ভূখা হ্যায়)। রনদীভের লাইন অনুযায়ী পার্টির নীতি ছিল সরাসরি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধন করা এবং কৌশল ছিল শহরে বুর্জোয়া এবং গ্রামাঞ্চলে ধনী কৃষকদের হত্যা ও তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও বল প্রয়োগ করা। পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক স্বাধীনতার বিরোধীতা ও উগ্র সন্ত্রাসবাদী কর্ম কৌশল শেষাবধি পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে এক বিপর্যয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করে। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার এ থেকে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রচারণা ও নিপীড়নের সুযোগ গ্রহণ করে। " ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে জোর প্রচারণা চালায়। কমিউনিষ্টরা ' ধর্ম বিশ্বাস করে না ', 'ভারতের দালাল', কমিউনিষ্টরা 'পাকিস্তানকে হিন্দুস্তানে পরিণত করতে চায়', 'স্বাধীনতা মানে না' । এসব প্রচারণায় মানুষ বিভ্রান্ত হয় এবং মুসলিম লীগ সরকার কমিউনিষ্ট ও প্রগতিশীলদের ওপর প্রচণ্ড রকমের নিপীড়ন চালায়। এসবের ফলে কমিউনিষ্ট পার্টি দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।" [১]

এদেশে হিন্দু মুসলিম বিরোধ ও ধর্ম ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ মার্কসীয় দর্শন ও মার্কসবাদী আন্দোলন বিকাশের ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করেছে। শাসক শ্রেণী ইসলাম ধর্মকে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করায়। মার্কসবাদী আন্দোলনকে

---

১. আমজাদ হোসেন, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলন, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ২১ নভেম্বর সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ১৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থ বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করে "... **Communist in East Pakistan were faced with a number of tactical dilemmas, since they now found their ideology totally unwelcome among people who had been swayed by Islamic nationalism".** [১] এ থেকে দেখা যায় শোষক ডানপন্থী দলগুলি মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে ধর্মকে পাল্টা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। বস্তুবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কৌশল হিসেবে ডানপন্থীরা সাধারণ মানুষের ধর্মীয় বোধকে ব্যবহার করেছে ।

১৯৫১ সালে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট নেতাদের পাকিস্তান সরকার রাওয়ালপিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার করেন । এই সময়ে পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ জহির গ্রেফতার হন । ফলে পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত হয়ে আসে ।

১৯৫৯ সালে প্রাদেশিক কমিটির বর্ধিত সভায় রনদীভে লাইন 'বাম হঠকারী বিচ্যুতি' হিসেবে বর্জন করা হয় । সশস্ত্র সংগ্রামের কৌশল বাতিল করা হয় । গণতন্ত্র ও বাংলাদেশের স্বায়ত্বশাসনের সংগ্রামের ওপর জোর দেয়া হয় । ১৯৫১ সালে প্রাদেশিক কমিউনিষ্ট পার্টি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিবর্তে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নীতি গ্রহণ করে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক জোট গঠনের কৌশল নেয় । কমিউনিষ্ট পার্টি প্রকাশ্যে কাজ করার এবং গণ-ফ্রন্টের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির কৌশল গ্রহণ করে ।

১৯৫১ সালের এপ্রিলে কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে গঠিত হয় 'যুবলীগ" । যুবলীগ পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল । ১৯৪৮ সালের

---

১. **Talukder Maniruzzaman, Radical politics and the Emergence of Bangladesh, Bangladesh Books International Ltd., 1975, p. 6.**

Dhaka University Institutional Repository

২১শে মার্চ জিন্নাহ্ 'উর্দূই' হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' এই ঘোষণা দেন । এর বিরুদ্ধে বাংলা ভাষার দাবীকে কেন্দ্রকরে ভাষা আন্দোলন শুরু হয় এবং ১৯৫২ সালে তা চূড়ানুরূপ নেয় কমিউনিষ্ট পার্টি ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন এবং কমিউনিষ্ট কর্মীরা ভাষা আন্দোলনে সংগ্রামে অগ্রণী দায়িত্ব পালন করে । কমিউনিষ্ট পার্টি সমর্থিত যুব সংগঠন ও পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগ ভাষা আন্দোলনকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে । ভাষা আন্দোলন কেবলমাত্র ভাষা এবং সংস্কৃতির আন্দোলন ছিলনা, এই ভাষা আন্দোলন ছিল পাকিস্তানী শোষকদের কর্তৃক জাতিগত শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের এক প্রচন্ড স্ফুরণ । এ প্রসংগে বদরুদ্দীন উমর বলেন, "১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন মুষ্টিমেয় ছাত্র শিক্ষক বুদ্ধিজীবির আন্দোলন ছিল না, তা শুধু শিক্ষাগত অথবা সাংস্কৃতিক আন্দোলনও ছিল না । বস্তুতঃপক্ষে তা ছিলো পূর্ব বাঙালার ওপর সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার পাকিস্তানী শাসক-শোষক শ্রেণীর জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক বিরাট ও ব্যাপক গণ-আন্দোলন ।"[১] পাকিস্তান সৃষ্টির পর এদেশের উদীয়মান বাঙালী মধ্যবিত্ত বুঝতে থাকে পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঙালীর উত্থানের বিপক্ষে । পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি এই মোহ মুক্তি বাঙালীর জাতীয়তাবাদী সংগ্রামকে বিকশিত করে তোলে । বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের পরিণতিতে চুয়ান্নর নির্বাচনে যুওফ্রন্ট বিজয়ী হয় এবং শাসক মুসলীম লীগের ভরাডুবি ঘটে । ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিষ্ট পার্টি মুসলীম লীগের বিরুদ্ধে যুওফ্রন্টকে সমর্থন করে । ১৯৫৪ সালে ৯২/ক ধারা জারী করা হয় । যুওফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দেয়া হয় । ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে সরকার পাকিস্তানে কমিউনিষ্ট রাজনীতি বেআইনী ঘোষণা করে ।

---

১. বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, দ্বিতীয় খণ্ড, মওলা ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৩৮২ বাংলা, পৃ. "মুখবন্ধ" ।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে কমিউনিষ্টরা আত্মগোপন করে । এবং কিছু অংশ আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন পার্টিতে থেকে কাজ করার কৌশল গ্রহণ করে । বেআইনী ও গোপন অবস্থায় পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান এই দুই অঞ্চলের কর্মকান্ড পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়ে । "দুইটি বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয় । তাই স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি, পাকিস্তান ভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ ও কার্যকরী করতে ভৌগলিকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে (এসময় পার্টি বেআইনী থাকাতে এই বাধা প্রকটভাবে দেখা দেয়) । একটি কেন্দ্রের অধীনে দুইটি আঞ্চলিক শাখা পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়ে।"[১] এই পরিস্থিতিতে ১৯৫৬ সালে কলকাতায় গোপনে পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় । এই কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি স্বতন্ত্র কমিউনিষ্ট পার্টি হিসেবে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । এই কংগ্রেসেই আওয়ামী লীগের মধ্যে কাজ করার সিদ্ধান্ত হয় । তৃতীয় কংগ্রেসের পর পার্টির প্রথম কংগ্রেসে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপিত হয় । এই কংগ্রেসে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে গড়ার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল । অর্থাৎ ১৯৫৬ সনে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আওতার বাইরে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে গড়ার প্রথম পরিকল্পনা সর্বপ্রথমে কমিউনিষ্টদের চিন্তাতেই এসেছিল । এই প্রস্তাব, অবশ্য, ভোটাভুটিতে অগ্রাহ্য হয়ে যায় ।"[২] ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে টাঙ্গাইলের কাগমারী সম্মেলনে মার্কিন প্রশ্নে আওয়ামী লীগ দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে । ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে মার্কিন বিরোধীরা ঢাকায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করে । কমিউনিষ্টরা আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে ন্যাপ-এ কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ।

---

১. আবু জাফর মোস্তফা সাদেক, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলন, চলন্তিকা বই ঘর, ১৪, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ২৭

২. আমজাদ হোসেন, "বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলন", সাপ্তাহিক চিত্রা, ঢাকা, ২১ নভেম্বর, ১৯৮৬, পৃ. ২২ ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে দুটি সফল ঘটনা ঘটে । প্রথমত, ভাষা আন্দোলনকে সংগঠিত করা, দ্বিতীয়ত, 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' গঠন, যা ব্যাপক সাধারণ ছাত্রদেরকে একটি মার্কসবাদী ছাত্র সংগঠনে সমবেত করতে সক্ষম হয় । এই ছাত্র সংগঠনের মধ্য দিয়ে সংবেদনশীল তরুন মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের মধ্যে মার্কসবাদ দর্শন মতাদর্শ হিসেবে সচেতনভাবে গৃহীত হবার প্রক্রিয়া শুরু হয় । পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন এদেশের প্রথম অসাম্প্রদায়িক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছাত্র সংগঠন । ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে এই সংগঠনের প্রধান ভিত্তি ছিল - অসাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা ।[১] পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নই বাংলাদেশে মার্কসবাদকে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করে তোলে । পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগেই সমাজের সংবেদনশীল শিক্ষিত ছাত্রগণ ব্যাপকভাবে মার্কসবাদে দীক্ষিত হতে থাকে । মার্কসবাদ প্রভাবিত শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে । পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কমিউনিষ্ট পার্টির নূতন সদস্য সংগ্রহের অন্যতম মাধ্যম হয়ে ওঠে । **" East Pakistan students Union . . . . This gradually became one of the largest student organizations in East Pakistan and has since functioned as the main channel of recruitment for leftist caders".**[২] ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর সেনাবাহিনী প্রধান আইউব খান সামরিক শাসন জারী করেন । ফলে কমিউনিষ্ট পার্টির তৎপরতা আরো গোপনীয় হয়ে পড়ে এবং কমিউনিষ্ট পার্টি ও ন্যাপ নেতারা আত্মগোপন করতে বাধ্য হন ।

---

১. নিতাই দাস, ছাত্র ইউনিয়নের ইতিহাস প্রসঙ্গে, নয়া পল্টন, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃ. ১২ দ্রষ্টব্য ।

২. **Talukder Maniruzzaman, Radical Politics and the emergence of Bangladesh, p. 7.**

Dhaka University Institutional Repository

চীন সোভিয়েট মহাবিতর্ক এবং কমিউনিষ্ট পার্টির বিভক্তি

১৯৫৬ সালে সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির ২০ তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় । স্ট্যালিনের মূল্যায়ণ এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের নীতি ও কৌশলকে কেন্দ্রকরে বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলন দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে । সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি একদিকে অবস্থান গ্রহণ করে, অপর দিকে ছিল চীন ও আলবেনিয়া । ১৯৬৪ সালের দিকে সমগ্র পৃথিবীর কমিউনিষ্ট পার্টিগুলোর মধ্যে এই বিতর্ক চরম রূপ ধারণ করে । পৃথিবীর অধিকাংশ কমিউনিষ্ট পার্টি এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে । এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টিও এই বিতর্কে জড়িত হয় । কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা কর্মীরা মস্কোপন্থী ও চীনপন্থী এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে । এই বিতর্ককালে ১৯৬২ সালের ভারত চীন যুদ্ধ, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব, পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি, পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন ইত্যাদি বিষয়ে কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে মত-পার্থক্য দেখা দেয় । এই বিতর্ক ও বিরোধের ধারাবাহিকতায় ১৯৬৫ সালের এপ্রিলে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলনে কমিউনিষ্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন 'মেনন গ্রুপ' ও মতিয়া গ্রুপ' এই দুই ভাগে বিভক্ত হয় । শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য গণসংগঠনেও চলে ভাঙ্গনের প্রস্তুতি । ফলশ্রুতিতে ১৯৬৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি দ্বিখণ্ডিত হয় । এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে- মস্কোপন্থী কিংবা পিকিংপন্থী উভয় অংশই পার্টিকে অবিভক্ত রেখে মতাদর্শগত বিতর্ক অব্যাহত রাখার মধ্যদিয়ে বিতর্কের নিষ্পত্তি করার পদ্ধতি গ্রহণ করে নি । " কোন পক্ষই একই পার্টি কাঠামোর ভেতর মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাবার প্রয়োজন মনে করেননি ।"[১] এই বিভক্তির

---

১. আমজাদ হোসেন, " বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলন" সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ২১ নভেম্বর সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ২২ ।

Dhaka University Institutional Repository

ফলাফল ও পরিণতি বাংলাদেশে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড ক্ষতিকর হয়েছে যা বাংলাদেশের মার্কসবাদী আন্দোলনকে সবচেয়ে বেশী বিপর্যস্ত করেছে এবং কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ভবিষ্যৎকে দুর্বল করেছে ।

মাওলানা ভাসানী ও কমিউনিষ্ট আন্দোলন

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী যৌবনে খিলাফৎ আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন । ভাসানী ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদ বিরোধী । " রাজনীতিগতভাবে তিনি ছিলেন একজন কৃষক গণতন্ত্রী।"[১] বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাসের একটি পর্বের সফলতা/ব্যর্থতার সাথে মওলানা ভাসানী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত । ১৯৫০ সালের পর ভাসানীর সাথে কমিউনিষ্টদের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে । " ভাষা আন্দোলনের জীবনে মওলানা ভাসানীর সাথে কমিউনিষ্ট কর্মীদের যে পরিচয় ঘটে, তাই তাঁর জীবনে দৃষ্টি ভঙ্গির ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এনে দেয়। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের সৃষ্টি করে।"[২] মওলানা ভাসানী ইসলাম ধর্ম ও কমিউনিজমের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন । কমিউনিষ্টরা আওয়ামী লীগের মধ্যে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তাঁরা মওলানা ভাসানীকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয় । ১৯৫৩ সালে ভাসানীর উদ্যোগে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে ' মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া হয় । এতে করে আওয়ামী লীগ সেক্যুলার বৈশিষ্ট্য অর্জন করে । ১৯৫৭ সালে পররাষ্ট্র নীতি ও সাম্রাজ্যবাদ প্রশ্নে তিনি মার্কিন বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেন এবং ন্যাশনাল

---

১. বদরুদ্দীন উমর, " কমিউনিষ্ট আন্দোলন ও মওলানা ভাসানী", মওলানা ভাসানী, শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ৬৯ ।

২. রাশেদ খান মেনন, " মওলানা ভাসানী ও ছাত্র আন্দোলন " মওলানা ভাসানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১ ।

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করেন । আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরস্থ কমিউনিষ্টরা ভাসানীর সাথে ন্যাপের মধ্যে কাজ করেন । ১৯৬৭ সালের কমিউনিষ্ট পার্টির বিভক্তির পর পিকিংপন্থীরা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপের মধ্যেই থেকে যায় । ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভাসানীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । ১৯৭০ সালে কমিউনিষ্টদের সাথে ভাসানীর সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে । ন্যাপ ছিল একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক গণভিত্তিক দল । কিন্তু ন্যাপ-এর অভ্যন্তরস্থ কমিউনিষ্টরা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে গুরুত্ব না দিয়ে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লব, ৭০-এর নির্বাচন বর্জন ইত্যাদি সিদ্ধান্ত ন্যাপের উপর চাপিয়ে দেয় । এর ফলে ন্যাপ, ভাসানী, ও কমিউনিষ্টদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয় । এ প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর এর বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য । তাঁর মতে, "কমিউনিষ্টরা সে সময় [১৯৭০] সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের লাইন গ্রহণ করেছিলেন এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহণের কোন প্রশ্নই তাঁদের ছিলো না । .... কিন্তু তাঁদের সেই সিদ্ধান্ত তাঁরা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপের ওপর সংখ্যা-গরিষ্ঠতার জোরে চাপিয়ে দেওয়ার ফলে পার্টি বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল ন্যাপ সেই পর্যায়ে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রায় পঙ্গু হয়ে গেল । কারণ নির্বাচন বর্জন করার পর ন্যাপের সামনে কোন বিকল্প কর্মসূচী হাজির করা কমিউনিষ্টদের পক্ষে সম্ভব হলো না । এবং গোলটেবিল বৈঠক বর্জনের পর যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো তার থেকেও জটিল ও বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি এর ফলে সৃষ্টি হলো । কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচীর অবর্তমানে ন্যাপ পরিণত হলো একটি অকেজো সংগঠনে ।"[১]

মওলানা ভাসানী ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন ; যে কারণে ইসলামের অনুসারী হয়ে কমিউনিষ্টদের সাথে দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন।

---

১. বদরুদ্দীন উমর, " কমিউনিষ্ট আন্দোলন ও মওলানা ভাসানী" মওলানা ভাসানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

ভাসানী সমাজতন্ত্রের এক ইসলামী ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। 'রুবুবিয়ত'[১] ছিল তার এই সমন্বয় সাধনের ভিত্তি। শেষ জীবনে রাজনীতির প্রতি হতাশা থেকে তিনি ১৯৭৪ সালের ৮ই এপ্রিল গঠন করেন 'হুকমতে রব্বানিয়া সমিতি'। এই সমিতির এক বক্তৃতা থেকে ভাসানীর রাজনৈতিক দর্শন ও ধর্মদর্শনের পরিচয় ফুটে ওঠে। ভাসানী বলেন, "আমি বলিয়া থাকি, সকল সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। মানুষ ইহার আমানতদার মাত্র। তাই আল্লাহর নামে রাষ্ট্রের সকল সম্পদ প্রয়োজনের ভিত্তিতে সমানুপাতিক হারে বন্টন করিয়া ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ করিতে হইবে। কমিউনিষ্টরা ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ কামনা করেন বটে কিন্তু তাহাদের মতে উহা আল্লাহর নামে না হইয়া রাষ্ট্রের নামে হইতে হইবে। আলেম ওলামারা সব কিছুতেই আল্লাহর মালিকানা মানিয়া লইয়া থাকেন বটে কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ কামনা করেন না।"[২] মওলানা ভাসানীর এই বক্তব্য থেকে দেখা যায় তিনি চিরায়ত অর্থে মার্কসবাদী নন। তবে মার্কসবাদের আর্থ সামাজিক দিক গ্রহণের পাশাপাশি তিনি আল্লাহর প্রশ্নটিকে সামনে রেখে এ দু'য়ের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন।

ইসলামের অনুসারী মওলানা ভাসানীর মুখে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান এদেশে সমাজতন্ত্রকে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করেছে। ভাসানীর জনপ্রিয়তা গ্রহণযোগ্যতাকে সামনে নিয়ে কমিউনিষ্টরা এগুবার চেষ্টা করেছেন। এসব থেকে একটি বিষয় মনে হয় যে, এ দেশে মার্কসবাদ ও মার্কসীয় দর্শন ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ফলে এদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চাও তেমন প্রসার লাভ করেনি।

---

১. রুবুবিয়ত অনুযায়ী "সমাজের সকল সম্পদ ও ভূমির মালিক আল্লাহ, উত্তরাধিকারের মাধ্যমে বা কৌশলে ব্যক্তি সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার অধিকার ইসলামের মূলনীতির বিরোধী।" বশীর আল হেলাল, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, ঢাকা, পৃ. ৩২।

২. সৈয়দ আবুল মকসুদ, ভাসানী, প্রথম খণ্ড, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬, পৃ. ৫০২।

Dhaka University Institutional Repository

মাওসেতুঙ-এর দ্বন্দ্বতত্ত্ব ও কমিউনিষ্টদের বিভ্রান্তি

১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি বিভক্তির ফলে পিকিংপন্থীদের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৭ সালের আগষ্ট মাসে সিলেটে। মস্কোপন্থীদের থেকে পার্থক্য প্রদর্শনের জন্যে পিকিংপন্থীরা দলের নাম রাখেন 'পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী, সংক্ষেপে এম.এল.)। এই চৈনিকপন্থী কমিউনিষ্টরা মাওসেতুঙ চিন্তাধারার অনুসারী ছিল। মাওসেতুঙ চিন্তার প্রভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে তরুন ছাত্রদের একটি অংশ মাও চিন্তার অনুসারী হয়ে উঠে। এছাড়াও ১৯৬৭ সালের মে মাসে ভারতের নক্সালবাড়ীর সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থান দ্বারাও পিকিংপন্থীরা আলোড়িত হন। ১৯৬৭ সালের দিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বায়ত্বশাসনের প্রসঙ্গ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রধান বিষয় হয়ে উঠতে থাকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে, কৌশল ও শত্রু-মিত্র নির্ধারণ নিয়ে পিকিংপন্থীদের মধ্যে প্রচন্ড মতপার্থক্য দেখা দেয়। এসব বিষয়ে বিতর্ককে কেন্দ্র করে মাওসেতুঙ চিন্তাধারার অনুসারী মার্কসবাদীরা খন্ড বিখন্ডিত হয়।

পিকিং পন্থীদের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে যে বিভ্রান্তি তৈরী হয় তার দার্শনিক কারণ নিহিত ছিল মাওসেতুঙ-এর দ্বন্দ্ব তত্ত্বের উপলব্ধিকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে মাওসেতুঙ এর দ্বন্দ্বতত্ত্বকে সমাজ ও রাজনীতিতে প্রয়োগকে কেন্দ্র করে পিকিংপন্থীদের মধ্যে চরম মতপার্থক্য তৈরী হয়। মাওসেতুঙ তার দ্বন্দ্বতত্ত্ব আলোচনায় দ্বন্দ্বকে প্রধান ও গৌণ হিসেবে বিভাজন করেন। মাওসেতুঙ একই সময় অনেকগুলি দ্বন্দ্বের অস্তিত্বের কথা বলেন। "একটা জটিল বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়ায় অনেকগুলো দ্বন্দ্ব আছে, এবং এগুলোর মধ্যে একটা স্বভাবতঃই প্রধান দ্বন্দ্ব যার অস্তিত্ব ও বিকাশ অন্যান্য দ্বন্দ্বের বিকাশকে নির্ধারিত বা প্রভাবিত করে।"[১] মাওসেতুঙ এই প্রধান দ্বন্দ্বের কথা বলার পর প্রধান দ্বন্দ্বের আবার

---

১. মাওসেতুঙ, মাওসেতুঙ রচনাবলীর নির্বাচিত পাঠ, বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, পিকিং, গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনে মুদ্রিত, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৯, পৃ. ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান দিকের কথা বলেন ঃ" বস্তু প্রকৃতি প্রধানতঃ নির্ধারিত হয় দ্বন্দ্বের প্রধান দিকের দ্বারা ।"[১] কিন্তু মার্কস এঙ্গেলসের দ্বন্দ্ব তত্ত্বের ধারণায় দ্বন্দ্বের এই বস্তুমাত্রিকতার কথা নেই । দ্বন্দ্বের জন্যে দরকার পরস্পর বিপরীতের মধ্যে সম-বিরুদ্ধতা । এক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব তার বিরুদ্ধ শক্তি থেকে অসম হলে দ্বন্দ্ব বিরাজ করতে পারেনা । দ্বন্দ্বের গৌণ পক্ষটি তাতে করে মৃত (Dead) হয়ে যাবার কথা । দুর্বল গৌণ দ্বন্দ্ব লোপ মানেই হচ্ছে প্রধান দ্বন্দ্বেরও বিলুপ্তি ঘটবে । কেননা দ্বন্দ্বের শর্ত হচ্ছে - 'বিপরীতের একত্ব' । দ্বন্দ্বমান একটি দিকের অস্তিত্ব ছাড়া অপরটি থাকতে পারেনা । দ্বন্দ্ব একটি সামগ্রিকতা । কিন্তু মাওসেতুঙ যান্ত্রিকভাবে দ্বন্দকে বিভাজন করেছেন বলে মনে হয় । একথা যথার্থ বলেই মনে হয় যে, কোন সমাজে একই সময় অনেক দ্বন্দ্ব থাকতে পারে । কিন্তু বস্তুজগতে প্রধান দ্বন্দ্ব ও গৌণ দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব সম্ভব নয় । মাওসেতুঙ এক্ষেত্রে প্রকৃতি দর্শন ও সমাজে তার প্রয়োগের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি । মাও তার দ্বন্দ্বতত্ত্বকে প্রকৃতি জগৎ ও সমাজে সমভাবে প্রযোজ্য ভেবে একটা বিভ্রান্তি তৈরী করেছেন । মাওসেতুঙ এর প্রধান দ্বন্দ্ব ও গৌণ দ্বন্দ্বের ধারণা বস্তুজগতের ক্ষেত্রে যথার্থ নয় বলে মনে হয় ।

প্রধান দ্বন্দ্ব ও গৌণ দ্বন্দ্বের এই বিভ্রান্তিতে পড়ে মাও অনুসারীরা তখন পাকিস্তানী জাতিগত নিপীড়নের সাথে বাঙালীর জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম প্রধান, নাকি শ্রেণী দ্বন্দ্ব প্রধান তা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এক সমস্যায় পড়ে । পিকিংপন্থীদের একটি অংশ এই সময় শ্রেণী দ্বন্দ্বকে প্রধান মনে করে বাঙালীর জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামকে গৌণ করে দেখে । ফলে এই অংশ বাঙালীর জাতীয়তাবাদী মুক্তির সংগ্রামের মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । তাদের এই ভূমিকার কারণে পিকিং পন্থীরা জনগণের জাতীয়তাবাদী প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয় । এবং জনগণের কাছে অগ্রহণীয় হয়ে পড়েন । পিকিংপন্থীদের আরেক অংশ বাঙালীর জাতীয় মুক্তির ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রধান দ্বন্দ্ব মনে করে বাঙালীর জাতীয় মুক্তির স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে ।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

এইভাবে একটি দার্শনিক বিষয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের বিভিন্ন উপলব্ধি বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিকিংপন্থীরা মাওসেতুঙ এর দ্বন্দ্বতত্ত্ব দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছেন । এইভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে মাওসেতুঙ এর দার্শনিক চিন্তাধারা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিষ্টদের ভূমিকা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৬৭ সালের দিকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ব শাসনের প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । আওয়ামী লীগের নেতা হোসেন শহীদ সহরোয়ার্দীর মৃত্যুর পর বাঙালীদের মধ্যে পাকিস্তান বিরোধী মনোভাব বিকশিত হতে থাকে । বাঙালী সরকারী আমলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং অর্থনীতিবিদদের সমন্বিত চিন্তা থেকে ছয় দফা প্রণীত হয় । যার সাথে শেখ মুজিবের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল । ছয় দফা ছিলো একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঐতিহাসিক দলিল । যার মূল কথা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ব শাসন : **"The six Point Programme was a significant political economic document: Politically, it sought to establish a confederal system; economically, it was designed to put the East Pakistani resource management at the disposal of the Bengali elites . . ."** [১] ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আওয়ামী লীগ ছয় দফা ঘোষণা করে । ছয় দফা আন্দোলন শুরু হলে তা ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে । ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবের গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে

Emajuddin Ahmed (ed.), "The six Point Programme: its class Basis", Society and Politics in Bangladesh, Academic Publishers, Dhaka, 1989, p. 29.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৯ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ব্যাপক গণ-আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ), পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ সমন্বয়ে গঠিত সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা দাবী পেশ করে "যেটি আইয়ুব বিরোধী বৈপ্লবিক গণ-অভ্যুত্থানের প্রাণ হিসেবে কাজ করে।"[১] ১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান সংগঠিত হলে আইয়ুব খান সামরিক আইন জারী করে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালে আইন কাঠামোর (Legal Frame work, L.F.O) ঘোষণা করেন। এই অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন ইয়াহিয়া সরকার বিজয়ী দল আওয়ামীলীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের উপর নারকীয় আক্রমণ শুরু করলে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথে বাঙালী জাতির রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হয়। দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধে পাক বাহিনী পরাজিত হওয়ার মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন, সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। এখানে উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ কমিউনিষ্টরা সর্বপ্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি চিন্তা করলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থীরা ছিল স্বাধীনতার পক্ষে বিপক্ষে বহুধা বিভক্ত। তবে এক্ষেত্রে কমিউনিষ্ট-পন্থী ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সকল অংশই স্বাধীনতার পক্ষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে মস্কোপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টি '৭০ এর নির্বাচনের পক্ষে এবং বাংলাদেশের

---

১. হাসান উজ্জামান, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন, ভাষা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভ্রান্তি এড়িয়ে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে পিকিংপন্থী দলগুলি ১৯৭০ সালের নির্বাচনের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতার পক্ষে বিপক্ষে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৬৮ সালের দিক থেকে পিকিংপন্থী চিন্তাধারার অনুসারী দল পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি (এম.এল.) প্রধানত ছয় খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে বিপক্ষে বিভ্রান্তিমূলক ভূমিকা গ্রহণ করায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিষ্টরা নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির (এম.এল.) এর মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রশ্নে বিভ্রান্তিজনক পরিস্থিতি তৈরী হবার ক্ষেত্রে 'ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (এম এল) এর নেতা চারু মজুমদারের চিন্তা বিভ্রান্তি তৈরীতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। চারু মজুমদারের সাথে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির (এম.এল.) ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বলে মনে হয়। **"Charu Mazumdar attached a lot of importance to the activities of EPCP(M-L) in East Pakistan".**[১]

চারু মজুমদার ভারতের ভূ-স্বামীদের সাথে কৃষকদের দ্বন্দ্বকে প্রধান দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখেন। তিনি সামন্তবাদের সাথে ব্যাপক জনগণের বিরোধকে প্রধান বিরোধ মনে করতেন। এবং গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে মুক্ত এলাকা গঠন, ও শ্রেণী শত্রু নিধনের তত্ত্ব দেন। **"... He [Charu Mazumdar] assigned the task of the poor and landless peasants, who were to be the leaders of the agrarian struggles formation of armed squads in every village, collection of arms by seizing them from class enemies and police, seizure of crops and arrangements for hiding them and constant propogation of the politics of armed struggle".**[২]

---

১. Sumanta Banerjee, Idian's Simmering Revolution: The Naxalite Uprising, Zed Books Ltd.,London, 1984, p. 236.

২. Ibid, p. 78.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে পিকিং পন্থীদের একাংশ চারু মজুমদারের তত্ত্বে প্রভাবিত হয়ে জাতীয়-তাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামকে বাদ দিয়ে গ্রামাঞ্চলে ভূস্বামী, জোতদার নিধন করে সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ গড়ে তুলতে তৎপর হন। এদের কোন কোন অংশ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে 'মার্কিন দালাল পাকিস্তানী বুর্জোয়াদের সাথে 'মার্কিনী দালাল উঠতি বাঙালী বুর্জোয়ার বিরোধ হিসেবে মনে করে একে 'দুই কুকুরের লড়াই' হিসেবে চিহ্নিত করেন। এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তি বাহিনীর সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন।

এদেশের কমিউনিষ্টদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভ্রান্তিকর ভূমিকার কারণে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান নেতৃত্ব চলে আসে আওয়ামীলীগের হাতে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদান-কারী উঠতি বাঙালী বুর্জোয়ার দল আওয়ামীলীগ। স্বাধীনতা সংগ্রামের কমিউনিষ্টদের বিভ্রান্তিকর ভূমিকা বাংলাদেশে মার্কসবাদী রাজনীতির সম্ভাবনাকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। মার্কসবাদী রাজনীতির পরবর্তী বিকাশকে ব্যাহত করেছে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে মার্কসীয় প্রভাব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম

বাংলাদেশের রাজনীতিতে মার্কসবাদী আন্দোলনের প্রভাবে কতগুলি রাজনৈতিক সাফল্য অর্জিত হয়। মার্কসবাদী রাজনীতির প্রভাবে ধর্মভিত্তিক ও সাম্প্রদায়িক মুসলিম জাতীয়তা-বাদের চেতনা পরাস্থ হয়। এক্ষেত্রে মার্কসবাদীরা স্বতন্ত্রভাবে অথবা ভিন্ন দলে অবস্থান গ্রহণ করে সেক্যুলার রাজনীতির বিকাশে ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলাদেশে মার্কসবাদীরা মানুষকে বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভংগীসম্পন্ন করে তুলতে সক্ষম না হলেও তারা সেক্যুলার বা

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবকে বাংলাদেশে বিকশিত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী দায়িত্ব পালন করেছেন । সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক ধারার রাজনীতিকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে মার্কসবাদীদের অবদান অনস্বীকার্য্য । এ প্রসংগে বিশিষ্ট রাষ্ট্র বিজ্ঞানী তালুকদার মনিরুজ্জামান বলেন, " **The ideological revolution that established secularism and socialism as dominant themes of the Bangladesh liberation movement was initiated by the leftists of Eeast Bengal, but the autonomy movement that was spearheaded by the EPAL in the late 1960s represented a confluence of both radical and secular Bengali nationalism**".[১]

দ্বিতীয়তঃ পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার বিষয়টি সর্বপ্রথম এদেশে কমিউনিষ্টরাই ভেবেছেন । কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা কুমার মিত্র " ১৯৫০ সন থেকে... পূর্ব বাংলায় স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের কথা বলে আসছেন।"[২] ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে কুমার মিত্র, মারুফ হোসেন প্রমুখ পূর্ব বাংলায় আলাদা রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন । ১৯৫৬ সনের "এই কংগ্রেসে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে গড়ার প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয়েছিল । অর্থাৎ ১৯৫৬ সনে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আওতার বাইরে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে গড়ার প্রথম পরিকল্পনা সর্ব প্রথমে কমিউনিষ্টদের চিন্তাতেই এসেছিল । এই প্রস্তাব অবশ্য, ভোটাভুটিতে অগ্রাহ্য হয়ে যায় ।"[৩] এতদসত্ত্বেও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে মার্কসবাদীরা ঐক্যবদ্ধভাবে নানা বিভ্রান্তির কারণে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি ।

---

১. **Talukader Maniruzzaman, Radical Politics and the Emergence of Bangladesh, p. 53.**

২. আমজাদ হোসেন, " বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলন' সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ২১ নভেম্বর, ১৯৮৬, পৃ. ২২ ।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২ ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়তঃ বাংলাদেশে মার্কসবাদীদের অন্যতম আরেকটি অবদান হলো এই যে গেরিলা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করা সম্ভব - মর্কসবাদীরা স্বাধীনতা যুদ্ধের আগেই এই পূর্ব ধারণার প্রবক্তা । এই প্রসংগে তালুকদার মনিরুজ্জামান বলেন, "**The leftists in East Bengal were also the only politicians that had given some prior thought to (and raised public discussion about) the possiblity of guerrilla warfare and the other revolutionary tactics before the armed liberation struggle began in early 1971**"[১]

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রনয়ণ, মূলনীতিতে সমাজতন্ত্রের অধিষ্ঠানঃ মার্কসবাদীদের প্রতিক্রিয়া

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয় । এই সংবিধানে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদ-এ চারটিকে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয় ।

বাংলাদেশের সংবিধানে সমাজতন্ত্রকে একটি মৌল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মার্কসবাদীরা এদেশের রাজনীতিতে এবং জনগণের কাছে সমাজতন্ত্রকে একটি সামাজিক অর্থনৈতিক মতবাদ হিসেবে জনপ্রিয় করে তুলতে সক্ষম হন।

---

১. **Talukder Maniruzzaman, Radical Politics and the Emergence of Bangladesh, p. 3.**

Dhaka University Institutional Repository

যদিও ব্যাপক মানুষ কমিউনিস্ট দলগুলির সাথে সম্পৃক্ত ছিলনা, তথাপি সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আন্তর্জাতিক প্রচার ও এ দেশের কমিউনিস্টরা যে ধারণা প্রদান করে তার ফলে সমাজতন্ত্রে আর্থ সামাজিক মুক্তি ঘটবে- এই ধারণা ব্যাপক জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । এছাড়া ১৯৭১ সালের ছাত্র আন্দোলনেও সমাজতন্ত্রের দাবী ছিল । ৩রা মার্চ ১৯৭১ এ পল্টন ময়দানের 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' কর্তৃক 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচীর দ্বিতীয় দফায় বলা হয় " স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাংলা- দেশ' গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসন করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক শ্রমিক রাজ কায়েম করতে হবে।"[১] সংবিধানের মূল নীতিতে 'সমাজতন্ত্র' থাকলেও সংবিধানের ৪২,৪৭ ও ১৪ ধারায় অবাধ ব্যক্তিগত মালিকানায় স্বীকৃতি দেয়া হয় । সংবিধানে একই সাথে সমাজতন্ত্র ও অবাধ ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি প্রদানের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক মূলনীতির বিরোধিতা করা হয় । স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রথম সরকার আওয়ামী লীগ কৌশলগত কারণে সমাজতন্ত্রের কথা বলতে শুরু করে। "**Socialism was totally a tactical slogan that the Awami League adopted in 1969 as a result of mounting pressures from the students.**"[২] বাংলাদেশের সংবিধানে প্রণীত এই সমাজতন্ত্রকে প্রকৃত অর্থে মার্কসীয় সমাজতন্ত্র বলা যায় না । কার্ল মার্কস তাঁর প্রখ্যাত 'কমিউনিষ্ট পার্টির ইস- তেহার'-এ একে চিহ্নিত করেছিলেন 'রক্ষণশীল অথবা বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র' হিসেবে । মার্কসের ভাষায়," বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্বটা এক্সাগত বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই বুর্জোয়া শ্রেণীর একাংশ সামাজিক অভাব অভিযোগের প্রতিকার চায় ।.... এই রূপটার নিদর্শন হিসেবে প্রুঁধোর 'দারিদ্রের দর্শন' এর উল্লেখ করতে পারি । সমাজতান্ত্রিক বুর্জোয়ারা আধুনিক

---

১. হাসান উজ্জামান, <u>আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন</u>, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৪৫ ।

২. **Raonaq Jahan, Bangladesh Politics : Problems and Issues, University Press Limited, Bangladesh, Bangladesh, Dhaka, 1980, p. 98.**

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক অবস্থার সুবিধাটা পুরোপুরি চায়, চায়না তৎপ্রসূত অবশ্যম্ভাবী সংগ্রাম ও বিপদটুকু ।"[১] নব গঠিত বাংলাদেশে উদীয়মান বাঙ্গালী ধনীক শ্রেণীর সমাজতন্ত্রের ধারণা মার্কসবাদী কমিউনিষ্টদের সমাজতন্ত্রের ধারণা থেকে সম্পূর্ণই ভিন্ন ছিল । ১৯৭২ সালে এই সংবিধান প্রণয়নের পর মার্কসবাদী দলগুলি একে মেকী সমাজতন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করে । ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর ন্যাপ) এ সম্পর্কে অভিমত পোষণ করে তা' হলো, **"The Draft did not adequately provide for the establishment of socialism. Maximum limits to private property had not been fixed in the constitution."**[২]

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) সংবিধানে সমাজতন্ত্রের সংযুক্তি সম্পর্কে বলেন, **" The draft constitution was neither socialist, nor even democratic . . . . constitution would not help transition to socialism."**[৩] এ সম্পর্কে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের প্রতিক্রিয়া ছিল, **" It did not recognise "class conflict" nor was there any provision for**

---

১. কার্ল মার্কস ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, "কমিউনিষ্ট পার্টির ইশতেহার," কার্ল মার্কস ফ্রেডারিক এঙ্গেলস রচনা সংকলন, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২, পৃ. ৫২।

২. **Abul Fazl Haq. "Constitution - Making in Bangladesh," Bangladesh Politics, Emazuddin Ahmed (edited), Centre for Social Studies, Dhaka, 1980, p. 5.**

৩. **Ibid, p. 8.**

Dhaka University Institutional Repository

removing economic inequality and exploitation; accordingly the realisation of socialism was not possible through this constitution"[১]

শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের মতে, **" . . . The kind of socialism envisaged in the Draft as "socialism of abandoned property"**[২]

বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিক্রিয়া ছিল এই সংবিধান সংশোধনের অযোগ্য, **" draft constitution beyond correction"**[৩]

বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির মত ছিল, **" The draft constitution was on the whole democratic, though certain provisions were not. It was not a " socialistic" constitution, but under the present circumstances a socialistic constitution could not be expected from the present constituent assembly"**[৪]

বস্তুতঃ পক্ষে আওয়ামীলীগের সমাজতন্ত্র ছিল রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ । পাকিস্তানী মালিকদের পরিত্যক্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণগঠন ও পরিচালনার জন্যে তখনো পর্যন্ত বাঙালী ধনীক শ্রেণী গড়ে না ওঠায় প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য গ্রহণ করা । পরবর্তীকালে ব্যাক্তি পুঁজির বিকাশ হলে এর ধারাবাহিক পরিনতি হিসেবে শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যাক্তি মালিকানায় বিক্রি করে দেয়া শুরু হয় । এছাড়াও এই রাষ্ট্রীয়করণ ছিল ব্যাক্তির হাতে পুঁজির আদিম সঞ্চয়ণ প্রক্রিয়া," পুঁজিবাদী সঞ্চয়নের পূর্বেই দেখা দেয় আদিম

---

১. **Ibid**, পৃ. ৯ ।
২. **Ibid**, পৃ. ৯ ।
৩. **Ibid**, পৃ. ৮ ।
৪. **Ibid**, পৃ. ১০ ।

Dhaka University Institutional Repository

সঞ্চয়ন (অ্যাডাম স্মিথের 'পূর্বগামী সঞ্চয়ন'), সে সঞ্চয়ন পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রনালীর ফল নয়, বরং তার যাত্রা বিন্দু ।"[১] পুঁজির এই আদিম সঞ্চয়ন ঘটে লুণ্ঠনের মাধ্যমে। বাংলাদেশে সে পর্যায়ে রাষ্ট্রীয়করণের নামে পুঁজির আদিম সঞ্চয়নের জন্যে লুণ্ঠন নিষ্পন্ন হয়েছিল ।

বাংলাদেশে মার্কসবাদী আন্দোলন: স্বাধীনতা উত্তরকাল ১৯৭১-৯২

স্বাধীনতা উত্তরকালে আওয়ামীলীগ সরকার দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নানা কারণে সমাধান করতে সক্ষম হয়নি । এ পরিস্থিতিতে নতুন করে সংগ্রামের প্রেক্ষিতে তৈরী হয় । বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের প্রত্যাশা বৃদ্ধির পাশাপাশি চিন্তার ক্ষেত্রেও একটা বিপ্লবী উত্তরণ ঘটে । স্বাধীনতা উত্তর আওয়ামীলীগ সরকারের ব্যর্থতা ও অর্থনৈতিক এশ্মাবনতিতে মানুষের মোহভঙ্গ ঘটে । এই বিশৃঙ্খল ও অর্থনৈতিক সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে বামপন্থী রাজনীতি নতুন গতি লাভ করে ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তি যুদ্ধকে অধিকাংশ র‍্যাডিকাল বামপন্থী দলগুলি "অসমাপ্ত মুক্তি সংগ্রাম" হিসেবে মূল্যায়ন করে: **" The left revolutionary parties of Bangladesh are all agreed that the war for independence left the revolution unfinished. Some believe that the next step must be class war; others think that even the nationalist phase is not complete . . . "**[২] এই অসম্পূর্ণ বিপ্লব'কে সম্পূর্ণ করার রাজনৈতিক ভিত্তি থেকে শুরু হয় মার্কসবাদী আন্দোলনের নবতর পর্যায় । ১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগের একটি অংশ 'জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমাপ্ত হয়নি, এই বিবেচনা থেকে

---

১. কার্ল মার্কস, পুঁজি, খণ্ড ১, অংশ ২, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৮, পৃ. ২৬১ ।

২. **Talukder Maniruzzaman, "Bangladesh: An Unfinished Revolution," Bangladesh Politics, Edited by Emajuddin Ahmed, Centre for Social Studies, Dhaka, 1980, p. 51.**

Dhaka University Institutional Repository

'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে দলথেকে বের হয়ে আসে এবং ১৯৭২ সালের ৩১শে অক্টোবর 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিকদল' নামে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠন করে। এই সময় অন্যান্য মার্কসবাদী দলগুলি নিজেদেরকে পুণর্গঠিত করতে শুরু করে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের বিপক্ষে। এ অবস্থায় আওয়ামীলীগ সরকার প্রবল সমস্যায় নিপতিত হয়। এবং আওয়ামী লীগ সরকার বাম পন্থীদের প্রতিরোধের মুখে পড়ে। "আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরস্থ প্রগতিশীল ও বামপন্থী অংশ এবং বাইরের রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও এই প্রতি-বন্ধকতা বিনির্মানে মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।"[১]

বাংলাদেশের বামপন্থীরা স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্যদিয়ে গড়ে ওঠা বিকশিত প্রত্যাশা ও অগ্রসর রাজনৈতিক চেতনা এবং অসন্তোষ কাজে লাগিয়ে প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করতে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে মার্কসবাদীরা পূর্বের যেকোন সময়ের চাইতে আরো বেশী ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। **"The leftist forces in Bangladesh had become a much more powerful force than they had been in the former East Pakistan."**[২]

আওয়ামীলীগ সরকার বামপন্থীদের দ্বারা সৃষ্ট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। আওয়ামী-লীগ বিরোধী এই সংগ্রামে বামপন্থীদের মধ্যে জাসদ ও সর্বহারা পার্টি মূখ্য ভূমিকা পালন করে। এই সংগ্রাম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তরুন যুবকরাই অগ্রণী ভূমিকা রাখে। বিশেষত জা-সদ সমর্থিত ছাত্র লীগ শিক্ষাঙ্গণগুলিতে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। অপরদিকে প্রতিষ্ঠিত গতানুগতিক (**Traditional**) কমিউনিষ্ট ধারার বহুধাবিভক্ত পার্টিগুলি 'বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (লেনিনবাদী), সাম্যবাদী দল এবং পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি (এম-এল), স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব প্রদানে ব্যর্থতা, বিভ্রান্তির মূল্যায়ন নিয়ে এবং মতাদর্শিক,

---

১. জগলুল আলম, বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনীতির গতিধারা, প্রতীক প্রকাশন সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৭০।

২. **Talukder Maniruzzaman, The Bangladesh Revolution an its Aftermath, Bangladesh Books International Limited, Dacca, 1980, p. 174.**

Dhaka University Institutional Repository

তাত্ত্বিক বিরোধ বিতর্কে এই সময় ব্যস্ত ছিল। ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতা উত্তর সংগ্রামের নেতৃত্ব চলে যায় প্রধানত জাসদ এবং সর্বহারা পার্টির কাছে। এ প্রসঙ্গে তালুকদার মনিরুজ্জামান বলেন : "**While the younger JSD and Sarbohara leaders went aggressively out for support, the older leftists remained confined within their previous limited circles engrossing themselves in bitter and "infantile" debates about theoritical correctitude of their roles in the 1971 struggle. They thus failed to take advantage of the radical climate of post-liberation Bangladesh.**"[১] তবে এদের মধ্যে ইউনাইটেড পিপলস পার্টি, কমিউনিষ্ট পার্টি (লেনিনবাদী), সাম্যবাদী দল ও বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পার্টি এই সংগ্রামে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। এই সময় উল্লেখিত পার্টির বাইরেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক মার্কসবাদী গ্রুপ ছিল। এই সময় বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (মস্কো পন্থী) আওয়ামীলীগ সরকারের জাতীয়করণ নীতি, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রন, 'সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশসমূহের সাথে সুসম্পর্ক ও ভারতের সাথে সুসম্পর্কের নীতিকে সমর্থন দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করে। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে বলা হয়, "সরকারের উপরোক্ত নীতি সমূহকে আমরা শুধু সমর্থনই করিনি, আমরা এগুলোকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই নীতি ও কর্মসূচীগুলো আমাদের দেশে এক বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে বলে আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করি। সরকারের উপরোক্ত নীতিগুলোকে বাস্তবায়িত করে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ধরে অ-পুঁজিবাদী বিকাশের পথে এদেশকে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর করে নিতে সক্ষম হবো বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।"[২]

---

১. **Talukder Maniruzzaman, <u>The Bangladesh Revolution and its Aftermath</u>, Bangladesh Books International Limited, Dacca, 1980, p. 175.**

২. বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে "সাধারণ সম্পাদক আবদুস সালাম খানের স্বাগত ভাষণ", ঢাকা- ১৯৭৩, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, জুলাই ১৯৭৪, পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৪ - ৭৫ সালে র‍্যাডিক্যাল বামপন্থীদের তৎপরতা শেখ মুজিব সরকারকে বিপর্যস্ত করে তোলে। সরকার বামপন্থীদের মোকাবেলা করার জন্যে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ এবং প্রেস এণ্ড পাবলিকেসন্স এ্যাক্ট ১৯৭৩ প্রনয়ণ করে। ১৯৭৪ সালে পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি (এম-এল) ও সাম্যবাদী দলের প্রায় একশত কর্মী রাজশাহী অঞ্চলে সরকারী বাহিনীর হাতে নিহত হয়। জাসদের মুখপত্র 'গণকণ্ঠ'-র ভাষ্য অনুযায়ী সিরাজগঞ্জে পাঁচশত বাম কর্মীকে সরকারী বাহিনী হত্যা করে। জাসদের দাবী অনুযায়ী আওয়ামী লীগের দু'বছরের শাসন আমলে ৬০,০০০ বামপন্থী হত্যা এবং ৮৬,০০০ হাজার কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।[১] শেখ মুজিব সশস্ত্র বামপন্থীদের প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করে দিয়ে বলেন', নক্সালীদের দেখা মাত্র গুলি করা হবে।' এসব সত্ত্বেও বামপন্থী আন্দোলন আওয়ামী লীগ সরকারকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এছাড়াও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার এমাবনতি ঘটতে থাকে এবং সামাজিক অস্থিরতা তীব্ররূপ ধারণ করে। এ পরিস্থিতিতে ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী আওয়ামী লীগ সরকার সংসদে সংবিধান সংশোধন করে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন করে। সুপ্রিমকোর্ট ও বিচার ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির পূর্ণ নিয়ন্ত্রনাধীন করা হয় এবং প্রশাসনের ওপর দলীয় নিয়ন্ত্রনের জন্যে রাজনৈতিকভাবে মনোনীত জিলা গভর্ণর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ২৪শে ফেব্রুয়ারী এক ডিক্রীর মাধ্যমে দেশের সমস্ত বৈধ রাজনৈতিক দল ভেংগে দিয়ে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামীলীগ' (বাকশাল) নামে নতুন একক দল গঠন করা হয়। সরকারের নিয়ন্ত্রনে চারটি দৈনিক পত্রিকা রেখে বাকী সব বন্ধ করে দেয়া হয়। শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকারের রাষ্ট্রপতি হয়ে দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। 'বাকশাল' কর্মসূচীকে শেখ মুজিব 'দ্বিতীয় বিপ্লব' হিসেবে আখ্যায়িত

---

১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন তালুকদার মনিরুজ্জামান এর **The Bangladesh Revolution and its Aftermath**, পৃ. ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

করেন । শেখ মুজিবের এই বাকশাল কর্মসূচী গ্রহণের পর 'বাকশাল' চিন্তার পক্ষে বিপক্ষে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে মতপার্থক্য ও বিরোধ তীব্রতর হতে থাকে । সমাজের বিভিন্ন গ্রুপকে এই বাকশাল কর্মসূচী ভীত করে তোলে এবং শেখ মুজিব বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। শেষাবধি এই বাকশাল গঠনের প্রতিক্রিয়া ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তাঁকে নৃশংস ও বর্বরোচিতভাবে হত্যার মধ্যদিয়ে আওয়ামীলীগ শাসন যুগের সমাপ্তি ঘটে ।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট সামরিক বাহিনীর এক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবকে নৃশংস ও বর্বোরচিতভাবে হত্যা করার মধ্য দিয়ে খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হন । এখান থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনী প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ শুরু হয় এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক ভিন্ন পর্বের সূচনা ঘটে । খন্দকার মোশ্‌তাক আহমেদ সাম্রাজ্যবাদের সাথে সম্পৃক্ত এবং ভারত বিরোধী হিসেবে পরিচিত ছিলেন । এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় ভ্লাদিমির পুচকভের ভাষায়, " মোশ্‌তাক আহমেদ প্রথম থেকেই দলের দক্ষিণপন্থী অংশের অন্তর্ভুক্ত এবং পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশগুলো, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে পরিচিত ।"[১]

এই সময়কালে সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিরোধ তীব্রতা লাভ করতে থাকে । জাসদ ও পিকিংপন্থী কমিউনিষ্টদের সমর্থিত 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'র নেতৃত্বে বাম মনোভাবাপন্ন সৈন্যরা সংগঠিত হয় । সেনাবাহিনীর মধ্যে 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার' ব্যাপক প্রভাব গড়ে ওঠে । ৩রা নভেম্বর সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে । ৭ই নভেম্বর জাসদের কর্ণেল তাহেরের নেতৃত্বে 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটায় । এই অভ্যুত্থান-এর মধ্যদিয়ে জেনারেল জিয়াউর রহমান সামরিক বাহিনী প্রধান নিযুক্ত হন । এবং পরবর্তীকালে কর্ণেল তাহেরও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার তৎপরতা চরমভাবে দমন করেন । এ ঘটনার মধ্যদিয়ে

---

১. ভ্লাদিমির পুচকভ, বাংলাদেশের রাজনীতিক গতিধারা, পৃ. ৭২ ।

Dhaka University Institutional Repository

একটি বিষয় বেরিয়ে আসে তা হলো এই যে বামপন্থীরা সামরিক বাহিনীর সাধারণ সৈন্য-দের মধ্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা রদবদল ও দখল করার মতো অনেকটা শক্তি অর্জন করেছিল । বামপন্থীরা কেবলমাত্র জনগণ নয়, সেনাবাহিনীর মধ্যেও কাজ করার যে কৌশল গ্রহণ করে তা বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট রাজনীতির ইতিহাসে একেবারেই নতুন বলা যায় ।

১৯৭৭ সাল থেকে জিয়াউর রহমান সরকার প্রধান হন । জিয়া আমলে জাসদ, কমিউনিষ্ট পার্টি, ন্যাপ (মোজাফফর) সরকারের নিপীড়নের সম্মুখীন হয় । এবং বাম-পন্থীদের কোন কোন অংশ জিয়া সরকারকে সমর্থন করে । জিয়াউর রহমান সরকারের আমলে বিশেষত এককালীন পিকিংপন্থী দলগুলোর মধ্যে ভাংগন তৈরী হয় এবং মার্কসবাদী রাজনৈতিক দলগুলি জিয়াউর রহমানের শাসনকালে তেমন কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি ।

জিয়াউর রহমান সংবিধানের কিছু মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেন । তিনি সং-বিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল করে ইসলামী আদর্শ স্থাপন করেন এবং সমাজতন্ত্রকে বাদ দেন । জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বি এন পি) প্রধান রাজনৈতিক আদর্শ ছিল " বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ"। এই বাংলাদেশী জাতীয়তা-বাদের মধ্য দিয়ে ভারত বিরোধিতা, আওয়ামীলীগ বিরোধিতা এবং একই সাথে মার্কসবাদকে বিদেশী মতবাদ হিসেবে চিহ্নিত করে সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করার রাজনৈতিক নীতি গৃহীত হয় । 'মুসলমান বাঙালী' থেকে 'হিন্দু বাঙালী'-র পার্থক্য, ভারতের পশ্চিম বাংলার হিন্দু বাঙালী থেকে বাংলাদেশের মুসলমান বাঙালীকে পার্থক্য করার মুসলিম লীগের যে ধর্ম ভিত্তিক ও সাম্প্রদায়িক বিভাজন ছিল, জিয়াউর রহমান কর্তৃক প্রবর্তিত 'বাংলাদেশী জাতীয়-তাবাদ' সেই ইসলাম ধর্মভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তাবোদের নতুন সংস্করণ বলা যায় । জিয়াউর রহমান ইসলামী মৌলবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন । এ প্রসংগে মার্কাস ফ্রান্ডা বলেন,

"Bangladeshi nationalism could eventually force Zia's regime in to an excessive reliance on fundamentalist Islam as a unifying ideology."[১] জিয়াউর রহমানের শাসনের শেষদিকে বাম পন্থীরা আন্দোলনের

---

১. **Marcus Franda, Bangladesh ; The First Decade, South Asian Publisher Pvt. Ltd., New Delhi, Madras,1982, p. 225.**

Dhaka University Institutional Repository

উদ্যোগ গ্রহণ করে । জাসদ, ওয়ার্কস পার্টি, ন্যাপসহ কয়েকটি দল মিলে গঠিত হয় দশ দলীয় জোট । এছাড়া কমিউনিষ্ট পার্টি, ন্যাপ (হারুন), ন্যাপ (মোজাফফর) মিলে গঠিত হয় ত্রিদলীয় ঐক্যজোট, মোহাম্মদ তোহার নেতৃত্বে দেশ প্রেমিক ফ্রন্ট । এসব জোট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গঠিত হয় । এসব জোট জিয়া সরকার বিরোধী তেমন কোন শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি ।

স্বাধীনতা উত্তরকালে এ পর্বের মার্কসবাদী আন্দোলন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের আন্দোলন ব্যাপক শক্তি অর্জন করে । বিশেষত তরুন যুব-ছাত্রদের মধ্যে মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র ব্যাপক আলোড়ন তোলে । তরুণরা মার্কসবাদকে দর্শনগতভাবে উপলব্ধি না করেও মার্কসবাদকে শোষণ মুক্তির সামাজিক রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে । এ পর্বে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রধান শক্তি ছিল যুবকরা । নেতৃত্বদানকারী জাসদ এবং সর্বহারা পার্টির অধিকাংশ শক্তি ছিল তরুণরা । বস্তুত এই সময়কালে মার্কসবাদ এমন এক স্বতঃস্ফূর্ত জন প্রিয়তা অর্জন করে যার ফলশ্রুতিতে কেউ সচেতনভাবে উপলব্ধির মধ্য দিয়ে মার্কসবাদী না হয়েও নিজকে মার্কসবাদী বলে দাবী করতে গৌরববোধ করতো । মার্কসবাদ সে সময় তরুণদের কাছে প্রগতিশীল ফ্যাশন পর্যন্ত হয়ে ওঠে ছিল ।

জাসদের 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'-এর শ্লোগান সমাজকে আলোড়িত করে এবং জাসদ সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রধান ধারা হয়ে ওঠে । কিন্তু জাসদ ছিল পেটি বুর্জোয়া অতি বাম রাজনৈতিক দল । পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী সম্পর্কে কার্ল মার্কস মনে করতেন,"প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মাঝখানে এরা দোলায়িত, বুর্জোয়া সমাজের আনুষংগিক একটা অংশ .. মধ্যবর্তী শ্রেণীদের দৃষ্টিভংগী থেকেই শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে অস্ত্র ধারণ করবে তা স্বাভাবিক ।"[১]

---

১. কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, "কমিউনিষ্ট পার্টির ইশতেহার," কার্ল মার্কস ফ্রেডারিক এঙ্গেলস রচনা সংকলন, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২, পৃ. ৪৮-৪৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

অপরিপক্ক

লেনিন এই/অবস্থায় অতি বাম উগ্রতাকে চিহ্নিত করেছিলেন 'বাম পন্থার বাল্যব্যাধি' হিসেবে। বিশেষত ১৯৭৫ এর ৭ই নভেম্বর জাসদের নেতৃত্বে কর্ণেল তাহের সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরের যে অভ্যুত্থান সংগঠিত করেন তা উল্লেখযোগ্য। কর্ণেল তাহেরের সাহস, মতাদর্শের প্রতি দৃঢ়তা ও সততা প্রশ্নাতীত। কিন্তু "সাতই নভেম্বর তাহের ও জাসদ যা ঘটিয়েছিল তাকে শুধুমাত্র পূর্ববস্থা ফিরিয়ে আনার একটা মাধ্যম হিসেবে দেখলে ভুল হবে। মুজিব উৎখাতের কয়েক মাস আগে থেকেই জাসদ এক সার্বিক গণঅভ্যুত্থানের প্রস্তুতি নিচ্ছিল।"[১] সার্বিক রাজনৈতিক প্রস্তুতি, গণ অংশগ্রহণের প্রস্তুতি ও নিশ্চিতি ছাড়াই সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে ক্যুদেতার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ১৮৩০, ১৮৪৮ সালের ফরাসী ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী, দুরন্ত সাহসী অগাষ্ট লুই ব্লাংকীর "Classic Prototype"[২] এবং Conspiratorial tactics[৩] এর মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কৌশলের সাথে জাসদের সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। জাসদ রাজনীতির মধ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রমূলক, ক্যুদেতা আচরণ খুঁজে পাওয়া যায়। ব্লাংকীপন্থীদের সম্পর্কে মার্কসের 'ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ'-এর ভূমিকায় এঙ্গেলস বলেন, "ষড়যন্ত্রের বিদ্যালয়ে লালিত পালিত, এবং তাদের আনুষংগিক কঠোর নিয়ম শৃংখলায় দৃঢ়বদ্ধ হয়ে তা শুরু করেছিল এই ধারণা নিয়ে যে, অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক স্থির সংকল্পে সংগঠিত মানুষ অনুকূল সময় এলেই যে রাষ্ট্রের হাল ছিনিয়ে নিতে পারবে শুধু তাই নয়, প্রচণ্ড নির্মম উদ্যোগে সেই ক্ষমতা ধরে রেখে শেষ পর্যন্ত বিপুল জনসাধারণকে বিপ্লবে টেনে এনে তাদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর চারপাশে দাঁড় করাতে সক্ষম হবে।"[৪]

---

১. লরেন্স লিফশুলৎস, অসমাপ্ত বিপ্লব, তাহেরের শেষ কথা, মুনীর হোসেন অনূদিত, কর্ণেল তাহের সংসদ, ৭ই নভেম্বর, ১৯৮৮, পৃ. ১৪।

২. The New Encyclopaedia Britannica- Vol. 2,15th edition, Encyclopaedia Britannica, Inc.,1981, Printed in U.S.A,p.1106.

৩. I. Frolov(ed.),Dictionary of Philosophy, Progress Publishers, Moscow, English Translation,1987,p.47.

৪. কার্ল মার্কস, "ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ," ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের ভূমিকা থেকে, কার্ল মার্কস, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস রচনা সংকলন, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৫, পৃ. ১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব সরকার কর্তৃক সর্বহারা পার্টির নেতা সিরাজ শিকদার নিহত হবার পর এই পার্টির ভিতরে বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং দলটি বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সর্বহারা পার্টি ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্বে পরিচালিত দল। সিরাজ শিকদার হয়ে উঠেছিলেন নেতৃত্বের ব্যক্তিকরণ (Personification) এছাড়া সর্বহারা পার্টি কর্তৃক গ্রামাঞ্চলে মুক্ত এলাকা গঠন ও চীনের বিপ্লবের অনুসরণে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও এর কৌশল ব্যর্থ হয়। সর্বহারা পার্টি যে কর্মকৌশল গ্রহণ করে তাকে সন্ত্রাসবাদ বলা যায়। সন্ত্রাসবাদ সর্বব্যাপী রাজনৈতিক সংগ্রামকে গৌণ করে। সন্ত্রাসবাদ প্রসংগে লেনিন বলেন, "'অর্থনীতিবাদী' এবং.. সন্ত্রাসবাদীদের মূল একই, সেটা হল স্বতঃস্ফূর্ততার কাছে বশ্যতা.... 'অর্থনীতিবাদীরা' নতি স্বীকার করে 'বিশুদ্ধ অনাড়ম্বর শ্রমিক আন্দোলনে'র কাছে, আর বৈপ্লবিক সংগ্রাম এবং শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে একই সম্মুন্নিত সমগ্রতায় সংযুক্ত করার সামর্থ কিংবা সুযোগ যাদের নেই সেই সব বুদ্ধিজীবির আবেগ চঞ্চল শ্রেষধের স্বতস্ফূর্ততার কাছে নতি স্বীকার করে সন্ত্রাসবাদীরা।"[১] সর্বহারা পার্টির রাজনীতি বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাবে যে তা হয়ে উঠেছিল লেনিন বর্ণিত সন্ত্রাসবাদ। যা তরুনদের উদ্দীপ্ত করেছিল, কিন্তু শেষাবধি এর পরিণতি ঘটে জনবিচ্ছিন্নতায় ও অসংখ্য মানুষের আত্মোৎসর্গে ও শোচনীয় বিপর্যয়ে। স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি সরকারকে সহযোগিতা করার নীতি অনুসরণ করার কারণে মার্কসবাদী আন্দোলনের ধারা হিসেবে কোন সাড়া জাগাতে পারেনি। ১৯৭৫ সালে পার্টি বিলোপ করে বাকশালে অংশ গ্রহণ ছিল বিলোপবাদ। এবং আওয়ামীলীগ সরকারের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদকে সমাজতন্ত্র ভেবে তাঁরা বিভ্রান্ত হয়েছেন। সরকারকে অব্যাহত সহযোগিতা করার নীতি অনুসরণ করাকে বুর্জোয়া শ্রেণীর লেজুড়বাদ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বুর্জোয়া শ্রেণীর তৈরী রাষ্ট্র যন্ত্রটা অক্ষুন্ন রেখে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধিবির তত্ত্ব ছিল ভুল। এ প্রসংগে মার্কস বলেন, "তৈরী রাষ্ট্র যন্ত্রটাকে

---

১. ভ.ই. লেনিন, "করণীয় কী?" ভ.ই. লেনিন নির্বাচিত রচনাবলী, বারো খণ্ড, খণ্ড ১, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৯, পৃ. ২০৮।

Dhaka University Institutional Repository

দখল করেই নিজের কাজে লাগাতে পারেনা শ্রমিক শ্রেণী।"[১] তাকে বল প্রয়োগে উচ্ছেদ করতে হয়। এদিকে স্বাধীনতাউত্তর কালের প্রথম অর্ধদশকে পিকিংপন্থী মাও চিন্তাধারার অনুসারী হিসেবে পরিচিত দলগুলি নানা বিভ্রান্তির কারণে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি। এধারার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মার্কসবাদী দলগুলির জাতীয় ভিত্তিক দেশব্যাপী কোন সংগঠন ছিলনা। এদের সাংগঠনিক ভিত্তি ছিল আঞ্চলিক, কিছু কিছু অঞ্চলে এদের কাজ ছিল। এছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভ্রান্তিমূলক ভূমিকার কারণে তাদের গ্রহণযোগ্যতা ছিল কম। এবং সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক কৌশলের কারণে তারা হয়ে পড়েছিল জনবিচ্ছিন্ন। এই ধারার কিছু কিছু দল বিশেষত কমিউনিষ্ট পার্টি লেনিনবাদী ও মজদুর পার্টি নিরন্তর গণযুদ্ধের লাইন ত্যাগ করে গণআন্দোলন এবং গণসংগ্রামের কৌশল গ্রহণ করলেও তখনো পর্যন্ত গণভিত্তি অর্জন করতে পারেনি। ফলে এরা তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি।

স্বাধীনতা পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের পর থেকে মার্কসপন্থীদলগুলোর ভূমিকা সুমিত হতে থাকে। যে সব সমাজতন্ত্রী ও মার্কসবাদী দলের পেছনে অসংখ্য তরুন সমবেত হয়েছিল সে সব দলের ব্যর্থতা স্বাধীনতা উত্তর র‍্যাডিক্যাল তরুন প্রজন্মকে হতাশার অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। একটি সম্ভবনাময় মার্কসবাদী আন্দোলন ভুল কৌশল, রাজনৈতিক বিভ্রান্তি, নেতৃত্বের অদক্ষতা ও অযোগ্যতা এবং চিন্তার বিভ্রান্তির কারণে এই সমাজতন্ত্রী পেটিবুর্জোয়া ধারার শোচনীয় পরাজয় ঘটে। কিন্তু "শেষ পর্যন্ত যখন ইতিহাসের কঠোর সত্যে আত্ম-বিভ্রান্তির সমস্ত নেশা কেটে যায় তখন সমাজতন্ত্রের এ রূপটার [পেটিবুর্জোয়া সমাজতন্ত্র] অবসান হয় একটা শোচনীয় নাকিকান্নায়।"[২]

---

১. কার্ল মার্কস, "ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ," কার্ল মার্কস ফ্রেডারিক এঙ্গেলস রচনা সংকলন, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৫, পৃ. ১৮৩।

২. কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, "কমিউনিষ্ট পার্টির ইশতেহার" কার্ল মার্কস-ফ্রেডারিক এঙ্গেলস রচনা সংকলন, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, প্রথম খণ্ড প্রথম অংশ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২, পৃ. ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা উত্তরকালে যুব সমাজের মধ্যে সমাজ ভাংগার এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে সমাজের একটা বিরাট অংশ মুক্তির দিশা খুঁজেছে। তাঁদের সে প্রত্যাশিত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আকাংখার সংগ্রামের মধ্যে অসীম আন্তরিকতা আত্মোৎসর্গ, সততা, মানুষের প্রতি ভালবাসা ও মহত্ব থাকলেও দ্বান্দ্বিক বস্তুতান্ত্রিক হয়ে ওঠেনি তাদের চিন্তা, মার্কসীয় দর্শনে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি তাদের ভাবনা। অর্জিত হয়নি সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী। সত্তরের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে জিয়াউর রহমান সরকারের আমলে সমাজতন্ত্রী দলগুলির বিপর্যস্ত অবস্থার কারণে উল্লেখযোগ্য কোন আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। তবে সত্তরের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে, প্রথমার্ধের আন্দোলনের বিপর্যয় ও ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান এবং সঠিকতা নির্ধারণের প্রয়োজন থেকে মার্কসবাদীদের মধ্যে পর্যালোচনা এবং পুনর্বিবেচনা শুরু হয়। এই পর্যালোচনা ও অতীতের পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে তারা তাদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ণ করতে থাকে। তরুনরা, বিশেষত ছাত্ররা, ভবিষ্যতের সঠিক মার্কসবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে মার্কসবাদ অধ্যয়ন শুরু করে। এবং ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে পাঠচক্র শুরু হয়। ছাত্র সংগঠনগুলি সচেতন, বিচারমূলক মার্কসবাদী ধারা বিনির্মানের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই সময়ে নানান মার্কসবাদী পাঠচক্র গড়ে উঠতে থাকে। লিটল ম্যাগাজিন, পত্রপত্রিকা ও সাহিত্যে এর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে ছাত্র পরিসরে মার্কসবাদ চর্চার কয়েকটি পাঠচক্রের কথা তুলে ধরা হলো।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' আহ্বান নিয়ে ছাত্রলীগ বিভক্ত হলে একাংশ ১৯৭২ সালে নতুন করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ নামে আরেকটি ছাত্রলীগ গঠন করে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট। এরা ছাত্র পরিসরে সমাজতান্ত্রিক ধারাকে পুনর্গঠিত করার প্রয়াস চালায়। স্বাধীনতা উত্তরকালে এই ধারার প্রধান সংগঠক ছিলেন, আসব আবদুর রব, মুনিরুদ্দিন আহমেদ, আবুল হাসিব খান, শিরিন আখতার মুশতাক আহমেদ, নাজমুল হক প্রধান, শফি আহমেদ প্রমুখ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৫ সালে ছাত্র ইউনিয়ন এর একাংশ ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) অপর অংশ ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) এ দ্বিখণ্ডিত হয়। ছাত্র ইউনিয়নের এই অংশ (বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন) (মতিয়া গ্রুপ) এর ধারাবাহিকতা। ছাত্র আন্দোলনে মার্কসবাদী ধারা বজায় রাখতে ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন অনানুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে সংশ্লিষ্ট। ছাত্র ইউনিয়ন 'জয়ধ্বনি' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে তাদের আদর্শগত প্রচার অব্যাহত রাখে। স্বাধীনতা উত্তরকালে বিভিন্ন সময়ের সংগঠকরা হলেন মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম, নুরুল ইসলাম, কাজী আকরাম, আবদুল মান্নান, আবদুল কাইয়ুম মুকুল, খোন্দকার ফারুক, আনোয়ারুল হক, তাহেরউল্লাহ, মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, নাসিরউদ দৌজা প্রমুখ।

বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন এক অংশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন নাম গ্রহণ করে ১৯৬৪ সালে। বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন গ্রুপ) বর্ধিত অংশ। এই সময় বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন নামে দুটি সংগঠন বিরাজ করছিল একাংশ ইউনাইটেড বিপলস পার্টির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল অপর অংশ বাংলাদেশ ওয়ার্কস পার্টির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। এ ধারার সংগঠক ছিলেন আশরাফ পিরানী, মিজানুর রহমান, মানু, ইসরারুল হক, জহিরুদ্দিন স্বপন, আবুল হোসেন প্রমুখ।

বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন

বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) এর বর্ধিত অংশ। ১৯৭০ সালে বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্র পরিসরে মার্কসবাদী ধারা অব্যাহত রাখার উদ্যোগ নেয়। বিভিন্ন পর্যায়ে এই সংগঠন প্রধান সংগঠক হলেন মাহবুবউল্লাহ, মাহফুজউল্লাহ, আখতার হোসেন, শহীদুল ইসলাম, শাহআলম প্রমুখ।

জাতীয় ছাত্র দল

জাতীয় ছাত্র দল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে। জাতীয় ছাত্র দল বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। এরা ছাত্র পরিসরে মার্কসবাদের পক্ষে কাজ করে। এ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের সংগঠক ছিলেন। নুর মোহাম্মদ খান, রেজভী আহমেদ, আতাউর রহমান ঢালী, মোস্তফা ফরিদ, সৈয়দ মনোয়ার হোসেন, আবু সাঈদ, সালাউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি

বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৬ সালে। বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মোজাফফর) সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। তারা সমাজতন্ত্রের পক্ষে প্রচার চালায়। এই সংগঠনের বিভিন্ন সময়ের প্রধান সংগঠক ছিলেন নিজামউদ্দিন, আবু হাসান, খবিরুল ইসলাম, আসাদুল্লাহ তারেক, মাসুদুর রহমান, আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রাক্সিস অধ্যয়ণ গ্রুপ

প্রাক্সিস অধ্যয়ণ গ্রুপ ১৯৭৮ সালে গঠিত হয়। এ সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল মার্কসবাদ অধ্যয়ন এবং প্রাক্সিস নামে একটি মাসিক সংকলন প্রকাশ করা। এ পর্যন্ত এর সর্বমোট ১২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রাক্সিসের প্রধান সংগঠক ছিলেন সলিমুল্লাহ খান, মোহাম্মদ ইকবাল, আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ সাকী প্রমুখ। পূর্বোক্ত দু'টি মার্কসবাদী পাঠচক্র ছাড়াও কমিউনিষ্ট দলগুলি সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠনগুলি নিজ নিজ সংগঠনের অভ্যন্তরে মার্কসবাদ অধ্যয়নের জন্যে পাঠচক্র সংগঠিত করে। নিম্নে আমরা এরূপ কয়েকটি সংগঠনের কথা তুলে ধরছি।

ছাত্র ঐক্য ফোরাম

১৯৭৯ সালের ৪ঠা মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয় ছাত্র ঐক্য ফোরাম। এই ছাত্র ঐক্য ফোরামের উদ্দেশ্য ছিল মার্কসবাদ অধ্যয়ন এবং এদের মুখপত্র ছিল 'ফোরাম' নামে একটি মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকা ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারিত হতো। এ পর্যন্ত এর ৩৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই অধ্যয়ন সংগঠনটি পরবর্তীকালে একটি পূর্ণাংগ ছাত্র সংগঠনে রূপ লাভ করে। বিভিন্ন সময়ে এই সংগঠনের মূল সংগঠক ছিলেন সাজ্জাদ জহির, সাইফুল হক, গোলাম কিবরিয়া, নুরুল কবীর, পলাশ বড়াল, নাসিমুল আহসান দিপু, আখতার সোবহান মাসরুর প্রমুখ।

Dhaka University Institutional Repository

বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী

বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী তৎকালীন ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। ছাত্রমৈত্রী গঠিত হয় ১৯৮০ সালে। জাতীয় ছাত্রদল, জাতীয় ছাত্র আন্দোলন, জাতীয়ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন ইত্যাদি মার্কসবাদী পার্টির সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠন-গুলির বিভিন্ন অংশাংশ মিলে গঠিত হয় বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী। তারা নতুন করে মার্কসবাদ অধ্যয়ন ও চর্চার ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। এই সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের সংগঠক ছিলেন ফজলে হোসেন বাদশা, আতাউর রহমান ঢালী, জহিরুদ্দিন স্বপন, নুর আহমেদ বকুল, রাশিব আহসান মুন্না প্রমুখ।

বাংলাদেশ ছাত্র লীগ

১৯৮০ সালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ ছাত্রলীগ দ্বি-খণ্ডিত হলে 'বাংলাদেশ ছাত্র লীগ' নামে আরেকটি ছাত্র সংগঠনের জন্ম হয়। এই সংগ-ঠনটি বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল এরা ছাত্র অঙ্গনে মার্কসবাদ চর্চার উদ্যোগ অব্যাহত রাখে।

আশির দশকের শুরুতে বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অব্যাহত ভাংগনের কারণে আরো নতুন নতুন ছাত্র সংগঠনের জন্ম হয়। এবং পরবর্তীকালে উল্লেখিত ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে একদিকে যেমন ভাংগন ঘটে তেমনি আবার কিছু ঐক্যবদ্ধ হবার প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।[১]

সত্তরের দশকের শেষপাদে ও আশির দশকের শুরুতে মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র, অনুসারী উপরোক্ত ছাত্র সংগঠনগুলি সংগঠনের অভ্যন্তরে মার্কসবাদ অধ্যয়ন করে এবং নানা ধরণের প্রকাশনায় মনোযোগ দেয়। অতীত কর্মের মূল্যায়ন করে ভবিষ্যৎ বিপ্লবী সংগ্রামের জন্যে

---

১. পরিশিষ্ট : বাংলাদেশে বর্তমানে বামপন্থী ধারার ছাত্র সংগঠনগুলির তালিকা প্রদান করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মতাদর্শিক, তত্ত্বগত, ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে । কিন্তু সত্তরের দশকে মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র নিয়ে ছাত্র পরিসরে আগ্রহ পরিলক্ষিত হলেও এই দশকে তেমন কোন মার্কসবাদী ধারার ছাত্র আন্দোলন বা সাধারণ ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠেনি ।

সত্তরের দ্বিতীয়ার্ধের সময়টা যেন প্রথমার্ধের বিফলতার পর অনেকটা থমকে দাঁড়ানোর মতো । এ সময়ে মার্কসবাদী ধারা নিজেদের আত্মপর্যালোচনা ও মতাদর্শগত বিতর্কের মধ্যদিয়ে একটি সঠিক দিশা খুঁজে পেতে চেয়েছে । এসময় বাংলাদেশের কমিউনিস্টরা কোন আন্দোলন গড়ে তোলার চাইতে নিজেদেরকে পুনর্গঠিত করার কাজে অধিকতর মনোযোগী ছিল । ছাত্র পরিসরের মার্কসবাদী ছাত্র সংগঠনগুলি পুনর্বিবেচনা ও পুনর্গঠনে অধিকতর মনোযোগী হয়ে ওঠে । উল্লেখ্য যে, ছাত্রদের মধ্যে মার্কসবাদী ধারার প্রথম ছাত্র সংগঠন ছাত্র ফেডারেশন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র গণ সংগঠন হিসেবে অনেক আগে থেকেই কর্মরত ছিল ।

মার্কসবাদী আন্দোলনের উল্লেখিত পরিস্থিতির মধ্যে আশির দশকের শুরুতে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে সামরিক আইন জারী করেন । শুরু হয় সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন । এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে বামপন্থী ধারার ছাত্র সংগঠনগুলি ছিল অগ্রণী । বাম-ডান উভয় ধারার ১৪টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে ১৯৮৩ সালে গঠিত হয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ । এই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ প্রণীত ১০ দফা দাবীর মধ্যে বামধারার ছাপ অনেক ক্ষেত্রেই স্পষ্ট । যেমন ১০ দফায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক প্রশাসন এবং রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় শ্রমিক কৃষকের অংশ গ্রহণ দাবী করা হয় । এতে শ্রমিক কৃষকসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের দাবী সংকলিত হয়েছিল । অপরদিকে জাতীয় পরিসরে কমি-

Dhaka University Institutional Repository

উনিষ্ট ও বুর্জোয়া দলের সমন্বয়ে গঠিত হয় ১৫ দল ও ৭ দল। এই উভয় জোটের দাবী ছিল পাঁচ দফা। পাঁচ দফার মূল বিষয় ছিল এরশাদ সরকারের পদত্যাগের মধ্যদিয়ে দল নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন এবং এই অনুবর্তীকালীন সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন। এই পাঁচ দফার মূল বিষয় ছিলো একটি অবাধ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর। পাঁচ দফার মধ্যে শ্রমিক কৃষকসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের অন্যকোন দাবী প্রতিফলিত হয়নি। জোটের অভ্যন্তরের মার্কসবাদী দলগুলি সাংগঠনিক দিক থেকে বড় বুর্জোয়া দলগুলির সাথে দাবী প্রণয়নের ক্ষেত্রে বামরাজনীতির আধিপত্য বজায় রাখতে পারেন নি। পাঁচ দফা প্রণয়নের মধ্যদিয়ে সমগ্র সংগ্রামের অভিমুখ নির্ধারিত হয়ে যায় কেবলমাত্র একটি সংসদ নির্বাচনে। গণতন্ত্র বলতে একটি সংসদ নির্বাচনকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বৃহত্তর ঐক্যের প্রয়োজনে গোটা এরশাদ আমল জুড়ে জনপন্থী বুর্জোয়া দলগুলি এবং মার্কসবাদী রাজনৈতিক দলগুলি একই সাধারণ দাবী পাঁচ দফাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। ফলে মার্কসবাদীদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অবস্থান এক্ষাগত হারিয়ে যেতে থাকে জনগণের সামনে। এরশাদ আমলে কমিউনিষ্ট দলগুলি নিজস্ব রাজনীতি ব্যক্ত না করায় বি.এন.পি. বা আওয়ামী লীগ থেকে বামপন্থীদের কোন ভিন্ন রাজনৈতিক পরিচিতি গড়ে ওঠেনি। এতে করে শ্রেণী নির্বিশেষে মহাজোটের রাজনীতি সমাজে মার্কসবাদী রাজনীতির বিকাশকে ব্যাহত করেছে। সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি এ সময় তাদের শ্রেণী রাজনীতিকে এ পর্বে স্থগিত রাখার কারণে সমাজে মার্কসবাদী রাজনীতির বিকাশ ঘটতে পারেনি। বরঞ্চ কমিউনিষ্টদের গৃহীত কৌশল অনেকটা একচেটিয়াভাবে সমাজে বুর্জোয়া দলগুলির আধিপত্যকে নিশ্চিত করেছে। মার্কসবাদী দলগুলির মধ্যে বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি, বাংলাদেশের ওয়ার্কস পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (খালেকুজ্জামান ভূঁইয়া), ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (আ.ফ.ম. মাহবুবুল হক), শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল, ন্যাপ-এই পাঁচ দফা আন্দোলনকে ধারণ করে এরশাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

এরশাদ শাসনামলে পাঁচ দফাপন্থী ধারার কমিউনিষ্ট ও বাম দলগুলির বাইরে অনেকগুলি গোপন কমিউনিষ্ট দল ছিল। এদের মধ্যে সর্বহারা পার্টির কয়েকটি অংশ, বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পার্টি (এম-এল) উল্লেখযোগ্য। এই দলগুলি এরশাদ স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামকে বুর্জোয়া আন্দোলন বলে এই গণতান্ত্রিক সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূলস্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে এসবদল এ পর্বের জাতীয় রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। বরঞ্চ মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে এ দলগুলি জনবিচ্ছিন্নতা বেড়েছে। এরশাদ বিরোধী সংগ্রাম ১৯৯০ সালে চূড়ানুরূপ লাভ করে, এবং আন্দোলন অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। ৫ ডিসেম্বর ১৯৯০ সালে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে। ইতিপূর্বেই ৮, ৭ ও ৫ দলের যুগ্ম ঘোষণায় বলা হয়" আমাদের সংগ্রামের দাবীর কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হলো একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সার্বভৌম সংসদ প্রতিষ্ঠা করা।"[১] এছাড়া পাঁচ দফা অনুসরণে দল নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের কথা বলে অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী শক্তি যে ক্ষমতা দখল করবেনা তা নিশ্চিত করা ছিল। ফলে অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী শক্তি সমূহের অন্যতম কমিউনিষ্ট দলগুলির ক্ষমতায় অংশ নেয়ার পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয় আগে থেকেই। পরিণতিতে ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানে একটা সাংবিধানিক নির্ভরযোগ্য পথে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটে। পরবর্তীতে অভ্যুত্থানের একটা নির্বাচনী পরিণতি ঘটে ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে। কমিউনিষ্ট দলগুলি এ নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য কোন সাফল্য লাভ করেনি। অপরদিকে কমিউনিষ্ট, বামপন্থী দলগুলি সোভিয়েট ইউনিয়নের বিপর্যয়, পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রের পতন এসব কারণে অনেকটা দিশাহীন, বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কমিউনিষ্ট দলগুলির মধ্যে আগের মতো মতাদর্শগত দৃঢ়তা দেখা যাচ্ছেনা।

---

১. ১৫, ৭, ৫ দলীয় ঐক্য জোট কর্তৃক যুগ্ম ঘোষণা, ১৫, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট কর্তৃক প্রচারিত, ২১.১১.৯০.

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিপর্যয়ে বাংলাদেশের কমিউনিস্টরা এখন সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সঠিক পথ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে মার্কস লেনিনের চিন্তা ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা শুরু করেছে ।

ভূতপূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের আলোচনা-সমালোচনার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর লেখালেখি, সেমিনার সিম্পোজিয়াম, আলোচনা হচ্ছে । যা ইতিপূর্বে কখনোই দেখা যায়নি । এতে করে সমাজে নতুনভাবে মার্কসবাদ চর্চা প্রসার লাভ করছে । এর মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে নতুন করে মার্কসবাদ চর্চার একটা সম্ভবনা দেখা দিচ্ছে । যা বাংলাদেশে মার্কসবাদী আন্দোলনের জন্যে ভবিষ্যতে একটা ইতিবাচক সফলতা নিয়ে আসতে পারে ।

২.৪ আন্তর্জাতিক পরিসরে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ঃ বাংলাদেশের কতিপয় মার্কসবাদী দলের অবস্থান

আশির দশকের মধ্যভাগ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় শুরু হয় । আন্তর্জাতিক পরিসরে সমাজতন্ত্রের এই বিপর্যয়ের কারণ এখনও অনুসন্ধান চলছে । এই বিপর্যয়ের কারণগুলো বর্তমানে বিশ্লেষকরা চিহ্নিত করেছেন সেগুলোর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্রের উদ্ভব, জনবিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র, শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির নামে পার্টির একনায়কত্ব, আমলাতন্ত্র ও দুর্নীতি, সাম্রাজ্যবাদের সাথে অস্ত্র প্রতিযোগিতার কারণে অর্থনীতির সামরিকীকরণ এবং এতে করে জনগণের জীবনের উন্নতি সাধন ব্যাহত হয়। আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি মানের তুলনায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রম ঘন পশ্চাদপদ প্রযুক্তির ব্যবহার, কর্মে উদ্যোগহীনতা, বাজার ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অপনোদন, শক্তিশালী বিকশিত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে প্রতিযোগিতায় পরাস্থ হওয়া, ভারী শিল্পে গুরুত্ব প্রদান করে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে পিছিয়ে পড়া, পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বের সাথে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় শেষাবধি পরাস্থ হওয়া,

Dhaka University Institutional Repository

সর্বোপরি সমাজতান্ত্রিক সমাজে মার্কসীয় মতাদর্শের মতাদর্শগত আধিপত্যহীনতা, মৌল মার্কসীয় চিন্তার বিকৃত ব্যাখ্যা ও অনুসরণ, আঞ্চলিক সমাজতন্ত্র (Local Communism) অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া, সংশোধনবাদ, ইত্যাদি নানাবিধ কারণকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিপর্যয়ের কারণ বলে এখনও পর্যন্ত বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। এ বিপর্যয় সম্পর্কে এই মুহূর্তেই সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়।

আশির দশকের মধ্যভাগ থেকে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা মিখাইল গরবাচেভ 'পেরেস্ত্রোইকা' বা পুনর্গঠন ও 'গ্লাসনস্' বা খোলা দ্বার নীতির কর্মসূচী গ্রহণ করেন। গর্ভাচভের 'পেরেস্ত্রোইকা-গ্লাসনস্' কর্মসূচী সারা পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন তোলে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি এই পেরেস্ত্রোইকা-গ্লাসনস্ কর্মসূচী দিয়ে আলোড়িত হয়। পৃথিবী ব্যাপি এই কর্মসূচীর পক্ষে-বিপক্ষে বিচারমূলক পর্যালোচনা শুরু হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের মার্কসবাদীরাও পেরেস্ত্রোইকা গ্লাসনস্কে কেন্দ্র করে মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁদের ধারণা পুনর্বিবেচনা করতে শুরু করে। অনেকেই মার্কসবাদকে মতাদর্শ হিসেবে পরিত্যাগ করেন। এযাবৎকাল এদেশের মার্কসবাদীরা ধারণা দিয়ে আসছিল সমাজতন্ত্রে তথা মার্কসবাদ আর্থ সামাজিক সমস্যা সমাধানের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয় বাংলাদেশে সে ধারণাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় বাংলাদেশের মার্কসবাদীদেরকেও কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের মার্কসবাদীদের মধ্যে প্রধানত ছয়টি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই প্রবণতাগুলি হল :-

১. প্রথম ধারাটি মার্কসবাদ পরিত্যাগকারী। এই পরিত্যাগকারীরা মনে করেন ইতিহাসের বর্তমান পর্যায়ে মার্কসবাদ একটি প্রাচীন অকার্যকরী ও পরিত্যাক্ত মতবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

২. দ্বিতীয় ধারাটি সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে সংশোধনবাদী নেতৃত্বকে দায়ী করে। এই ধারা মনে করে সংশোধনবাদের কারণে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটেছে। সংশোধনবাদের বিরোধিতা করে এই ধারা মার্কসবাদের কট্টর গোড়া যান্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রদান ও অনুসরণকারী।

৩. তৃতীয় ধারার মতে এই বিপর্যয় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বা সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় নয়। এই বিপর্যয় সংশোধনবাদ বা পুঁজিবাদের বিপর্যয়। এই ধারা মনে করে মার্কস-লেনিনের সমাজতন্ত্রের ধারণার সাথে একেবারে অসঙ্গতিপূর্ণ সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেছে। এই ধারা সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কতগুলি বিশুদ্ধ বিমূর্ত ধারণা পোষণ করে। এই বিশুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক প্রত্যয়ের (Concept) সাথে বাস্তবতার সঙ্গতি না ঘটলে তাকে নাকচ করে দেয়। এই অর্থে এই ধারা বিশুদ্ধ ধারণাবাদী এবং ভাববাদী। কেননা এই ধারার প্রবণতা হল-বাস্তবতাকে ধারণা বা চিন্তা অনুযায়ী হতে হবে। বাস্তবতা থেকে চিন্তা বিনির্মাণ বা তত্ত্ব পুনর্গঠন বিরোধী এই ধারা। এই ভাববাদী ধারা প্রতিবিম্বনশীল। কেননা, যদি আমরা এই ধারার বক্তব্য স্বীকার করে নেই তা হলে আমাদের বলতে হবে পৃথিবীতে আজ অবধি সমাজতন্ত্র কায়েম হয়নি। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র এখনো পর্যন্ত ইউটোপিয়া বা এখনো ধারণার পর্যায়ে রয়েছে। এর কোন বাস্তবরূপ আজ অবধি পৃথিবীতে কার্যকর হয়নি।

৪. চতুর্থ ধারাটি মনে করে মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্র এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তা নিরসনের জন্যে মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের সাথে পশ্চিমা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের একটা সংমিশ্রণ ঘটানো প্রয়োজন। এই ধারা মার্কসবাদ ও পশ্চিমা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সংমিশ্রণবাদী ধারা।

Dhaka University Institutional Repository

৫. পঞ্চম ধারার মতে ইতিহাসের বর্তমান পর্যায়ে চিরায়ত মার্কসবাদ লেনিনবাদ অনেক নতুন সমস্যাকে ব্যাখ্যা করতে পারছে না। ইতিহাসে অনেক প্রপঞ্চের উদ্ভব ঘটেছে, যা মার্কস লেনিনের সময় ছিলনা। ইতিহাসের এই নতুন পরিস্থিতিকে উপলব্ধি ও ব্যাখ্যার জন্যে মার্কসবাদকে নতুন করে আরো বিকশিত করতে হবে।

৬. ষষ্ঠ ধারার মতে সমাজতন্ত্রের বর্তমান সংকট নিরসনের জন্যে মার্কসের মৌলিক চিন্তাকে পুনরাবিষ্কার করতে হবে। বর্তমান সমস্যা নিরসনের জন্যে আদিতে বা মূলে অর্থাৎ মার্কসের কাছে (Back to the root) প্রত্যাবর্তন করতে হবে। মার্কসের মৌলিক চিন্তাকে বুঝতে না পারা ও মার্কসের চিন্তার ভুল ব্যাখ্যা সমাজতন্ত্রের সংকটের প্রধান কারণ। এই ধারা মনে করে মার্কসবাদের নামে যে গোড়া যান্ত্রিক ব্যাখ্যা চলে আসছে তার সাথে মার্কসের মৌলিক চিন্তার পার্থক্য অনেক।

বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে বাংলাদেশে মার্কসবাদী দল সমূহের অবস্থান নিম্নে তুলে ধরা হলো :

বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি

বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে মতপার্থক্য বেশ তীব্ররূপ ধারণ করেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি ১৯৯১ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত পঞ্চম কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে মত পার্থক্য পরিস্কার হয়ে ওঠে। কমিউনিষ্ট পার্টির তাত্ত্বিক অজয় রায়ের নেতৃত্বে পার্টির অভ্যন্তরে একটি ধারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই অংশের নেতৃত্বে পঞ্চম কংগ্রেসের খসড়া গঠনতন্ত্রে ১৩ ধারায় বলা হয়, " মানব মুক্তির মহতী আদর্শ সাম্যবাদে বিশ্বাসী বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি সমাজ বিকাশের

Dhaka University Institutional Repository

বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী অনুসরণ করিয়া তাহার সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করিবে, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন এবং সকল বিপ্লবী ও প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ, যারা চিন্তায় ও অবদানে সমাজ বিজ্ঞানকে নানাভাবে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করিয়াছেন, আজও তুলিতেছেন এবং আগামী ভবিষ্যতেও তুলিবেন, এসব কিছুকে সৃজনশীল মননশীলতা নিয়া পার্টি বাস্তবে প্রয়োগের জন্য সর্বদা সচেতন থাকিবে ।"[১]

বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির এই খসড়া গঠনতন্ত্রের ধারা ১৩ বিশ্লেষণ করলে এটা বুঝা যায় যে পার্টি 'মার্কসবাদ'কে এককভাবে আর পার্টির মতাদর্শগত ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করছে না । মার্কস-এঙ্গেলস লেনিনকে সমাজ বিজ্ঞানে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করার জন্যে কিছুটা প্রশংসা করেছে মাত্র ।

সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের এই খসড়া গঠনতন্ত্রের 'মার্কসবাদ' বিসর্জনের বিরুদ্ধে পঞ্চম কংগ্রেসে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও মঞ্জুরুল আহসান খানের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ পাল্টা বিকল্প প্রস্তাবনা উত্থাপন করেন । গঠনতন্ত্রের উল্লেখিত ১৩ ধারার পরিবর্তে এই সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ বিকল্প ১৩ ধারায় উপস্থাপন করে বলেন, "বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি মার্কসবাদ লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী দ্বারা তাহার সকল কর্মকান্ড পরিচালনা ও নীতি সমূহ রচনায় সচেষ্ট হবে । সেক্ষেত্রে পার্টি মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনের চিন্তার বৈজ্ঞানিক মর্মবাণী ও বিষয়বস্তুকে অনুসরণ ও বিকশিত করিয়া অগ্রসর হওয়ার ধারাকে পার্টির মতাদর্শগত ভিত্তিরূপে বিবেচনা করিবে । মতাদর্শের ক্ষেত্রে পার্টি সঠিক মার্কসীয় চিন্তা অনুসরণে যে কোন প্রকার মতান্ধতা, গোঁড়ামি, শাস্ত্র-বদ্ধ চিন্তার প্রবণতা প্রভৃতি হইতে মুক্ত থাকিবে এবং তত্ত্ব ও প্রয়োগের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে মার্কসীয় সূত্র

---

১. 'খসড়া গঠনতন্ত্র,' বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি, কেন্দ্রীয় কমিটি, সেপ্টেম্বর, পঞ্চম কংগ্রেস ৩-৮ অক্টোবর, ১৯৯১তে উত্থাপিত। পৃ. ৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

অনুসারে তত্ত্ব ও প্রয়োগকে সবসময় সৃজনশীলভাবে অগ্রসর ও বিকশিত করিতে সচেষ্ট হইবে।"[১]
সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশের কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টে বলা হয়," সমাজতন্ত্র এখন আর বিশ্ব ব্যবস্থা হিসেবে টিকে নেই ।"[২] অপরদিকে সংখ্যা লঘিষ্ঠ অংশে বিকল্প প্রস্তাবে বলা হয় " বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে সাম্প্রতিক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে । বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ও শক্তি হানি ঘটেছে.... সমাজতান্ত্রিক দেশ-গুলোতে সংগঠিত এসব ঘটনাকে পুঁজি করে সমাজতন্ত্রের শত্রুরা ইতিহাসের চাকা পশ্চাদগামী করার চেষ্টা চালাচ্ছে ।"[৩]

বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির অভ্যন্তরে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যা লঘিষ্ঠ - এই দু' পক্ষের মতামত থেকে বেশ পরিস্কার যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মার্কসবাদকে আর পূর্বের মতো পার্টির মতাদর্শগত ভিত্তি হিসেবে মনে করছেন না । পরোক্ষভাবে মার্কসবাদকে ত্যাগ করার কথাই বলেছেন, সমাজতন্ত্র পৃথিবী থেকে শেষ হয়ে গিয়েছে এমন মত ঘোষণা করছেন । অপরদিকে সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের চিন্তাকে পার্টির মতাদর্শগত ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে তাকে অনুসরণ ও বিকাশের পক্ষে । কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে এ-নিয়ে বর্তমানে দু'টি পরস্পর বিরোধী ধারা বিরাজ করছে ।

---

১. মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, (সম্পাদক কেন্দ্রীয় কমিটি বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি) " বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসের বিবেচনা ও অনু-মোদনের জন্য উত্থাপিত কতক বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের সুনির্দিষ্ট বিকল্প প্রস্তাবনা।" পৃ. ৪ ।

২. 'কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট', বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি, পঞ্চম কংগ্রেস, ৩-৮ অক্টোবর, ১৯৯১, পৃ. ৮০ ।

৩. মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সম্পাদক কেন্দ্রীয় কমিটি : " বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উত্থাপিত কতক বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের সুনির্দিষ্ট বিকল্প প্রস্তাব," পৃ. ১৩ , ১৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে পার্টির চিন্তার বিভিন্ন সময় পরিবর্তন লক্ষণীয়। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস ১৯৮৯ সালে বলা হয়, "উৎপাদন শক্তির বিকাশের সাথে সাথে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তন করা দরকার। সমাজতান্ত্রিক সমাজে যার অর্থ দাঁড়ায় সামাজিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন ও বিকাশ সাধন। কমরেড গরবাচভ সেই লক্ষ্যেই এই ধরণের সংস্কার এনেছেন। নিশ্চয়ই এর ইতিবাচক দিক আছে।"[১] একই কংগ্রেসে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রসংগে রিপোর্টে সমাজতান্ত্রিক চেতনা, মতাদর্শগত দুর্বলতাকে সমাজতন্ত্রের সংকটের কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়। সোভিয়েত ঘটনাবলীর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়, "এই ঘটনাসমূহ পার্টি নেতৃত্বের ভুল পদক্ষেপ এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধির কাজ ও মতাদর্শগত কাজকে হালকা করে দেখার কারণেই ঘটেছে বলে আমরা মনে করি।"[২] এই বিশ্লেষণে দেখা যায় পার্টি এক দিকে গরবাচভের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনকে সমর্থন করছে খুব সতর্কভাবে আবার সংকটের কারণ হিসেবে মতাদর্শগত দুর্বলতাকে দায়ী করছে। মতাদর্শগত দুর্বলতার এ ব্যাখ্যা সমাজতন্ত্রের সংকটের কোন বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা নয় এবং তাকে আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা। এ ব্যাখ্যার মধ্যে এক ধরণের বিষয়ীগততা রয়েছে। তবে চতুর্থ কংগ্রেসে পার্টির সাধারণ সম্পাদকের রাজনৈতিক রিপোর্টে সংকটের সমাধানের লক্ষ্যে বলা হয়"... মার্কসবাদ লেনিনবাদের মধ্যেই এর জবাব খুঁজে পাওয়া যাবে ....মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এখানে দিক

---

১. রাশেদ খান মেনন, সাধারণ সম্পাদকের রাজনৈতিক রিপোর্ট, খসড়া, কংগ্রেস দলিল নং ২/তাং ২০-৩-৮৯, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, চতুর্থ কংগ্রেস, ঢাকা, পৃ. ৩৭।

২. হায়দার আকবর খান রনো কর্তৃক উত্থাপিত, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রসংগে রিপোর্ট ২৪-২৮ নভেম্বর, ১৯৮৯ চতুর্থ কংগ্রেস, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, পৃ. ৪।

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশিকা হিসেবেই কাজ করবে। কারণ বর্তমান বিশ্বের অনেক কিছুই লেনিনের যুগে বাস্তব ছিল না। সেই সকল নতুন বাস্তবতা ও তার পারস্পরিক ইন্টারেকশন (যোগাযোগ) নতুন নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের বিষয়টিও কোথাও ছক কাটা ছিলনা। প্রয়োগিক অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে সকল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে পুনর্গঠনের পথে এগুতে হয়েছে।"[১] এর পর ৮ই নভেম্বর, ১৯৯১ পার্টির কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক তার প্রদত্ত বক্তব্যে বলেন, "গর্ভাচেভের নেতৃত্বে সে দেশের পুঁজিবাদ অভিমুখী যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল, তাতে আমাদের পার্টি উদ্বিগ্ন থাকলেও, আমরা ধারণা করতে পারিনি যে, সত্তর বছরের গড়া সমাজতন্ত্র এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়া হবে .... সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রের পতনের ফলে দুনিয়াজোড়া যে সব নতুন নতুন মতাদর্শগত বিষয় আলোচিত হচ্ছে আমরা তা গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করছি। আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, মার্কসবাদ লেনিনবাদ ও তার বিপ্লবী মতবাদসমূহ ভুল নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রের পতনের জন্যে আমরা সে সব দেশের পার্টির সংশোধনবাদী নেতৃত্ব ও সংশোধনবাদী নীতিসমূহকে প্রধানতঃ দায়ী করেছি। সমাজতন্ত্রের এই বিপর্যয়ের কারণে আমরা সমাজতন্ত্রের পথ পরিহার করার কথা মোটেই ভাবছিনা। বরং আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতে চাই যে, মার্কসবাদ লেনিনবাদের বিপ্লবী ও বৈজ্ঞানিক মতবাদের ভিত্তিতে যে সমাজতন্ত্র তাই-ই হচ্ছে আমাদের দেশের মুক্তির একমাত্র পথ।"[২] ওয়ার্কার্স পার্টির ১৯৯১ সালের ১ অক্টোবর কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত অপর এক দলিলে এটি বিষয়ে পার্টির ধারণাগত দুর্বলতার কথা স্বীকার করে বলা হয়, "আমরা সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বার্ধক্যের যুগ লেনিনের এই কথাটিকে অনেকটা যান্ত্রিকভাবে বুঝেছিলাম। আমরা আত্ম-সমালোচনা করে বলতে চাই যে, পুঁজিবাদকে জানা ও বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের ঘাটতি ছিল।

---

১. রাশেদ খান মেনন, সাধারণ সম্পাদকের রাজনৈতিক রিপোর্ট, চতুর্থ কংগ্রেস, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি, পৃ. ৩৬।

২. রাশেদ খান মেনন, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদকের প্রদত্ত বক্তব্য, ৮ নভেম্বর,'৯১ ঢাকা, কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলন, পৃ. ১২।

Dhaka University Institutional Repository

... সমাজতন্ত্র সম্পর্কেও আমাদের ধারণাও তেমন পরিস্কার ছিলনা ।"[১]

কেন্দ্রীয় কমিটির গৃহীত দলিলে বলা হয়, "এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে পরবর্তীতে বিশেষ করে ৮০ এর দশকে প্রায় প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশে এত গভীর অর্থ-নৈতিক সংকট কেন দেখা/ছিল ? বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের পরবর্তী সংশোধনবাদী নেতৃত্বই এর জন্য দায়ী, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তার জন্য দায়ী নয়।.... অর্থনৈতিক সংকট ও নৈতিকতার অবনতি ঘটেছে তখন থেকেই যখন থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এস্টা-গত মতাদর্শগতভাবে বিচ্যুত হতে শুরু করে- যার চরম পরিণতি ঘটে গর্ভাচেভের আমলে ।"[২] পৃথিবীব্যাপী সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পরও ওয়ার্কার্স পার্টির মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি । " সমাজতন্ত্রের এই সাময়িক বিপর্যয় সত্ত্বেও আমরা ঘোষণা করছি যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সমাজতন্ত্রের পতাকা আমরা দৃঢ় হাতে তুলে ধরবই, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে বিপ্লবই আমাদের পথ ।"[৩]

ওয়ার্কার্স পার্টির ব্যাখ্যায় দেখা যায় যেন বা মতাদর্শগত সংকট ও বিচ্যুতি সমাজ-তন্ত্রের সংকটের কারণ । শুধুমাত্র মতাদর্শগত দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করাটাও মতাদর্শগতভাবে আত্মগত (Subjective) ব্যাখ্যা । এই ব্যাখ্যার মধ্যে সম্পূর্ণ পরিস্থিতিকে বিষয়-গতভাবে দেখার দৃষ্টিভংগী নেই । এবং সমাজতন্ত্রের সংকটকে আন্তর্জাতিক পরিসর থেকে না দেখবার দুর্বলতা রয়েছে । কারণকে এইভাবে সরলীকরণ করার মধ্যে পার্টির তাত্ত্বিক দুর্বলতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে ।

---

১. হায়দার আকবর খান রনো, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় (৯ই অক্টোবর '৯১) কমরেড হায়দার আকবর খান রনো কর্তৃক প্রদত্ত এবং কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত রিপোর্ট, পৃ. ১২ ।

২. প্রাগুক্ত ।

৩. প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল

শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল মনে করে "এক দেশে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় সম্ভব'- তত্ত্ব সামনে রেখে স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির যে ভুল যাত্রা শুরু, তারই অনিবার্য পরিণতি পরবর্তীকালে পুঁজিবাদের সাথে দীর্ঘকালীন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পুঁজিবাদকে পরাজিত করার তত্ত্বের উদ্ভব । যার শেষ পরিণতি আজকের গর্বাচেভের উদ্ভব এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন কম্যুনিষ্ট পার্টি বাতিল ।"[১] শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল সোভিয়েত পরিবর্তন সম্পর্কে মনে করে যে, "এই পরিবর্তনের শুরু হয়েছে ১৯২৫ সালে ' এক দেশে সমাজতান্ত্রিক বিজয় সম্ভব নয়' লেনিনের এই নীতি পরিহারের পর থেকে ।"[২] এই দল পূর্ব ইউরোপে কোন সমাজতন্ত্র ছিল বলে মনে করেনা । এই দলের মতে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে বিকৃত ধরণের আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রন প্রবর্তন করা হয়েছিল তার সাথে সমাজতন্ত্রের কোন মিল নেই । তাই পূর্ব ইউরোপের ঘটনা সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা হিসেবে অভিহিত করা যায় না ।

সমাজবাদী দল এসব কিছুর পরও মনে করে "মার্কসবাদ লেনিনবাদ মিথ্যে হয়ে যায়নি । ব্যর্থ হয়েছেন একশ্রেণীর নেতৃত্ব মার্কস-লেনিনের শিক্ষাকে বাস্তবে কার্যকরী করতে ।"[৩] সমাজবাদী দলের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, তারা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটকেই প্রধানত এ বিপর্যয়ের কারণ বলে মনে করছেন । এই দেখার মধ্যে সমাজতন্ত্রের সংকটের কারণ চি-হ্নিত করার একটি সার্বিক দৃষ্টিভংগীর দুর্বলতা রয়েছে ।

---

১. নির্মল সেন, "সোভিয়েট ইউনিয়নে যা ঘটলো" সমাজবাদী, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের বুলেটিন, ২৯ আগষ্ট, ১৯৯১ ।

২. নির্মল সেন, লেনিন থেকে গরবাচেভ, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের ফার্ষ্ট সেক্রেটারী সিদ্দিকুর রহমান কর্তৃক প্রকাশিত ও ২৩/২ তোপখানা রোড, ঢাকা থেকে প্রচারিত, সন ও তারিখ নেই, পৃ. ৬ ।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (খালেকুজ্জামান ভুঁইয়া)

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের মতে এরশেভ কর্তৃক অনুসৃত নীতির পরিণতি হচ্ছে গর্তাচভ । সমাজতান্ত্রিক দলের মতে " আজ নভেম্বর বিপ্লবের যৌক্তিকতা ও সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কে যত বিতর্কই তোলা হোক না কেন, বিগত ৭৪ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সংশোধনবাদই আজকের সমস্যা বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে । শোধনবাদী নেতৃত্বের ভূমিকা ও কার্যকলাপই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য দায়ী । কিন্তু প্রতিবিপ্লবাশীল চক্র আজ এটাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিজস্ব ব্যর্থতা হিসেবে প্রমাণ করতে চাইছে ।"[১]

সমাজতান্ত্রিক দলের এ দলিলের এক জায়গায় বলা হয়, " নভেম্বর বিপ্লবের ভাবাদর্শ-মার্কসবাদ হচ্ছে বিজ্ঞান এবং সমস্ত বিজ্ঞানের বিজ্ঞান হিসেবে মার্কসবাদ গড়ে উঠেছে । ফলে বিজ্ঞান যেমন কখনই অকার্যকরী হয়ে পড়তে পারেনা তেমনি মার্কসবাদ ও কখনও অকার্যকরী হতে পারেনা ।"[২]

এই বক্তব্যে মারাত্মক ভ্রান্তি পাওয়া যায় । মার্কসবাদ সমস্ত বিজ্ঞানের বিজ্ঞান, এমন অযৌক্তিক দাবী কখনোই মার্কস করেননি । মার্কসবাদ কোনভাবেই সমস্ত বিজ্ঞানের বিজ্ঞান নয় । ' বিজ্ঞান যেমন কখনই অকার্যকরী হতে পারেনা মার্কসবাদও কখনও অকার্যকর হতে পারেনা ' - এর সাদৃশ্য অনুমান বিভ্রান্তিজনক । বিজ্ঞান কখনই অকার্যকরী হতে পারে না । বিজ্ঞান ও দর্শনে পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করবেন বিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই অচল, অকার্যকর, বিজ্ঞান কখনোই চিরন্তনতা দাবী করেনা । বিজ্ঞানের কোন সূত্র ভুল বলে প্রমাণিত হলেই তা বাতিল হয়ে যায় ।

---

১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল, " মহান নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা আজও অম্লান", ত্যানগার্ড, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বুলেটিন - ৩৮, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৭ ।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

এ ভাবে বিজ্ঞানের ইতিহাস এগিয়েছে । তাই বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের উপরোক্ত-ভাবে মার্কসবাদকে দেখা মার্কসবাদ বিরোধী ভাববাদিতা । এর মধ্যে সরলীকরণ আর আবেগ থাকলেও পর্যালোচনামূলক ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভংগি নেই । বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল মনে করে যে, "সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের শিক্ষা থেকে গড়ে ওঠা মার্কসবাদী লেনিনবাদী মতাদর্শের সঠিক উপলব্ধি ও তার সৃজনশীল বিকাশ ভবিষ্যত বিপ্লবের সাফল্যকে সুনিশ্চিত করবে ।"[১]

গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট

গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের প্রধান নেতা বদরুদ্দীন উমরের বক্তব্য ও বিশ্লেষণ তুলে ধরে গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের অবস্থান তুলে ধরা হলো । গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের নেতা বদরুদ্দীন উমর গর্ভাচভের পেরেস্ত্রইকা গ্লাসনস্থ কর্মসূচী গৃহীত হবার আগে থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ-যার মূল কথা মুখে সমাজতন্ত্র কাজে সাম্রাজ্যবাদ - এ ভাবে চিহ্নিত করতেন । এই জোটের নেতার মতে "কমরেড স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিবাদী বিকাশের.. ধারা এক্ষেত্রের নেতৃত্বে সংগঠিত হতে শুরু করেছিলো ।"[২] এই জোট বিদ্যমান সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপর্যয়কে সংশোধনবাদের পরিনতি হিসেবে মনে করে । এই জোট গর্ভাচেভের পেরেস্ত্রইকা কে প্রতিবিপ্লবী তত্ত্ব হিসেবে চিহ্নিত করে । " সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টি ও তার নেতা গর্ভাচেভ এখন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে প্রতিবিপ্লবী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন, তার দার্শনিক ও তাত্ত্বিক ভিত্তি পেরেস্ত্রইকা । গর্ভাচেভ যে সব কথা বলছেন এবং যেভাবে বলছেন তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তার সঙ্গে মার্কসবাদ লেনিনবাদের কোন সম্পর্ক নেই এবং যে তত্ত্ব ও লাইন এর মাধ্যমে ফেরী করা হচ্ছে সে তত্ত্ব লাইনের চরিত্র সম্পূর্ণ প্রতিবিপ্লবী ।"[৩]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭ ।

২. বদরুদ্দীন উমর, "বিশ্ব প্রতিবিপ্লবের দ্বিতীয় কেন্দ্র", সংস্কৃতি, সংখ্যা ২২, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৮১, পৃ. ১

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫. ৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট মনে করে পেরেস্ত্রইকার সঙ্গে মার্কসবাদ লেনিনবাদের কোন সম্পর্ক নেই উপরন্তু তা হলো মার্কসবাদ লেনিনবাদের বিপরীত এক তত্ত্ব। সমাজতান্ত্রিক বিপর্যয় ও গ্লাসনস্ত, পেরেস্ত্রইকার প্রভাবে বাংলাদেশের মার্কসবাদী আন্দোলন সম্পর্কে এ জোট মনে করে এ বিজয় ও বিভ্রান্তি সাময়িক। "অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য এই প্রচারের একটা দুষ্ট প্রভাব বাংলাদেশে থাকবে। কিন্তু এর থেকে এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, এই পরিস্থিতি স্থায়ী অথবা বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বাঙলাদেশে সংগঠিত হচ্ছে এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই তা যথেষ্ট শক্তিশালী এক রাজনৈতিক প্রবনতায় পরিণত হবে।"[১] তারা মনে করেন, "এখানে শ্রেণী সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা বাস্তব পরিস্থিতি থেকেই উদ্ভূত এবং এই সংগ্রাম তার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য বাদ দিয়ে কোন রাজনীতি এদেশে কার্যকর হওয়ার কোন সম্ভাবনা একেবারেই নেই... ।"[২] এই বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় এই বিপর্যয় সমাজতন্ত্রের নয়, তা 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ' ও পুঁজিবাদের, যা প্রকারান্তরে বাস্তবতাকে অস্বীকার করে। এটা এক ধরণের চরমপন্থী এক-দেশদর্শী ব্যাখ্যা।

ইতিহাসের বর্তমান পর্যায়ে বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়কে 'সমাজতন্ত্রের' বিপর্যয় হিসেবে গ্রহণ করে বিদ্যমান বাস্তবতাকে স্বীকার করতে হবে। এ সমস্যার কারণ ও সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্যে সৃজনশীল পর্যালোচনামূলক দৃষ্টিভংগী দরকার। সমাজতন্ত্রের বর্তমান বিপর্যয়ের মধ্যদিয়ে সাবেক সমাজতন্ত্রী দেশগুলি চিরায়ত পুঁজিতন্ত্রে ফিরে যাবার সম্ভাবনা কম বলে মনে হয়। বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের পতনের অর্থ পুঁজিবাদের শ্রেষ্ঠত্ব নয়, বরঞ্চ বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের পতন এই কথাই সম্ভবত প্রমাণ করে যে ইতিহাসের বর্তমান পর্যায়ে সমাজতন্ত্র তার যাবতীয় স্থূলতা ও ত্রুটি নিরসনের নতুন পথ অনুসন্ধান করছে। বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের পতনের মধ্য দিয়ে ইতিহাসে আরো বিকশিত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যুগ শুরু হয়েছে বলে মনে হয়।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

আগামী দিনে বিজ্ঞান প্রযুক্তির আরো বিকাশ, উৎপাদনে মানবীয় শ্রমের পরিমাণ একেবারেই কমিয়ে দেবে । উৎপাদন, বিনিময়, ভোগের জন্যে সমাজকে সচল রাখার প্রয়োজনে সামাজিক মালিকানার অনিবার্যতার বিষয়টি আগামী ইতিহাসে সম্ভবত আরো অনিবার্য, আবশ্যক বিষয় হয়ে পড়বে ।

এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট আন্দোলনের উপরোক্ত ইতিহাস পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে,

১. বাংলাদেশে মার্কসবাদ একটি সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ হিসেবে গৃহীত হয়েছে । দর্শন হিসেবে মার্কসবাদ গৃহীত ও চর্চা হয়েছে খুবই কম ।

২. বাংলাদেশে মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে ভাববাদী রাজনৈতিক দলগুলি ধর্মকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছে ।

৩. বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের ধর্মভীরু মনন এখানে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অর্থাৎ মার্কসবাদের দর্শনকে গ্রহণ ও চর্চার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করেছে ।

৪. বাংলাদেশে মার্কসবাদী আন্দোলনের মধ্যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন চর্চার দুর্বলতার কারণে মার্কসবাদী ধারার আন্দোলনের মধ্যে দ্বান্দ্বিক বোধের অভাব ও দার্শনিক দারিদ্র পরিলক্ষিত হয় ।

৫. বাংলাদেশের মার্কসবাদী দলগুলি জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও শ্রেণী সংগ্রাম এই দুয়ের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করতে পারেনি । এ কূটাভাস (Paradox) বাংলাদেশে মার্কসবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা গুরুতর সমস্যা হিসেবে কাজ করছে । এক্ষেত্রে মার্কসবাদী দলগুলি কখনো জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে প্রধান ভেবে বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃত্বে, তাদের সহযোগী হয়ে, নিজেদের স্বতন্ত্র রাজনীতি বিসর্জন দিয়েছে । আবার অনেক ক্ষেত্রে উল্টোভাবে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের যথার্থতা উপলব্ধি না করতে পেরে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বাদ দিয়ে শ্রেণী সংগ্রাম করেছে ।

Dhaka University Institutional Repository

৬. বাংলাদেশের মার্কসবাদী আন্দোলন সংগ্রামের কৌশল সম্পর্কে অধিকাংশ সময়ই বিভ্রান্ত ছিল। কখনো সন্ত্রাসবাদ, কখনো শান্তিপূর্ণ পথ, নিরন্তর গণযুদ্ধ অথবা গণআন্দোলন, অথবা ষড়যন্ত্রমূলক অভ্যুত্থান-এর কোন্‌টি ক্ষমতা দখলের পথ হবে তা নিষ্পত্তি করতে পারেনি। যা তাঁদেরকে বহুধা বিভক্ত ও বিভ্রান্ত করেছে।

৭. বাংলাদেশের মার্কসবাদী আন্দোলন সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও শ্রেণী আন্দোলনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারেনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মার্কসবাদীরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শ্রেণী আন্দোলন থেকে ভিন্ন কিছু ভেবেছেন। মার্কসবাদী দলগুলির মধ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শ্রেণী সংগ্রামের বিশেষ অভিব্যক্তি হিসেবে না দেখার যান্ত্রিক ও সুরতন্ত্র কাজ করেছে।

৮. বাংলাদেশের মার্কসবাদী দলগুলির মধ্যে মার্কসবাদকে উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে চিন্তার সংহতি অধিকাংশ সময় প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

৯. বাংলাদেশে মার্কসবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদী দ্রোহ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। বিচার বিশ্লেষণ, পর্যালোচনামূলক দৃষ্টিভংগী থেকে মার্কসবাদ গৃহীত হয়নি।

১০. বাংলাদেশের মার্কসবাদী আন্দোলনের মধ্যে অন্ধ অনুকরণ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে মার্কসবাদ চর্চায় ব্যক্তিস্বর ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

৩. বাংলাদেশে মার্কসবাদ চর্চায় ব্যক্তির ভূমিকা

৩.১ বাংলায় সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদের প্রাথমিক পরিচয় পর্ব

রুশ দেশে অক্টোবর বিপ্লবের অনেক পূর্বে বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সাথে অনেক বাঙালীর পরিচয় ছিল বলে জানা যায়। এদের মধ্যে রয়েছেন রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজীও-পন্থী ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ। তবে এরা সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সাথে পরিচিত থাকলেও মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম সম্পর্কে তখনো সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। ১৮৪৮ সালের দিকে ইউরোপে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল। সমাজতন্ত্রী বলতে তখন বোঝাতো ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক ধারার অনুসারী রবার্ট ওয়েনপন্থী ও ফ্রান্সের ফুরিয়ের পন্থীদের। নিতান্ত রাজনৈতিক পরিবর্তনের চাইতে সে সময় যারা সমাজের একটা আমূল পরিবর্তনে আস্থাবান ছিলেন তারা কমিউনিষ্ট হিসেবে পরিচিত ছিল।[১]

রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ এরা কেউ মার্কসবাদী ছিলেন না। বরঞ্চ দার্শনিক দিক দিয়ে এরা ছিলেন ভাববাদী। তা সত্ত্বেও এখানে প্রথম পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক ধারণার প্রাথমিক প্রচার তাদের মধ্যদিয়েই ঘটেছিল। যা পরবর্তীকালে মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক ধারণাকে প্রচার ও গ্রহণের প্রাক ভিত্তিভূমি নির্মাণ করেছিল। এদিক থেকে বাংলাদেশে মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক চেতনা বিকাশের পূর্বে সমাজতান্ত্রিক ধারণা প্রচারের মধ্য দিয়ে প্রাক প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্যে উপরোক্ত ব্যক্তিদের অবদান অনস্বীকার্য।

---

১. এ প্রসঙ্গে এঙ্গেলস বলেন "... ১৮৪৭ সালে সমাজতন্ত্র ছিল বুর্জোয়া আন্দোলন আর কমিউনিজম শ্রমিক শ্রেণীর। অন্তত ইউরোপ মহাদেশে সমাজতন্ত্র ছিল 'ভদ্রস্থ', আর কমিউনিজম ছিল ঠিক তার বিপরীতে।", কার্লমার্কস ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, 'কমিউনিষ্ট পার্টির ইশতেহার'-এর ইংরেজী সংস্করণ ১৮৮৮, এঙ্গেলসের ভূমিকা থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

রাজা রামমোহন রায় প্রথম সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সাথে পরিচিত হন ।" The first contact of resurgent India with Socialist thought was through Raja Rammohan Roy. . ."[১]

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নব জাগরণ ঘটে । এই নব জাগরণ রেনেসাঁস হিসেবেও পরিচিত । বাংলার নবজাগরণ কিছুটা কল্পনাশ্রয়ী সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ও ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত ছিল বলে মনে করা হয় । ১৮৭০ সালের পূর্বে বাংলায় 'কমিউনিজম' শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়না।'কমিউনিজম' শব্দটি ১৮৭০ সালে বাংলায় অন্ততঃ একাডেমীক পর্যায় কিছুটা পরিচিত হয়ে উঠেছিল বলে মনে হয় । এ প্রসঙ্গে চিন্মোহন সেহানবীশ তাঁর 'রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী' গ্রন্থে ১৮৭০ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. পরীক্ষার একটি প্রশ্ন তুলে ধরেছেন । "১৮৭০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হল," What is the aim of commiunism ? Dercribe the schemes propounded by Fourier and St.Simon respectively."[২]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ প্রশ্ন থেকে এটা মনে হয় যে সম্ভবত 'কমিউনিজম' বলতে তাঁরা কল্পনাশ্রয়ী সেন্ট সাইমন ও ফুরিয়েরের সমাজতন্ত্রকে বুঝিয়েছেন ।

'কমিউনিষ্ট' শব্দটি উইলিয়াম ডি হাকার ১৮৭১ সালে তাঁর 'Indian Musalmans' গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন । তিনি "ভারতীয় ওয়াহাবিদের ধর্ম ও রাজনীতি উভয়তই চরম বিরুদ্ধ পন্থী প্রমাণের জন্য তাঁদের 'Communist and Red-republicans in Politics ব্যাখ্যা দিলেন তখন কমিউনিজম আর নিছক বুদ্ধিজীবির মানসবর্গ রইল না, সেটা হল

---

১. Sankar Ghose, Socialism and communism in India, Allied Publishers, India, 1971, p. 1

২. চিন্মোহন সে হানবীশ, রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মের আবরণে পরিচালিত কৃষক বিদ্রোহ থেকে উদ্ভূত একধরণের সাম্য চিন্তা যার নজির চতুর্দশ শতক থেকে ইউরোপের ইতিহাসে মেলে ভূরি ভূরি ।"[১]

'তত্ত্ববিধোনী' পত্রিকায় ১৮৭৩ সালে 'টিপু পাগলা' নামে এক কৃষক নেতার নাম উল্লেখ পূর্বক তাকে পূর্ববাংলার লুইব্রাঙ্ক হিসেবে অভিহিত করা হয় । এ থেকে মনে হয় যে ঐ সময় শিক্ষিত লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সাথে পরিচিত ছিলেন ।

১৮৭১ সালে কলিকাতা থেকে অজ্ঞাতনামা একজন ব্যক্তি প্রথম আন্তর্জাতিকের কলিকাতা শাখা গঠনের অনুমতি চেয়ে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন ।

১৮৭৪ সালের মে মাসে ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট নেতা শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারত শ্রমজীবি' নামে একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন । প্রথম সংখ্যায় শিবনাথ শাস্ত্রীর 'শ্রমজীবি' নামক একটি কবিতার কয়েকটি লাইন ছিল এরকম :

" ওই দেখ সাগর পারে,
শ্রম জীবি শত শত
কেমন সংগ্রামে রত
এই রব - রবে না আঁধারে
আয় তোরা দেখি যে সবারে ।"[২]

এখানে প্রথমনাথ শাস্ত্রী সাগর পারের প্যারিকমিউন নাকি জার্মান সমাজতন্ত্রীদের সংগ্রামের কথা বলতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট নয় । বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) বাংলায়

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭ ।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২, ১৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজতান্ত্রিক ধারণাকে ব্যাপক পরিচিতি প্রদান করেন। বঙ্কিম চন্দ্র তার 'বাহুবল ও বাক্যবল', 'সাম্য', 'বিড়াল', 'বঙ্গদেশের কৃষক', - এসব প্রবন্ধে কম্যুনিজম, সোশ্যালিজম, কম্যুনিষ্ট, সোশিয়ালিষ্ট শব্দগুলিকে প্রথম ব্যাপক পরিচিতি প্রদান করেন। বঙ্কিম চন্দ্র তাঁর সাম্য প্রবন্ধে বলেন," "ভূমি সাধারণের" এই কথা বলিয়া রুসো যে মহা বৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার নিত্যনূতন ফল ফলিতে লাগিল। অদ্যাপি তাহার ফলে ইউরোপ পরিপূর্ণ। "কম্যুনিজম্" সেই বৃক্ষের ফল। "ইন্টারন্যাশনাল সেই বৃক্ষের ফল"।"[১]

রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর তরুণ বয়সেই পরিচিত হন সমাজতান্ত্রিক ধারণার সাথে। 'সাধনা' পত্রিকায় ১৮৯১-৯২ সালে তাঁর 'ক্যাথলিক সোস্যালিজম' ও 'সোস্যালিজম' নামক প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে তার প্রমাণ মেলে। ১৮৯৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন "সোসিয়ালিষ্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধনবিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানিনে - যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারি হতভাগ্য।"[২] উনিশ শতকের শেষ দশকে 'অমৃত বাজার' পত্রিকায় বিদেশের শ্রমিক আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের খবর প্রকাশিত হতে থাকে। অমৃত বাজার পত্রিকায় ১৮৯৩ সালে অরবিন্দ ঘোষ লিখেন," আমাদের মধ্যে যারা প্রলেটারিয়েট তারা অজ্ঞতায় নিমজ্জিত ও দুর্দশায় জর্জরিত। কিন্তু এখন যখন আনুরিকতা, শক্তি ও বিচার-বিবেচনার দিক থেকে মধ্যশ্রেণী অক্ষম প্রতিপন্ন হয়েছে তখন আমরা পছন্দ করি চাই না করি, ঐ দুর্দশাগ্রস্থ ও প্রলেটারিয়েটের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের আশার, আমাদের ভবিষ্যতের একমাত্র ভরসা।"[৩] 'প্রলেটারিয়েট' শব্দটি বাংলায় সম্ভবত প্রথম ব্যবহার করেছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। তবে তিনি সমকালীন মার্কসবাদীরা যে অর্থে 'প্রলেটারিয়েট' কথাটি বুঝে থাকেন সে অর্থে বুঝেন নি।

---

১. বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "সাম্য" বঙ্কিম রচনাবলী, শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৮৪, পৃ. ৩৮৭।

২. রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, ছিন্ন পত্র, পত্র ৮১, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ১৬৩।

৩. চিমোহন সেহান বীশ, রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী, মণীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৩, কলিকাতা, পৃ. ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকে স্বামী বিবেকানন্দ নিজকে সমাজতন্ত্রী হিসেবে ভাবতেন । বিবেকানন্দ তার "Cast, Culture and Socialism" পুস্তিকায় "I am a Socialist " প্রবন্ধে বলেন " দিন আসবে যখন প্রত্যেক দেশে শূদ্ররা তাদের সহজাত শূদ্র প্রকৃতি ও আচরণাদি সমেত... প্রতিটি সমাজেই পূর্ণ আধিপত্য লাভ করবে । ঐ নব শক্তির প্রত্যুষ লগ্নের প্রথম রশ্মিগুলি ইতিমধ্যেই ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে পাশ্চাত্য দুনিয়ার উপরে... সোস্যালিজম, এনার্কিজম, নিহিলিজম এবং ঐ ধরণের গোষ্ঠীগুলি আসন্ন সমাজ বিপ্লবেরই অগ্রদূত ।"[১]

বঙ্কিম চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দঘোষ ও বিবেকানন্দ যে সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন তা মার্কসীয় সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম নয়, এবং তাঁরা চিন্তার দিক থেকে বস্তুবাদীও ছিলেন না । তা সত্ত্বেও বাংলায় সাম্যবাদী চিন্তার বিকাশে তাঁরা অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছিলেন, " বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ বা অরবিন্দ কেউই মার্কসীয় মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না । প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন না কোন প্রকারের ভাববাদী দর্শন ও জীবন দর্শন তাঁরা প্রচার করেছেন । সে অর্থে তাঁদের জীবন সাধনা প্রবাহিত হয়েছে মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার প্রতিকূলে । তবে মার্কসবাদের ধন সাম্যের আদর্শ তাঁদের আকৃষ্ট করেছিল এবং সাম্যবাদের ভাবগঙ্গাকে বাংলার চিত্তভূমিতে প্রবাহিত করার প্রাথমিক দায়িত্ব তাঁরা পালন করেছিলেন ।"[২]

সমাজতন্ত্র সম্পর্কে উপরোক্তদের রচনার মধ্যে তখনও মার্কস এঙ্গেলস নামের উল্লেখ হয়নি । ১৯০০ সালে 'Dawn' পত্রিকায় শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় " The Indian economic problem" শীর্ষক একটি রচনায় সর্বপ্রথম এঙ্গেলস-এর 'Condition of the working class in England in 1844' বইটির নাম উল্লেখ করেন । এছাড়া এ সময়কালে বাংলার

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯ ।

২. সাঈদ উর রহমান, " বাংলায় মার্কসবাদী চিন্তার বিকাশ ও প্রসার," বাঙালীর চিন্তাধারার আধুনিক যুগ, ওয়াকিল আহমদ সম্পাদিত, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭০, পৃ. ১৪৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

বাইরের ভিন্নভাষী লালা হরদয়াল "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় "Karl Marx, A Modern Rishi" নামক প্রবন্ধ লিখেছেন। রামকৃষ্ণ পিল্লাই ১৯১২ সালে মালায়ুমি ভাষায় মার্কসবাদ সম্পর্কে লিখেছিলেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উনিশ শতকের বাংলায় ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক ধারণার সাথে অনেক বাঙালীর পরিচয় ছিল। কিন্তু মার্কসবাদ, মার্কসীয় সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম তখনো বাংলায় পরিচিত হয়ে ওঠেনি বলেই মনে হয়।

১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পরে বাংলায় মার্কসবাদ পরিচিতি লাভ করতে থাকে। অক্টোবর বিপ্লবের পরে গান্ধীবাদ বিরোধিতার মধ্যদিয়ে মার্কসবাদী ধারণার বিকাশ লাভ শুরু হয়: "The issue centring round which the ideological question moved after the great october Revolution in Russia was : What would be the scientific Marxist approach to Gandhism ?"[১]

বাংলায় মার্কসবাদ চর্চা গভীরতা ও ব্যাপকতা লাভ করে তিরিশের দশকে। বাংলা সাময়িক পত্রে রুশ বিপ্লব সম্পর্কে অনেক লেখা সে সময় প্রকাশিত হতে থাকে। এই সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'দি মডার্ণ রিভিউ', 'পরিচয়', 'হিন্দুস্থান রিভিউ', 'দৈনিক বসুমতি', 'মোহাম্মদী', 'বিশ্বমিত্র', 'হিতবাদী', 'আত্মশক্তি', 'বিজলী', 'শঙ্খ', 'ধূমকেতু', 'গণবাণী', 'লাঙল', 'ঢাকার বাংলার বাণী', 'নোয়াখালীর দেশ বাণী'।- এসব পত্র পত্রিকায় রুশ বিপ্লব নিয়ে অনেক লেখালেখি প্রকাশিত হয়।

---

১. Amalendu De, " A few words on Professor Ruben and on the Pioneers of Marxist Indology in Bengal," Marxism and Indology, Edited by Debiprasad Chattopadhyaya, Calcutta, New Delhi, 1981, p. 46.

Dhaka University Institutional Repository

উপরোল্লেখিত পত্র পত্রিকা ছাড়াও রুশ বিপ্লব, মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ এসব বিষয় নিয়ে বেশ কিছু পুস্তক-পুস্তিকাও প্রকাশিত হয় । এর অধিকাংশই ছিল প্রাথমিক ধারণার বই, পরিচিতিমূলক,এ ছাড়াও ছিল কিছু অনুবাদ । মার্কসবাদ তখন বাঙালাদেশে একটি নতুন চিন্তা, সেদিক থেকে শুরুর পর্যায়টা স্বাভাবিক ভাবেই ছিল মার্কসবাদী ধারণার সাথে পরিচয় ঘটবার । তবে এক্ষেত্রে কিছু কিছু রচনা ছিল যাতে মার্কসবাদের আলোকে ভারত বাংলার সমস্যাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল । এই সময়কালে প্রকাশিত রচনাগুলির একটি অসম্পূর্ণ তালিকা প্রদান করা হলো :

রেবতী বর্মনের 'তরুণ রুশ' (১৯১৯), কবিভূষণ ঘোষের 'লেনিন' (১৯২২), হেমন্ত কুমার সরকারের 'স্বরাজ কোন পথে' (১৯২২), প্রিয় কুমার গোস্বামীর 'স্বাধীনতার স্বরাজ' (১৯২৩),হেমন্তকুমার সরকার ও বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতার সপ্ত সূর্য'(১৯২৩), নরেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'রুশ ক্রান্তির কর্মবীর' (১৯২৪), শৈলেনাথ বিশীর 'বলশেভিকবাদ' (১৯২৪), সরোজ রঞ্জন আচার্য্যের 'নব্য রুশিয়া' (১৯২৫), দেবজ্যোতি বর্মনের 'কালমার্কস' (১৯৩০), অমূল্য চন্দ্র অধিকারীর 'বিদ্রোহী রুশিয়া' (১৯৩০), সোমনাথ লাহিড়ীর 'সাম্যবাদ' (১৯৩১), সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাম্রাজ্যবাদ' ও 'লেনিন' (১৯৩১), মনিময় প্রামানিকের 'ঋষি কার্ল মার্কস ও তাঁহার মতবাদ'(১৯৩৩), মনীন্দ্র মোহন বন্দোপাধ্যায়ের 'মজুরী ও মূলধন' (১৯৩৩) । এছাড়াও ১৯৩২ থেকে ১৯৩৪ এসময়কালে প্রকাশিত কয়েকটি বই হলো, মনোরঞ্জন রায়ের 'ধর্ম ঘটের সমস্যা' ও 'কংগ্রেস ও সাম্যবাদী', মুজফফর আহমদের 'কৃষকের কথা', 'ভারতের কৃষক সমস্যা', সুদেশ রঞ্জন দাসের 'রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি: মার্কসবাদের দৃষ্টিতে', 'লেনিনবাদের সমস্যা',সরোজ মুখার্জীর 'প্যারিকমিউন', '১৯০৫ সালের বিপ্লব', 'সাম্যবাদে ভারত', 'ট্রেড ইউনিয়নের গোড়ার কথা', আবদুল হালিমের 'রুশিয়ার গণ আন্দোলন', 'কমিউনিষ্ট ইস্তেহার', 'বলশেভিক পার্টির ইতিহাস' ও চীনের কমি-উনিষ্ট বিপ্লব', শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর 'সমাজতন্ত্রবাদ : কালনিক ও বৈজ্ঞানিক' ইত্যাদি ।[১]

---

১. তথ্য সূত্র : সুশোভন সরকারের 'প্রসঙ্গ ইতিহাস', সাঈদ উর রহমানের প্রবন্ধ "বাংলায় মার্কসীবাদী চিন্তার বিকাশ ও প্রসার", সরোজ মুখোপাধ্যায়ের 'ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ও আমরা' দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা থেকে প্রকাশিত, দ্রষ্টব্য ।

Dhaka University Institutional Repository

এই সময়কালে প্রকাশিত পত্র পত্রিকা ও বই থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এগুলি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ইতিহাস সংক্রান্ত রচনা। মার্কসবাদের তিনটি দিকের দু'টি দিক শ্রেণী সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক দিক আলোচিত ও চর্চা হয়েছে। কিন্তু মার্কসবাদের অন্যতম আরেকটি দিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সম্পর্কে কোন রচনার পরিচয় পাওয়া যায় না।

সুশোভন সরকার এই সময়কালে রচিত লেখাগুলির চারটি দিক তুলে ধরেছেন। "রুশ বিপ্লবের পর প্রথম দশকের বাংলা সাময়িক পত্রের লেখার চারটি দিকের প্রতি আমাদের চোখ পড়ে। প্রথমত দেখতে পাই লেনিনের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন... দ্বিতীয়ত, সোভিয়েটের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা... তৃতীয়ত, অনেককে আকৃষ্ট করে সোভিয়েট দেশে সামাজিক পুনর্গঠনের ও সাধারণ মানুষের স্বার্থে শোষণ অবসানের সংগ্রাম চতুর্থ দিক হলো, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সোভিয়েট বিপ্লব থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ, শ্রমিক এবং বিশেষ করে কৃষক আন্দোলনে সেই শিক্ষা প্রয়োগের পক্ষে প্রচার।"[১] এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশে মার্কসবাদ একটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ হিসেবে গৃহীত ও আলোচিত হয়েছে। এই সময়কালে মার্কসীয় দর্শন বিষয়ক রচনার অনুপস্থিতি থেকে মনে হয় যে দর্শন হিসেবে মার্কসবাদ বাংলাদেশে গৃহীত হয়নি।

উপরোক্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে মার্কসবাদ একটি সামগ্রিক বোধ থেকে গৃহীত ও আলোচিত হয়নি। এমনকি এসময়কালের রচনাগুলিতে মার্কসবাদ সম্পর্কে ধারণার অসচ্ছতা ও বোধের অভাব ছিল। এ প্রসঙ্গে সুশোভন সরকার বলেন, "সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে সেদিন আমাদের জ্ঞান যে অসম্পূর্ণ ছিল, এতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মার্কস-এর নামোল্লেখ থাকলেও মার্কসবাদ সম্বন্ধে ধারণার অভাব তাই চোখে পড়ে। ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ: ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা, শ্রেণীর উৎপত্তি-বিকাশ-প্রকৃতি

---

১. সুশোভন সরকার, "বাংলা সাময়িক পত্রে রুশ বিপ্লবের প্রথম দশক", প্রসংগ ইতিহাস, নাভানা, পি-১০০, প্রিন্সেপ স্ট্রীট, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১২৭।

Dhaka University Institutional Repository

অথবা ইতিহাসে তার ভূমিকা এবং শোষণের স্বরূপ, ধনতন্ত্রের অনুর্ধিহিত সমস্যা ও অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, সমাজতন্ত্রের আদর্শ আর বৈশিষ্ট, সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগামী নেতৃত্ব-ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে আমরা তখনও অজ্ঞ ছিলাম।"[১] এই সময়কালে আইনগতভাবে মার্কসীয় সাহিত্য নিষিদ্ধ ছিল। গোপনে মার্কসীয় রচনাবলী সংগ্রহ করতে হতো, তাও ছিল বেশ কঠিন। এক্ষেত্রে সাধারণত রাজনৈতিক সাহিত্য প্রাধান্য পেত। এছাড়া রুশ বিপ্লবের প্রতি বাংলাদেশে আকর্ষণ তৈরী হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা এবং বঞ্চিত মানুষের মুক্তির স্বপ্নের মানবিক আলোড়ন থেকে।

উপরোক্ত আলোচনা, বিশ্লেষণ এবং ঐ সময়কালের প্রকাশিত পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকার তালিকা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলায় তখনো মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ছিল প্রায় অপরিচিত। মার্কস তখন বাংলায় যতটুকু আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল তা প্রধানত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে। বাংলায় মার্কসবাদ তাঁর দার্শনিক বস্তুবাদের কারণে গৃহীত হয়নি। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এমনকি উচ্চ শিক্ষিত মার্কসবাদীরা, পণ্ডিতমহল পর্যন্ত মার্কসবাদের অন্যতম দিক মার্কসীয় দর্শন নিয়ে কোন লেখা লিখেছেন বলে জানা যায় না। এপর্যন্ত মার্কসীয় দর্শন আলোচনায়ই আসেনি। কাজেই মার্কসীয় দর্শন নিয়ে এ পর্যন্ত তেমন কোন চর্চা হয়নি বলা যায়। তবুও মার্কসবাদ বাংলায় এভাবেই প্রাথমিক পরিচিতি লাভ করে। এ পর্বকে বাংলায় মার্কসবাদের প্রাথমিক পরিচিতির পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

৩.২ বাংলায় মার্কসবাদের সৃজনশীল প্রাথমিক প্রয়োগ পর্যায়

বাংলাদেশে মার্কসবাদের প্রাথমিক পরিচিতির সাথে সাথে মার্কসীয় তত্ত্বকে এখানকার সমাজ অর্থনীতি ও রাজনীতির বিশ্লেষণে, সংগ্রামের রণনীতি ও কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োগই হল মার্কসীয় তত্ত্বের সৃজনশীল প্রয়োগ পর্যায় । এই সৃজনশীল প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক মার্কসবাদী চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন । নিম্নে তা আলোচিত হলো ।

এমএন রায়

মানবেন্দ্রনাথ রায়, সংক্ষেপে এমএন রায় (১৮৮৭-১৯৫৪), পশ্চিম বাংলার চব্বিশ পরগনার সন্তান । তিনি প্রবাসে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন । এমএন রায় কেবলমাত্র একজন রাজনীতিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন দার্শনিক ও কর্মযোগী । এমএন রায় সম্পর্কে শিবনারায়ণ রায় বলেন, "বিশ শতকের সে এক আশ্চর্য অভিশপ্ত ।"[১] মানবেন্দ্র-নাথ রায় বিরাট পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন । তার রচিত গ্রন্থে সে পরিচয় মেলে । দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি ইত্যাদি সকল বিষয়ে তিনি একটি সমন্বিত বিশ্ব-রীকা প্রণয়ন করতে চেয়েছেন । মানবেন্দ্র নাথ রায় লিখেছেন অনেক । তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রধান রচনাগুলি হল, India in Transition (1912), The Future of Indian Politics(1926), Facism, The Philosophical Consequence of Modern Science, What do you want (1922), 'One Year of Non-cooperation : From Ahmedabad to Gaya'(1923), The aftermath of Non-cooperation(1926)

এমএন রায় ভারতে কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন । ভারতের কমিউনিষ্ট ইশতেহার রচনা ও কর্মসূচী প্রণয়ের নির্ধারক ভূমিকা রাখেন । এছাড়াও ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে কমিউনিষ্টদের ভূমিকা নিয়ে তার নিজস্ব মতা-মত রাখেন । দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিখ্যাত 'রায় লেনিন বিতর্ক' তার জাতীয় মুক্তি সংক্রান্ত চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় ।

---

১. শিবনারায়ণ রায়, "মানবেন্দ্রনাথ রায় : ভাবুক বিপ্লবীর জীবন চর্যা" শত বর্ষ স্মারক গ্রন্থ এম,এন, রায়, বাসন্তীগুহ ঠাকুরতা সম্পাদিত, পরিবর্তন প্রকাশনী সংস্থা ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১৭৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের শেষ প্রান্তে এমএন রায় র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজমের আদর্শের কথা বলেন। ১৯৫২ সালে International Humanist and Ethical Union গঠন করেন। এমএন রায় শেষ জীবনে কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে সম্পর্ক চ্যুত হয়ে তার নয়া মানবতাবাদ প্রচার করেন। ভারতের মার্কসবাদী রাজনীতিতে এমএন রায় এক দেদীপ্যমান উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তিনি বাংলায় মার্কসবাদী আন্দোলনের উদ্যোক্তা এবং সৃজনশীল প্রয়োগের পথিকৃত।

মুজফ্ফর আহমদ

মুজফ্ফর আহমদ বাংলাদেশের সন্তানের সন্তান। বাংলায় কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে বাস্তব কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে হাতে কলমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। একারণে তাকে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়।

১৯২০-২১ সালের দিকে তিনি ভারতীয় রাজনীতির সমস্যা নিয়ে লিখেছেন 'ধূমকেতু' পত্রিকায়। ১৯২৬ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত বাংলার ভূমি ব্যবস্থা, শ্রেণী সংগ্রাম, ভদ্রলোক শ্রেণী, সাম্প্রদায়িকতা, কংগ্রেস, শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন-এ-সম্পর্কে মার্কসীয় অবস্থান থেকে অনেক লেখালেখি করেছেন। ১৯৩৭ সালে মুজফ্ফর আহমদ রচিত 'কৃষক সমাজ' কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত। মুজফ্ফর আহমদ বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার চাইতে বাস্তব সাংগঠনিক কাজে অধিকতর ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর অসামান্য পরিশ্রমের মধ্যদিয়ে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি বাস্তব সাংগঠনিক শক্তি অর্জন করে। মুজফ্ফর আহমদের রচিত 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি' এবং 'কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ' গ্রন্থ দু'টি ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় এক ঐতিহাসিক মূল্যবান দলিল হিসেবে স্বীকৃত।

Dhaka University Institutional Repository

অবনী মুখার্জি

অবনী মুখার্জি প্রবাসে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। এমএন রায়ের India in transition নামক বিখ্যাত গ্রন্থখানা রচনায় অবনী মুখার্জি বিশেষ সহায়তা করেন। গ্রন্থে ব্যবহৃত উপাত্তসমহ তিনি এমএন রায়কে প্রদান করেছিলেন।

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

বাংলায় মার্কসবাদী চিন্তা প্রসারের ক্ষেত্রে অন্যতম ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তার বিদগ্ধ রচনা রয়েছে। তিনি ভারতীয় বর্ণ প্রথার শ্রেণী ভিত্তি নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি ভারতে কৃষি অর্থনীতি, ভারতের সমাজ-অর্থনীতি, শিল্প ও সংস্কৃতির মার্কসীয় বিশ্লেষণ প্রদান করেন। তাঁর উল্লেখ-যোগ্য রচনাগুলি হল 'Studies in Indian social Polity',(1944),'Dialectics of Land Economics of India'(1950),'ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি','Indian Art in Relation to culture','Dialectics of Hindu - Ritualism'(1950),'Vivekananda - The Socialist'(1928),'বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব'(১৯৪৫),'সাহিত্য প্রগতি'(১৯৪৫), যৌবনের সাধনা, তরুণের অভিযান/উল্লেখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন।

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মার্কসবাদী পণ্ডিত হিসেবে খ্যাত ছিলেন। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৬ সাল এই সময় কালে বাংলার বুদ্ধিজীবি মহলে রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় পণ্ডিত হিসেবে খ্যাত ছিলেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সুশোভন সরকার

পশ্চিম বাংলায় ১৯০০ সালে সুশোভন সরকার জন্ম গ্রহণ করেন । তিনি মার্কসবাদী পণ্ডিত হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত । ১৯২৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের রীডার ও পরবর্তীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন । সুশোভন সরকার ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন । 'পরিচয়' পত্রিকায় তার অনেক লেখা প্রকাশিত হয় । সেগুলি হল 'রুশ বিপ্লবের পটভূমিকা" (১৯৩১), " রুশ বিপ্লবের ইতিবৃত্ত" (১৯৩১), "সোসিয়ালিজমের মূল সূত্র" (১৯৩২), " সাম্যবাদীর সম্পদ "(১৯৩৮), এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত Journal of letters-এ "An Introductory Analysis of Dialectical Materialism" নামে মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের ওপর তাঁর একটি লেখা প্রকাশিত হয় । সুশোভন সরকারের রচনার সংখ্যা প্রচুর । এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ' A Marxian Glimpses of History', ' Note on Bengali Renaissance' (1961),'প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ', ' ইতিহাসের ধারা' (১৯৪৪)','প্রসঙ্গ ইতিহাস','Toward Mark','মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ', 'জাপানী শাসনের আসল রূপ' (১৯৪২), 'কম্যুনিষ্ট ইশতাহার' (১৯৪৩),'কার্ল মার্কসের শিক্ষা'(১৯৪২), ইত্যাদি । সুশোভন সরকার বাংলায় মার্কসীয় চিন্তা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন । তিনি সৃজনশীলভাবে মার্কসবাদকে বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ করেছেন ।

ধীরেন্দ্রনাথ সেন

ধীরেন্দ্রনাথ সেন ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন । তার রচনার সংখ্যা বেশী নয় । তিনি বাংলার সামাজিক সমস্যার মার্কসীয় ব্যাখ্যা দেন । ধীরেন্দ্রনাথ সেনের রচনাগুলি হল ,The Problems of Minorities'(1940), ' Revolution by Consent' (1947), 'From Raj to Swaraj'(1954), "The Paradox of Freedom' (1958)

Dhaka University Institutional Repository

রেবতী বর্মন

রেবতী বর্মন বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলায় ১৯০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। রেবতী বর্মন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের অনুসারী হিসেবে গড়ে ওঠেন, " The most prominent among the disciples of Dr. Datta was Rebati Burman, a noted Marxist of Bengal. He got his first lessons on Marxism from Dr. Datta in 1927-28."[১] রেবতী বর্মন প্রায় ১৫টির অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। মার্কসীয় চিরায়ত সাহিত্য থেকে 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' এবং 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' গ্রন্থ দু'টি বাংলায় অনুবাদ করেন। রেবতী বর্মনের রচনাগুলি হল 'তরুণ রুশ' (১৯২১), 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি' (১৯৩৮), 'মার্কস প্রবেশিকা' (১৯৩৮), 'কৃষক ও জমিদার' (১৯৩৮), 'সাম্রাজ্যবাদের সংকট' (১৯৩৮), 'হেগেল ও মার্কস' (১৯৩৮), 'ক্যাপিটাল' (১৯৩৮, বাংলায় সংক্ষিপ্তসার), 'ভারতের কৃষক সংগ্রাম ও আন্দোলন' (১৯৩৮), 'লেনিন ও বলশেভিক পার্টি' (১৯৩৯), 'সমাজের বিকাশ' (১৯৩৯), Marxist (1939), Society and its Development(1939) সোভিয়েট ইউনিয়ন' (১৯৪৪), 'শান্তিকামী সোভিয়েট' (১৯৪৫), অর্থনীতির গোড়ার কথা' (১৯৪৫), 'সমাজ ও সভ্যতার এগ্রবিকাশ' (১৯৪৭), ইত্যাদি। রেবতী বর্মন ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। তিনি বাংলায় মার্কসবাদী চিন্তা প্রসারের ক্ষেত্রে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছেন।

বাংলায় মার্কসবাদী এই ধারা এম্মানুয়ে বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে। মার্কসবাদী এই ধারা অনুসরণে পরবর্তীকালে বাংলাদেশে রাজনীতি, শিল্প সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় একটি শক্তিশালী মার্কসীয় চিন্তার ধারা গড়ে ওঠে। অগ্রজদের অনুসরণে পরবর্তীতে বাংলায় মার্কসীয় বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় যারা মার্কসীয় চিন্তার ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন তারা হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণুদে, বিনয় ঘোষ, সুকান্ত ভট্টাচার্য, গোপাল হালদার, মহাদেব প্রসাদ সাহা, ভবানী সেন, সত্যেন্দ্রনারায়ন মজুমদার, নরহরি কবিরাজ, সরোজ আচার্য্য, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

---

১. Amalendu De, "A few words on Professor Rubin and on the Pioneers of Marxist Indology in Bengal", Marxism and Indology, p.48.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় মার্কসবাদ চর্চার সৃজনশীল প্রয়োগের পর্যায় থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মার্কসীয় ধারার বুদ্ধিজীবীরা অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সাথে মার্কসবাদকে বাংলার সমস্যা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন এবং সেই সাথে মৌলিক মার্কসবাদকেও পরিচিত করে তুলেছেন। উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, কেবল এমএন রায় এবং সুশোভন সরকার মার্কসীয় দর্শন প্রসঙ্গে সামান্য লিখেছেন। এ পর্যায়ের অধিকাংশ রচনাই ছিল মার্কসবাদের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক দিক নিয়ে, মার্কসের দর্শন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ গুরুত্বপূর্ণভাবে আলোচনা ও লেখালেখির মধ্যে আসেনি। এ থেকে মনে হয় বাংলায় মার্কসীয় দর্শন চর্চা হয়েছে যৎসামান্যই।

সাধারণ মানুষ সাধারণত রাজনৈতিক, সামাজিক ও বিষয়গত প্রয়োজন দ্বারা তাড়িত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজের সংবেদনশীল সচেতন বুদ্ধিজীবী মহলে দার্শনিক বিষয়ে আলোচনা ও বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে থাকে। ফরাসী বিপ্লবে হেগেলের দর্শন, রুশোর চিন্তা ও ফরাসী বস্তুবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। হেগেলের দর্শন তৎকালীন জার্মানীসহ চিন্তার জগতে ব্যাপক আলোড়ন তৈরী করেছিল। প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা গিয়েছিল ডানপন্থী ও বামপন্থী হেগেলীয় ধারা। এমনিভাবে মার্কসের দর্শন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নিয়ে বাংলায় আলোচনা, আলোড়ন, লেখালেখি ও তর্কবিতর্ক কোন মহলেই লক্ষ্য করা যায় না।

ইতিহাস থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলায় মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি বেশ শক্তিশালী একটি মার্কসবাদী আন্দোলনের ধারার অস্তিত্ব ছিল। অথচ মার্কসীয় দর্শন চর্চা ছিল একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে মার্কসবাদ একটি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মতবাদ ও একটি সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা হিসেবেই কেবল গৃহীত ও চর্চা হয়েছে, দর্শন হিসেবে নয়। বাংলায় মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট আন্দোলন একটি শক্তিশালী ধারা হিসেবে বিরাজ করলেও এর মধ্যে দার্শনিক পুরিপুষ্টতার অভাব বেশ পরিস্কারভাবেই ফুটে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ বাংলাদেশে কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব

বাংলাদেশে মার্কসীয় চিন্তা প্রসারের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বাংলাদেশে মার্কসবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান সংগঠক ছিলেন মার্কসবাদী রাজনীতিকগণ। তাঁরা মার্কসবাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকলেও তাদের রচনার সংখ্যা দুঃখজনকভাবে কম। মার্কসীয় দর্শন নিয়ে তাঁদের মধ্যে দু-একজন লিখেছেন। কিন্তু তাঁরা মার্কসবাদী চিন্তা ও কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এই বিবেচনায় বাংলাদেশে মার্কসবাদী আন্দোলনের প্রধান সংগঠকদের নাম তুলে ধরা হলো। যেকোন চিন্তা ও আন্দোলনের প্রথম পর্বের সংগঠকদের গুরুত্ব ভিন্ন রকমের। এবং শুরুর পর্যায়ে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তির সংখ্যাও কম ছিল। এ বিবেচনায় সে পর্যায়ের ঢাকা ও বিভিন্ন জেলার সংগঠকদের নাম দেয়া সম্ভব হলেও পরবর্তী কালের অসংখ্য কর্মীর নাম প্রদান করা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে সমসাময়িক কালের কেবল মাত্র প্রধান নেতাদের নামোল্লেখ সম্ভব হয়েছে। কমিউনিষ্ট পার্টি কেবলমাত্র পার্টি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তৎপর ছিলনা। ব্যাপক জনগণকে সংগঠিত ও সম্পৃক্ত করার লক্ষে পার্টির শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও নারী সংগঠন ছিল। যার মধ্যে দিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টির তৎপরতা সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অব্যাহত ছিল। এসব গণ-সংগঠনের নেতৃত্বের নাম তুলে ধরা হলো। অসংখ্য নেতৃত্বের জীবনী তুলে ধরা দুরূহ কাজ তাই কেবলমাত্র নামোল্লেখ করা হলো। নাম প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্যের অসম্পূর্ণতা রয়েছে।

বাংলাদেশে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের আদি পর্বের নেতৃত্ব (১৯২৮-১৯৩৮)

ঢাকা জেলা

নৃপেন চক্রবর্তী

মনীন্দ্রসেন, গোপাল বসাক, নেপাল নাগ/জ্ঞান চক্রবর্তী, শহীদুল্লা কায়সার, আলী আকসাদ, জিতেন ঘোষ, সত্যেন সেন, প্রবোধগুপ্ত, সুনীল ঘোষ, বিনয়বসু, বজ্রেশ্বর রায়, অনিল মুখার্জি, ব্রজেনদাস, সুবোধ সেন, বারীন দত্ত, বেনুধর, সতীশ পাকড়াশী, সতীন রায়, গোপাল

Dhaka University Institutional Repository

গুপ্ত, অন্নদা পাল, সমর ঘোষ, যাদব চ্যাটার্জি, কুমার মিত্র, আমজাদ হোসেন, আলতাব আলী, নিরঞ্জন গুপ্ত, সুবীর উকিল, জহিরুদ্দিন, যতীন রায়, অজিত চ্যাটার্জি, অন্নদাপাল, প্রমথ নন্দী, ধরণী রায়, মৃনাল চক্রবর্তী ।

১৯৩৮ সালের দিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাগুলিতে যে সকল কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব ছিল সংক্ষেপে তার একটি তালিকা তুলে ধরা হলো :

নোয়াখালী - রসময় মজুমদার, ভবানী বিশ্বাস, অসিত ঘোষ ।

কুমিল্লা - ইয়াকুব মিঞা, সুবোধ মুখার্জি, চন্দ্রশেখর দাস, ফনী মজুমদার ।

পাবনা - অমূল্য লাহিড়ী, ঘটুলাহিড়ী, মোহাম্মদ সাজাহান ।

বগুড়া - আবদুল কাদের চৌধুরী, সুধীন চ্যাটার্জি ।

রাজশাহী- শুভ্রাংশু মৈত্র, অরুন চৌধুরী, নির্মল মৈত্র, জসিমউদ্দিন ।

ফরিদপুর - অনুকূল চ্যাটার্জি, শান্তি সেন, রথীন ঘটক ।

বরিশাল - মুকুল সেন, নৃপেন সেন, নীরেন ঘোষ, অমৃত নাগ, অমিয় দাস গুপ্ত, জ্যোতি দাস গুপ্ত, হীরালাল দাস গুপ্ত ।

নেত্রকোনা - সুনির্মল সেন, খুসদত্ত রায়, শশীন চক্রবর্তী, সুকুমার ভাওয়াল ।

কিশোরগঞ্জ - জমিয়ত আলী, শিশির রায় ।

ময়মনসিংহ - মণিসিংহ, আলতাব আলী, পুলিন বক্সী, রবিনিয়োগী, নগেন সরকার, কিতীশ চক্রবর্তী , পবিত্র শংকর ।

সিলেট - চিত্তরঞ্জন দাস, লালা শরবিন্দু দে, দিগেন দাস গুপ্ত, চন্দ্রকুল কুমার শর্মা, দীনেশ চৌধুরী, অমরেন্দ্র কুমার পাল ।

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম - যশোদা চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন সেন, বঙ্কিম সেন, কল্পতরু সেন গুপ্ত ।

রংপুর - অবনী বাগচী, শচীন ঘোষ, শিবদাস লাহিড়ী, মণিকৃষ্ণ সেন, বিনয় বাগচী ।

দিনাজপুর - সুশীল সেন, বিভূতিগুহ, হাজী দানেশ, গুরুদাস তালুকদার, সুনীল সেন ।

কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে সংশ্লিষ্ট 'ছাত্র ফেডারেশন'এর নেতৃত্ব

কালিপদ গাঙ্গুলি, অজিত রায়, রবিগুহ, দেবপ্রসাদ, কালু রায় (ময়মনসিংহ) চিত্ত বিশ্বাস (চট্টগ্রাম), অমিয় দাসগুপ্ত (বরিশাল), ঢাকায় মুনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম প্রমুখ ।

কমিউনিষ্ট পার্টির কৃষক সংগঠন 'কৃষক সমিতির' নেতৃত্ব

জিতেন ঘোষ, রানী দাস, ফনী গুহ, অমনুদাস, সন্তোষ চৌধুরী, সুনীল ঘোষ, শৈলেন পর্বত, রঞ্জিত ভৌমিক, নারুমুখার্জি, অমর গাঙ্গুলী, বিনয় বসু, অজয় ভট্টাচার্য প্রমুখ ।

কমিউনিষ্ট পার্টির নারী সংগঠন 'মহিলা সমিতি' এবং ১৯৪১-৪২ সালের 'বঙ্গীয় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র নেত্রীবৃন্দ

হিরণ বালা রায়, নিবেদিতা নাগ, অমিয়া দত্ত, শিখা গুহ, ডলি বসু, নিবেদিতা ঘোষ, রানী দাস, হাসি মুখার্জি, মৃনালিনী চক্রবর্তী, রানী মিত্র , দাশ গুপ্তা (দিনাজপুর), বীনাগুহ (দিনাজপুর), জোস্নানিয়োগী (ময়মনসিংহ), নিবেদিতা চৌধুরী (ঢাকা), হিরণ বালা(ঢাকা), কল্পনাদত্ত (যোশী) (চট্টগ্রাম), জ্যোতিচক্রবর্তী (চট্টগ্রাম), মনোরমা বসু (বরিশাল), মনি কুনুলা সেন (বরিশাল), যুঁইফোল (বরিশাল), তানুদেবী (খুলনা), চারুশীলা ঘোষ (খুলনা) ।

Dhaka University Institutional Repository

গণনাট্য সংঘ ও প্রগতিশীল লেখক শিল্পী সংস্থা

১৯৩১ সাল থেকে ঢাকায় প্রগতিশীল লেখক সংঘের তৎপরতা শুরু হয়। লেখক সংঘের প্রধান লক্ষ্য ছিল "সাম্যবাদী আদর্শে পরিচালিত হয়ে ক্ষুধা দারিদ্র সামাজিক পশ্চাদ-মুখিতা ও রাজনৈতিক পরাধীনতার মত সমাজের মূল সমস্যাকে সাহিত্যের বিষয় করার কথা এবং সামাজিক পরিবর্তনকে প্রগতিশীলতার খাতে এগিয়ে নেয়ার কথা।"[১] বাংলায় মার্কস-বাদী সাহিত্য ধারার প্রধান ব্যক্তিত্ব হলেন মানিক বন্দোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, অতুল চন্দ্র গুপ্ত, বিষ্ণু দে, গোপাল হালদার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন, অতুল বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রমুখ। চল্লিশের দশক থেকে বাংলাদেশে যারা শিল্প সাংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ধারাকে সংগঠিত করেছেন তারা হলেন - রনেশ দাস গুপ্ত (ঢাকা), কিরণ শংকর সেন গুপ্ত, মুনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম (ঢাকা), কলিম শরাফী (ঢাকা), সত্যেন সেন (ঢাকা), সোমেন চন্দ্র (ঢাকা), বিনয় রায় (রংপুর), নিবারণ পণ্ডিত (ময়-মনসিংহ), অখিলচন্দ্র (ময়মনসিংহ), রমেশশীল (চট্টগ্রাম)।

১৯৪৪ সালের দিকের বাংলাদেশের প্রধান কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব

মুজাফফর আহমদ, নেপাল নাগ, মোকা রায়, অনিল মুখার্জি, বারিন দত্ত, ডাঃ মারুফ হোসেন, কুমার মিত্র, নুরুল ইসলাম, শহিদুল্লা কায়সার, সুকুমার ভাওয়াল, রুহিনী দাস, সুধেন্দু দস্তি-দার, অমূল্য লাহিড়ী, মনিকৃষ্ণ সেন, কৃষ্ণ বিনোদ রায়, মোহাম্মদ তোহায়া, গুরুদাস তালুকদার, রওশন আলী, আফতাব আলী, জ্ঞান চক্রবর্তী, ইলা মিত্র, আবদুল্লা রসুল, চৌধুরী হারুন রশিদ, আবদুস সাত্তার, নগেন দে, দেবেন শিকদার, সরদার ফজলুল করিম।

এ ছাড়াও যাদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে তারা হলেন,

ওয়ালি নেওয়াজ (কিশোরগঞ্জ), রূপনারায়ন রায় (দিনাজপুর), মনসুর হাবিব, রওশন আলি, মির্জা আবদুস সামাদ, শচীন বসু, পূর্ণেন্দু দস্তিদার, নরুন্নবী, আবদুল মতিন, সুধাংশু বিমল দত্ত, নগেন সরকার, জমিয়ত আলী, আবদুল হক, অভয় বর্মন, সর্দার আবদুল হালিম প্রমুখ।

---

১. সাঈদ উর রহমান, পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ পর্বে প্রধান মার্কসবাদী নেতৃত্ব

মনিসিংহ, খোকা রায়, মোহাম্মদ ফরহাদ, আবদুস সালাম (বোরীনদত্ত), আবদুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবুল বাশার, নির্মল সেন, আবদুল মতিন, আলাউদ্দিন আহমেদ, বদরুদ্দীন উমর, অমল সেন, নগেন সরকার, রতন সেন, শান্তি সেন, রাশেদ খান মেনন, মোজাফফর আহমেদ, দেবেন শিকদার, আসদার আলী, ইয়াকুব আলী, সাঈফউদ্দাহার, সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, হায়দার আকবর খান রনো, মনজুরুল আহসান খান, টিপু বিশ্বাস, সিরাজ শিকদার, বিমল বিশ্বাস, জসিমউদ্দিন মণ্ডল, খালেকুজ্জামান ভূঁইয়া, নজরুল ইসলাম, আ ,ক,ম, মাহবুবুল হক, শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, মবিনুল হায়দার চৌধুরী, মোজাফফর আহমদ, চৌধুরী হারুনর রশীদ, আনু মোহাম্মদ, মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম, অজয় রায়, সাইফুল হক, জিয়াউদ্দিন, হাসানুল হক ইনু, শরীফ নুরুল আম্বিয়া, সিদ্দিকুর রহমান, মঈন-উদ্দিন খান বাদল, আনোয়ার কবীর, নুরুন্নবী, নাঈম জাহাঙ্গীর, কাশেদ আলী, আইয়ুব রেজা চৌধুরী, দাউদ হোসেন, প্রতাপউদ্দিন, খালিদ হোসেন, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, আলতাফ হোসেন দিলীপ বড়ুয়া প্রমুখ।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪ বাংলাদেশে মার্কসীয় সাহিত্যের বিকাশ

১৯৪৭ পরবর্তীকালে সাময়িক পত্র-পত্রিকায় পাকিস্তান-পন্থীদের মার্কসবাদ বিরোধিতা

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর পাকিস্তানপন্থীরা মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল। তারা মার্কসবাদকে তাদের প্রধান শত্রু ভেবে প্রতিনিয়ত মার্কসবাদের বিরুদ্ধে আক্রমন চালাতো। এই মার্কসবাদ বিরোধি পাকিস্তানপন্থীরা প্রধানত ইসলামকে মার্কসবাদের মুখোমুখি দাঁড় করাতো। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ বলেন, "তাঁরা বরাবর ইসলামি সমাজব্যবস্থার কথা বলেছেন, জয়গান গেয়েছেন ইসলামি সাম্যের, এবং প্রচণ্ড ভয় করেছেন সমাজতন্ত্রকে। তাঁদের প্রবন্ধে এমন একটা অন্ধ বিশ্বাসের প্রকাশ দেখা যায় যে সমাজতন্ত্রই ইসলামের প্রধান শত্রু এবং তাঁদের পবিত্র পাকিস্তানি দায়িত্ব এই সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী দানবকে প্রতিহত করা।"[১] এ সময়কালে যারা মার্কসবাদ ও ইসলামকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন তেমন কয়েকটি প্রবন্ধের নামোল্লেখ করা হলো :-

গোলাম মোস্তফার "মার্ক্সীজম কি বাঁচিয়া আছে ? (নওবাহার ১৩৫৬, ১:১), গোলাম মোস্তফার 'ইসলাম ও কমিউনিজম' (পুস্তিকা), জহুরুল ইসলাম লিখেছেন 'ইসলাম ও সমাজতন্ত্রবাদ' (সওগাত, ১৩৫৪, ২৯:৬), মোহাম্মদ আবদুর রহীমের 'মার্কসবাদ ও ইসলাম' (মোহাম্মদী, ১৩৫৮, ২৩:৪), মোহাম্মদ গোলাম রসুল 'ইসলাম ও কম্যুনিজম' (মোহাম্মদী, ১৩৫৬, ২১:৭), জমীরউদ্দিন আহমদ 'পাকিস্তান ও কমিউনিজম' (নওবাহার, ১৩৫৬, ১:৬), এছাড়াও আবুল কাশেম আজাদ এবং মোবারক আলী আখন্দ এই এক ধারায় লিখেছেন। এই সময়কালে সাময়িক পত্র-পত্রিকা 'মোহাম্মদী', 'মাহেনও', 'সওগাত', 'কাফেলা', 'নওবাহার', 'দিলরুবা', 'ইমরোজ' - এসকল সাময়িকীতে মার্কসবাদের পক্ষে বিপক্ষে বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

---

১. হুমায়ুন আজাদ, ভাষা আন্দোলন, সাহিত্যিক পটভূমি, গ্রন্থমালা ৫, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

মার্কসবাদী সাহিত্য বিকাশ

তিরিশের দশকে বাংলাদেশে মার্কসীয় রচনাবলীর পঠন পাঠন কিছুটা শুরু হয় এবং মার্কসীয় রচনাবলী অল্প বিস্তর প্রচার ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সোভিয়েট ইউনিয়ন ও বৃটেন একই 'মিত্রশক্তি' ভুক্ত হবার কারণে তৎকালীন বৃটিশ ভারতে মার্কসীয় রচনাবলী প্রকাশ্যভাবে প্রচারের সুযোগ ঘটে। তবে এক্ষেত্রে সমাজের স্বল্প সংখ্যক শিক্ষিতদের মধ্যে মার্কসবাদ চর্চা ও পঠন-পাঠন সীমাবদ্ধ ছিল। তাছাড়া এ সময়কালে মার্কসীয় রচনাবলীর তেমন একটা বাংলা অনুবাদ হয়নি, তাই মার্কসবাদ পাঠের মাধ্যম ছিল ইংরেজী। কিছু কিছু বাংলা অনুবাদকর্ম তখন সবেমাত্র শুরু হয়েছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশে মার্কসবাদ চর্চা নানাবিধ কারণে সংকটে পড়ে।

১৯৬৩-৬৪ সালের দিকে বাংলাদেশে প্রকাশ্যে ব্যাপক মার্কসীয় বইপত্রের আমদানী ঘটে। এই সময়ে চীন থেকে মাওসেতুঙের রচনাবলী আসতে থাকে এবং ১৯৬৭-১৯৬৯-এর দিকে তার বাংলা অনুবাদ হতে থাকে। ১৯৭১ এর স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশ ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে সুসম্পর্কের কারণে ব্যাপক হারে মস্কোর 'প্রগতি প্রকাশনা' থেকে মার্কসবাদ সংক্রান্ত বাংলা অনুদিত ও ইংরেজী বইয়ের ব্যাপকহারে আমদানী ঘটে। এবং মার্কসের লেনিনের রচনাবলী ব্যাপক প্রচার ঘটে, ফলে বাংলাদেশে ব্যাপক মার্কসবাদী চিন্তার প্রসার ঘটে। এ ছাড়াও মার্কসীয় চিন্তা বিকাশে বাংলাদেশের মার্কসবাদী দলের দলীয় মুখপত্র বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৩৬ সালে বাংলায় কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র ছিল পাক্ষিক 'কমিউনিষ্ট' ও ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র ছিল 'মার্কসপন্থী'। ১৯৫২ সালের দিকে কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্রের নাম ছিল 'শিখা'। ষাটের দশকে বাংলাদেশে মার্কসীয় মতাদর্শগত প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এই 'শিখা' পত্রিকা এবং পরবর্তীকালে 'গণশক্তি'। এছাড়াও ষাটের দশকে যে সকল মার্কসবাদী বইপত্র মার্কসবাদী চিন্তা প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল সে সব হলো অনিল মুখার্জির 'সাম্যবাদের ভূমিকা', 'হাতে খড়ি', অমিত সেনের 'ইতিহাসের ধারা',

Dhaka University Institutional Repository

'দর্শনের ইতিবৃত্ত' (লেখকের নাম জানা যায়নি), দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'যে গল্পের শেষ নেই', নিহাররঞ্জন সরকারের, 'ছোটদের অর্থনীতি', ছোটদের রাজনীতি', রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ', রেবতী বর্মনের 'সমাজ সভ্যতার ক্রমবিকাশ'- এসকল বই-পুস্তক মার্কসবাদের প্রাথমিক পরিচিতি গ্রহণের জন্যে বেশ প্রচলিত ছিল। এর পাশাপাশি স্ট্যালিনের 'দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ', এমিলবার্ণসের 'মার্কসবাদ' ইত্যাদি বইপত্রের বেশ চল ছিল।

ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রণনীতি নিয়ে কমিউনিস্টদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়। ১৯৬৪ সালে মনিসিংহ 'জাতীয় গণতান্ত্রিক রণনীতি' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। মনি সিংহের এ রচনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দেয়। এবং এই 'জাতীয় গণতান্ত্রিক রণনীতি'-র বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে খালেদ-বশির ছদ্মনামে যথাক্রমে সুখেন্দু দস্তিদার ও মোহাম্মদ তোয়াহা ১৯৬৫ সালে রচনা করেন 'বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের দুই নীতি', এবং পরবর্তীতে রহমত ছদ্মনামে আবদুল হক এর সাথে যুক্ত হন। মনিসিংহ এবং সুখেন্দু দস্তিদার ও মোহাম্মদ তোয়াহার এ দু'টি রচনা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই বিতর্ক পরবর্তী কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া আব্দুল হকের 'ইতিহাসের রায় সমাজতন্ত্র', ও 'পূর্ব বাংলা আধা সামন্তবাদ নয়া উপনিবেশ' গ্রন্থ দু'টি উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে অসংখ্য মার্কসবাদী ধারার রচনা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের সমাজ অর্থনীতি, রাজনীতির মার্কসীয় দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষণধর্মী রচনার সংখ্যা প্রচুর। যার তালিকা প্রদান করা কঠিন কাজ।[১] বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটি মার্কসবাদী ধারা বিদ্যমান। মার্কসবাদী ধারার বুদ্ধিজীবীদের তালিকা দীর্ঘ হবে।

---

১. বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন নিয়ে রচনা সমূহের উপর পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চাশ থেকে নব্বই এর দশকে বাংলাদেশে মার্কসবাদী সাহিত্য ধারা

বাংলাদেশে শ্রেণী সংগ্রামের ধারার অনুসারী একটি সাহিত্য ধারা রয়েছে । শ্রেণী সংগ্রামের এই ধারার কবিরা কবিতার আঙ্গিক দিকের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের চাইতে অধিকতর বিষয়বস্তু নির্ভর ছিলেন । এ প্রসংগে অধ্যাপক সাঈদ উর রহমান বলেন," তৃতীয় ধারার কবিরা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অনুসারী হিসেবে কাব্য চর্চা করেছেন । সমাজ বিকাশের মার্কসবাদী ব্যাখ্যায় তারা বিশ্বাসী । সাহিত্যকে তারা সমাজ সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করেন এবং সেজন্য বক্তব্য তুলে ধরেন সরাসরিভাবে । কবিতার রূপ ও রসের চেয়ে বক্তব্যের প্রতি এদের ঝোক অধিকতর । উপলব্ধির আন্তরিকতা ও বক্তব্যের আন্তরিকতা এই শ্রেণীর কবিতার বৈশিষ্ট্য । এদের আদর্শ সুকান্ত ভট্টাচার্য ।"[১] উল্লেখিত সময়কালে বাংলাদেশে শ্রেণী সংগ্রামের ধারার কবিরা হলেন জুলফিকারের কাব্যগ্রন্থ ' নতুন পৃথিবী ' (১৩৫৬), ' স্বাধীনতা' (১৯৫১), জুলকার নায়েন - 'মরণ মিছিল' (১৯৬৭), আজিজুল হাকিম এর কবিতা ' বুর্জোয়া নির্বাচন', ' বিদগ্ধ দিনের প্রান্তর', আলাউদ্দিন আল আজাদ ' মানচিত্র' (১৯৩২), হোসনে আরা, ' মিছিল' (১৯৬৪), এছাড়াও নেহাল আদিল, ফারুক আলমগীর প্রমুখ । ১৯৬৪-৬৫ সালের অন্যতম কবিতা ও কবি হলো - ' রক্তের কারুকাজ' 'আজকের কবিতা' ' আমরা', গণতান্ত্র -'হাতিয়ার তুলে নাও' । অমিত সম্ভবনাময় কবি হুমায়ুন কবিরের ' কসুমিত ইস্পাত' ' রক্তের ধণ', ফরহাদ মজহারের ' দাড় করিয়ে দিয়েছ আমাকে তুমি বিপ্লবের সামনে', ' অকস্মাৎ ' রপ্তানী মুখী নারী মেশিন', 'রক্ত', 'খোকন ও তার প্রতি পুরুষ', মোহাম্মদ রফিক, ইন্দুসাহা, নির্মলেন্দুগুন, মহাদেব সাহা, অসীম সাহা, মোহন রায়হান, মুহাম্মদ সামাদ, ইশতেকবাল হোসেন প্রমুখ শ্রেণী সংগ্রামের ধারার কবি হিসেবে উল্লেখযোগ্য ।

---

১. সাঈদ উর রহমান, পূর্ব বাংলার রাজনীতি - সংস্কৃতি ও কবিতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩, পৃ. ৩০৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতার পাশাপাশি সমালোচনামূলক সাহিত্যের মার্কসবাদী ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যিক আহমদ শরীফ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবুল কাশেম ফজলুল হক, হাসান আজিজুল হক, সাঈদ উর রহমান, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের নাটকেও শ্রেণী সংগ্রামের ধারা লক্ষ্যণীয়। নাট্যাঙ্গনে এই ধারা বেশ শক্তিশালী। গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এ ধারার পুরোধা হলেন – মামুনর রশীদ, নাসিরুদ্দিন ইউসুফ, এস এম সোলায়মান, রামেন্দু মজুমদার, ফেরদৌসী মজুমদার, আতিকুল হক চৌধুরী, সেলিম আলদীন, মান্নান হীরা, জামিল আহমেদ, কামালউদ্দিন নীলু প্রমুখ।

বাংলাদেশের সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটি শ্রেণী সংগ্রামের ধারা রয়েছে। এ ধারা প্রবর্তন হলেন নির্মলেন্দু চৌধুরী, সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, ভূপেন হাজারিকা[3] ও অজিত পাণ্ডে। বাংলাদেশে বিভিন্ন গণসঙ্গীত দলের মধ্যে এ ধারার পরিচয় মেলে।

বাংলাদেশে মার্কসবাদী রাজনীতির পাশাপাশি মার্কসীয় দর্শন নিয়ে যে সকল চর্চা হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়ে সে বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চা

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

৪. বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চা

বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চার এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এ ক্ষেত্রে মার্কসবাদী রাজনৈতিক দলগুলি মার্কসীয় দর্শন চর্চায় বৃহৎ ভূমিকা গ্রহণ করতে না পারলেও সমাজের সচেতন বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে মার্কসীয় দর্শন চর্চার একটি ধারা বিরাজমান। বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চাকারীদের অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষিত-বুদ্ধিজীবী। যাদের অধিকাংশই পেশায় শিক্ষকতার সাথে জড়িত, তবে এ ক্ষেত্রে কিছু মার্কসবাদী রাজনীতিকও রয়েছেন যারা মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে ভেবেছেন, লিখেছেন।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মার্কসবাদী রচনাই সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি সংশ্লিষ্ট। বাংলাদেশের মূর্তনির্দিষ্ট বাস্তবতায় মার্কসবাদীদের করণীয়, আন্দোলনের কৌশল, রণনীতি, সমাজ অর্থনীতির বিশ্লেষণ এবং দফাদাবী প্রণয়ন করা নিয়ে। বাংলাদেশে মার্কসবাদ চর্চার মূল প্রবনতা মেঠো স্লোগান সর্বস্ব। এর মধ্যে চিন্তাশীল ধারার দুর্বলতা লক্ষণীয়।

বাংলাদেশে মার্কসের দর্শন নিয়ে চর্চা হয়েছে কম। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশে মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নিয়ে যে সকল লেখালেখি ও চর্চা হয়েছে এবং যে সকল ব্যক্তি মার্কসীয় দর্শন চর্চায় ভূমিকা রেখেছেন তা তুলে ধরার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সমালোচনা তুলে ধরা হলো।

আবু মাহমুদ

আবু মাহমুদ বাংলাদেশে মার্কসবাদী পণ্ডিত হিসেবে সুপরিচিত। ষাটের দশক থেকে এদেশের কমিউনিষ্ট ধারার সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বাংলাদেশে মার্কসীয় চিন্তার বিস্তারের ক্ষেত্রে পথিকৃত। আবু মাহমুদ পঞ্চাশের দশক থেকেই তার গবেষণাধর্মী রচনায় হাত দেন

Dhaka University Institutional Repository

এবং আশির দশকে তার অধিকাংশ রচনা প্রকাশিত হয় । তার প্রধান রচনাগুলি হল :-

(ক) 'মার্কসীয় বিশ্ব বীক্ষা', (বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫) ।

(খ) 'পুঁজিবাদের পুঁজি ও তৃতীয় বিশ্ব' (১৯৮৫) ।

(গ) 'উন্নয়ন উচ্ছাস ও তৃতীয় বিশ্ব' (১৯৮৫) ।

এছাড়াও বিভিন্ন জার্ণাল ও পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ডঃ মাহমুদ তার 'মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা'য় মার্কসীয় দর্শন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর বিশাল পাণ্ডিত্য নিয়ে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন উত্তর মার্কস বিশারদদের কর্তৃক উত্থাপিত প্রসঙ্গ সমূহের জবাব দিয়ে চিরায়ত মার্কসবাদকে রক্ষা করতে চেয়েছেন । ডঃ মাহমুদ একটি বিশ্বকৌশিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নব্য মার্কসবাদী ও মার্কসবাদের বুর্জোয়া সমালোচকদের নাকচ করেছেন ।

নব্য মার্কসবাদীদের বিরোধিতা

নব্য মার্কসবাদী ও বুর্জোয়া বিশ্বের মার্কস চর্চার বিচারমূলক সমালোচনা তুলে ধরে তিনি নিজস্ব মতামত দেন । নব্য মার্কসবাদীদের সমালোচনায় তিনি মনে করেন হরখ্যান, লুকাস, কর্শ, গ্রামসি, মার্কুজ, এস্থিথ, সার্ত্র, আলেনারি, কোলকোওস্কি, গেট্টাভিক ও আলথুসার " মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে নিজেদের ভ্রান্ত ধারণা ব্যক্ত করতে ব্যর্থ হয়ে এরা সকলেই সন্তোষজনক নয় এমন অনেক দ্বৈতবাদী ও ভাববাদী তত্ত্বের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে । এসব তত্ত্ব অযৌক্তিক বা ইচ্ছা সাপেক্ষবাদী রাজনীতি চর্চার উদ্ভব ঘটিয়েছে ।[১]

---

১. ডঃ আবু মাহমুদ, মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা, প্রথম খণ্ড, প্রথম ভাগ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৫৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

মার্কসীয় দর্শন প্রসংগে

ডঃ আবু মাহমুদ মনে করেন মার্কসবাদ বিশদ অর্থে দর্শন নয়। যারা একে দর্শন হিসেবে বিবেচনা করেছেন তারা কোন্ দর্শনের সাথে মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কযুক্ত সঙ্গতিপূর্ণ, কোন্ দর্শন থেকে উদ্ভূত এ অর্থে দেখেছেন। তিনি মনে করে ধ্রুপদী অর্থে মার্কসীয় দর্শন বলে কিছু নেই। বিচ্ছিন্ন ভাবে কোন ধারণার ফল পাওয়া যায় না-হেগেলীয় এই বোধ থেকে মার্কস গবেষণার একটি স্বতন্ত্র এলাকা হিসেবে দর্শন চর্চা করেন নি। তিনি মনে করেন বিপ্লব দর্শনকে ধ্বংস করবে। মানুষকে বাস্তব জগতে ফিরিয়ে আনবে। এক শতাব্দীর সামাজিক পরিবর্তনে তত্ত্ব ও প্রয়োগ থেকে উদ্ভূত সমস্যা মার্কসবাদকে মার্কসের মৃত্যুর পরবর্তীতে একটি দর্শনে পরিণত করেছে। তিনি মনে করেন মার্কস মূলত দার্শনিক ছিলেন না।[১]

মার্কসবাদের তিনটি দিকের একটি দিক হিসেবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ স্বীকৃত। মার্কস দার্শনিক ছিলেন না, আবু মাহমুদের এ বক্তব্য বিতর্কিত। অনেক মার্কসবাদী মার্কসকে প্রধানত দার্শনিক মনে করেন। আবু মাহমুদের এভাবে দেখার মধ্যে একটি অর্থনীতিবাদী সংকীর্ণতা রয়েছে বলে মনে হয়। যদি আমরা দর্শনকে ব্যাপক অর্থে বুঝি তা হলে দর্শন কেবল দার্শনিক শিরোনাম দিয়ে কোন গ্রন্থ রচনা নয়। মার্কসের অর্থনীতি ও সমাজতন্ত্র সংক্রান্ত রচনায় দার্শনিক দ্যোতনার এক অসাধারণ স্ফুরণ মেলে। যদিও মার্কস পৃথক ভাবে কেবলমাত্র দর্শন হিসেবে কোন রচনা লিখেননি। তাঁর বিভিন্ন লেখায় তা ছড়িয়ে ছিল। তাছাড়া মার্কসবাদ বলতে মার্কস এঙ্গেলস এর যৌথ চিন্তাকেই বুঝা হয়। আবু মাহমুদের ভাবনার মধ্যে মার্কস থেকে এঙ্গেলসকে পৃথকভাবে ভাবার পরোক্ষ আভাস

---

১. আবু মাহমুদ, মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা- বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, প্রথম খণ্ড, প্রথম ভাগ, সপ্তম পরিচ্ছেদ-এর পৃ. ৬৮,৬৯, ৭৭, ৭৮, ৬৫, ৬৬ দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায় । আবু মাহমুদ মনে করেন ধ্রুপদী অর্থে মার্কসবাদ দর্শন নয় । ধ্রুপদী অর্থে দর্শন বলতে কি বোঝায় তা তিনি ব্যাখ্যা করেন নি । দর্শনের কোন ধ্রুপদী সংজ্ঞা নেই । বরং বলা যায় বিচারমূলক চিন্তাই ধ্রুপদী অর্থে দর্শন । সেদিক থেকে মত পার্থক্য সত্ত্বেও মার্কসের দার্শনিক চিন্তা ধ্রুপদী অর্থে দর্শন ।

মানুষ ও ইতিহাস সম্পর্কিত ধারণায় বিষয়ীগততা

ডঃ আবু মাহমুদ মার্কসের মানবতত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । এ-সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি বলেন "মার্কস তত্ত্ববিজ্ঞান নিয়ে গভীরভাবে চিন্তিত ছিলেন কেননা 'সমাজে মানুষই হচ্ছে সব কিছুর মাপকাঠি' এই গ্রীক নীতি বাক্যটিকে তিনি নিজের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন ।"[১] এ ব্যাখ্যা যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় । মার্কস মানবীয় উন্নতির লক্ষ্য হিসেবে মানুষকে দেখেছেন কিন্তু সব কিছুর মাপকাঠি হিসেবে দেখেন নি । সব কিছুর লক্ষ্য হিসেবে দেখা আর সবকিছুর মাপকাঠি হিসেবে দেখা এক কথা নয় । আবু মাহমুদ মানুষকে সব কিছুর মাপকাঠি হিসেবে দেখে একটা চরম বিষয়ীগততার (Subjectivism) পরিচয় দিয়েছেন । কিন্তু মার্কসের দেখার প্রধান দৃষ্টিভংগী ছিল বিষয়ুগত (Objective) । আবু মাহমুদ তার আলোচনার এক স্থানে বলেছেন যে, "... গ্রীক জ্ঞানতত্ত্বের বদলে জ্ঞানের ব্যাখ্যায় মার্কসের প্রয়োজন ছিল মনস্তত্ত্ব । এ কারণেই মার্কস গ্রহণ করেছিলেন একটি মনঃ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভংগি যা এঙ্গেলসও অংশতঃ ধরতে পারেন নি । সমাজ তত্ত্বের সারবস্তু হচ্ছে মনঃ ইতিহাস... ।"[২]

---

১. আগুক্ত, প্রথম খণ্ড, প্রথম ভাগ, সপ্তম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৭০ ।

২. আগুক্ত, প্রথম খণ্ড, প্রথম ভাগ, সপ্তম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৭০ ।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজতন্ত্রের সার বস্তু হচ্ছে 'মনঃ ইতিহাস'- । মার্কসের সমাজতন্ত্রের এ ব্যাখ্যা হচ্ছে হেগেলীয় । হেগেল ইতিহাসকে চিন্তা বা মনের ইতিহাস হিসেবে দেখেছেন । আবু মাহমুদ আরেক জায়গায় বলেছেন, "... মার্কসীয় ভাববাদ অনুসারে মানব প্রকৃতির আপেক্ষিক প্রগতির কোন শেষ সীমা নেই ।"[১] মানব প্রগতির শেষ সীমা নেই এ কথা মার্কসীয় বস্তুতান্ত্রিক দর্শন মনে করে । কিন্তু 'মার্কসীয় ভাববাদ' কথাটি অদ্ভুত, 'মার্কসীয় ভাববাদ' এ অভিধা ব্যবহার মার্কসীয় বস্তুবাদ বিরোধী এবং তা' এক অদ্ভুত ধরণের উদ্ভট পদের ব্যবহার ।

নৈতিকতা প্রসংগে

ডঃ আবু মাহমুদ তাঁর 'মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা'-য় মার্কসীয় নৈতিকতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । মার্কস প্রগতির অবশ্যম্ভাবিতা ভেবে স্বতন্ত্রভাবে নীতি শাস্ত্রীয় বিষয় সমূহ বাইরে রেখেছিলেন । সামাজিক পরিবর্তনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে সামাজিক নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করে মার্কস বিষয়টি আলোচনার বাইরে রেখেছিলেন বলে আবু মাহমুদ মনে করেন । এতদসত্ত্বেও মানবীয় মুক্তি ও শোষণ মুক্তির লড়াই হয়ে ওঠে মার্কসীয় নৈতিকতা বলে তিনি মনে করেন । আবু মাহমুদ মনে করেন মার্কস কার্কের উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করেছেন । তাঁর মতে "মার্কসীয় রচনায় কার্কের তত্ত্বটি বস্তুভিত্তিক রূপ নেয় ।"[২] সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থ তুলে ধরাই মার্কসীয় নৈতিকতার মূল কথা ।"[৩]

---

১. প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, প্রথম ভাগ, অষ্টম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৭৯ ।

২. প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৫৭ ।

৩. মার্কসীয় নৈতিকতার বিষয়ে ডঃ আবু মাহমুদ রচিত মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগের তৃতীয় অধ্যায়ে, তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৫৭,৫৮,১২৭, ১৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বন্দ্বতত্ত্ব ও গতানুগতিক এরিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যা

ডঃ আবু মাহমুদ তার 'মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা' গ্রন্থে এরিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যা ও দ্বান্দ্বিক যুক্তিশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি কার্ল গডেলের (Karl Godel) অসম্পূর্ণ তত্ত্ব (Theory of incom Pleteness) উল্লেখ পূর্বক দ্বান্দ্বিক যুক্তির ন্যায্যতা প্রদান করতে চেয়েছেন।

আবু মাহমুদ দ্বান্দ্বিক যুক্তিশাস্ত্র ও গতানুগতিক এরিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যা উভয়কেই প্রয়োজনীয় মনে করেন। তিনি উভয় যুক্তি প্রক্রিয়া সংরক্ষণের জন্যে তাঁর মত ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, "আমরা কি এরিস্টটলীয় যুক্তি বর্জন করবো ? না ; আইনেস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের দ্বারা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র মূল্যহীন হয়নি। আমরা এরিস্টটলীয় অথবা দ্বন্দ্বমাদী অথবা এই দুইয়ের পৃথক সংযোজনকে যথোপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করতে পারি।"[১]

আবু মাহমুদ মনে করেন শুধুমাত্র গতানুগতিক যুক্তিশাস্ত্রের উপর নির্ভর করলে আমরা প্রক্রিয়ার বিপদেই আটকে পড়বো এবং তথ্যের বাধার সম্মুখীন হবো। তার মতে এ প্রয়োজন মিটাতে পারে দ্বান্দ্বিক যুক্তি শাস্ত্র।"[২] আবু মাহমুদের দর্শন সম্পর্কিত বক্তব্য বেশ অস্পষ্ট। তাঁর অবস্থান উদ্ধার করা বেশ কঠিন। তাঁর বক্তব্য অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয় বিভ্রান্তিকর।

---

১. প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় ভাগ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৫।

২. আবু মাহমুদ রচিত মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম অধ্যায়ের পৃ. ২৩ এবং প্রথম খণ্ড, তৃতীয় ভাগ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পৃ. ১২ - ১৫ দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

গোবিন্দ চন্দ্র দেব

গোবিন্দ চন্দ্র দেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তিনি পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক নিহত হন। 'প্রাচ্যের সক্রেটিস' হিসেবে খ্যাত দেবের পাণ্ডিত্য যেমনি বিশাল তেমনি তাঁর রচনার কলেবরও বিস্তৃত। তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় ভাববাদ ও বস্তুবাদের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। গোবিন্দ চন্দ্র দেব তাঁর 'তত্ত্ববিদ্যা-সার' (১৯৬২) গ্রন্থে মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। দেবের ধারণা হলো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ জড়বাদের অতি আধুনিক ধরণ। তাঁর মতে, "... জড়বাদের অত্যন্ত প্রভাবশালী অতি আধুনিক রূপ ... ডায়েলেকটিক্যাল ম্যাটারিয়েলিজম।"[১] তাঁর মতে মার্কসীয় বস্তুবাদে হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে নিজেদের মতো করে ব্যবহার করা হয়েছে। দেব দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের কিছু সমালোচনা তুলে ধরেন। তিনি বলেন," অভিনব উৎপত্তিবাদীরা যেমন দেখিয়েছেন: প্রাণ ও মনের আদি সত্তা জড়বস্তু হলেও, প্রাণ ও মনকে একান্তভাবে জড় স্বভাব বলা চলে না, একথা যদি সত্য হয়, তা হলে জড়কে বিশ্বের আদি উপাদান বলেও চলতি জড়বাদ মানা যায় না, কারণ চলতি জড়বাদের মূল কথা জড়, প্রাণ ও চেতনার সাম্য, বৈষম্য নয়। আর এই বৈষম্য তুলে দিতে গিয়ে যদি আমরা বলি যে, জড়ের ভিতরই প্রাণ ও মন লুকিয়ে ছিলো তা হলে সে সত্তাকে আর জড় বলা যায় না, সে সত্তা একটা অজড় বস্তু যা নিষ্প্রাণ হয়েও সপ্রাণ, আর অচেতন হয়েও চেতন। যে-আধুনিক প্রাণবিদ্যা থেকে জড়বাদের প্রাথমিক প্রেরণা, সে প্রাণবিদ্যা আজ তার ওপর করছে মুদগর প্রহার।"[২]

আধুনিক পদার্থ বিদ্যার বিকাশে বস্তু ও মনের পার্থক্য কমে আসছে - এ ধারণা থেকে তিনি বস্তুবাদের ভিত্তি দুর্বল হয়ে আসছে বলে মন্তব্য করেন। তাঁর ভাষায় "...

---

১. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, গোবিন্দ চন্দ্র দেব রচনাবলী, হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত, তৃতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃ. ২৭৬।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০।

Dhaka University Institutional Repository

আজকের দিনের পদার্থবিদ্যা জড়বাদকে খানিকটা দুর্বল করে দিয়েছে। জড়কে নিশ্চল না বলে, চলমান বলায় আজকের দিনের পদার্থ বিদ্যায় জড় পদার্থ ও মনের ব্যবধান খানিকটা দূর হয়ে গেছে। এর ফলে মনের যেমন জড়ের রূপানুর সহজসাধ্য তেমনি জড়েরও মনে রূপানুর সহজসাধ্য। এক কথায় তার্কিক দৃষ্টিকোন থেকে জড়বাদের ভিত্তি উনিশ শতকে যতোটা দৃঢ় ছিল, আজ আর তেমন নেই।"[১]

গোবিন্দ চন্দ্র দেব দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন, "দর্শন যে শুধু থিওরী নয়, দর্শন যে জীবন যাত্রার এক সুনিপুন সার্থক পদ্ধতি এই বৈজ্ঞানিক দর্শন-বিচক্ষার যুগে দ্বান্দ্বিক জড়বাদীরা এ ধারণা যেভাবে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন তার তুলনা ইতিহাসে বিরল।"[২] দেব বস্তুবাদকে চরম অভিজ্ঞতাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর ভাষায়," Dialectical Materialism is a specimen of extreme empiricism with a materialist basis."[৩]

দেব বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে প্রকৃত অর্থে কোন বিরোধ নেই, যে বিতর্ক রয়েছে তা হলো কেতাবী বিতর্ক। তাই দেব বলেন, "My personal cognitions apart, I can say there is no real conflict between so-called materialism and spiritualism. The controversy seems to me merely bookish and it has nothing much corresponding to it in actual life."[৪]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮, ২৭৯।

৩. Govinda Chandra Dev, Idealism: A New Defence and a New Application, Dhaka University, Dhaka, 1958, p. 55.

৪. Govinda Chandra Dev. Aspiration of the common Man, The University of Dhaka, 1963, p. 71.

Dhaka University Institutional Repository

দেব তার সমন্বয় বাদ সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন, " সমন্বয়-দর্শনই হবে আগামী দিনের মানুষের জীবন দর্শন। তত্ত্ব নির্ণয়ে তার এক সার্থক পদক্ষেপ। আমাদের পরিবেশের তাগিদে এ-দুটি আপাত বিরোধী জীবন দর্শন পরস্পরের উপর যে প্রভাব বিস্তার করছে, তারই সার্থক পরিণতি হবে এই সমঝোতা ও সমন্বয়।"[১] গোবিন্দ চন্দ্র দেব তাঁর সমন্বয়বাদী দৃষ্টিকোন থেকেই মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রয়াস ছিল বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করা। কিন্তু সমন্বয়বাদ এক ধরণের দ্বৈতবাদ। কেননা বস্তু ও চৈতন্য এই দ্বৈততাকে পৃথক পৃথক সত্তা হিসেবে ভাবলেই কেবল সমন্বয়ের প্রশ্ন আসতে পারে।

বদরুদ্দীন উমর

বাংলাদেশে মার্কসীয় চিন্তাবিদদের মধ্যে বদরুদ্দীন উমর অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ও রাজনীতি বিষয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। তিনি বর্তমানে মার্কসবাদী সাময়িকী 'সংস্কৃতি' পত্রিকার সম্পাদক এবং সক্রিয় রাজনীতিক। তাঁর অধিকাংশ রচনাই রাজনীতি, সমাজ-অর্থনীতি ও ইতিহাস সংশ্লিষ্ট। বদরুদ্দীন উমরের প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: 'বাংলাদেশে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সমস্যা', (১৯৭৫), 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, (তিন খণ্ড, ১৯৮২) 'যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ' (১৯৭৬) ;'পূর্ব বাঙ্গার ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসংগ' (১৯৮২),' যুদ্ধোত্তর বাঙ্গাদেশ' (১৯৭৫), 'মার্কসীয় দর্শন ও সংস্কৃতি', (১৯৮৬),' বঙ্গভংগ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি' (১৯৮৭),' সাম্প্রদায়িকতা' (১৯৬৬),' সংস্কৃতির সংকট' (১৯৬৭),'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলাদেশের কৃষক' (১৯৭২),' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ' (১৯৭৪),' বাংলাদেশে মার্কসবাদ' (১৯৮১)। এছাড়া জার্ণাল ও পত্র-পত্রিকায় তাঁর

---

১. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, গোবিন্দ চন্দ্র দেব রচনাবলী, পৃ. ২৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। বদরুদ্দীন উমর ধ্রুপদী মার্কসবাদী। তিনি নব্য মার্কস-বাদী ধারার বিরোধী। উমর মার্কসবাদকে বিজ্ঞান হিসেবে দেখেন। তিনি মার্কসবাদের বিষয়গততার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। হেগেল উত্তর দার্শনিক ধারার মধ্যে একমাত্র কলপ্রসূ ধারা হিসেবে তিনি মার্কসীয় দর্শনকে দেখেছেন। তাঁর মতে, "হেগেলীয় দার্শনিক স্কুলের তাত্ত্বিকদের মধ্যে দিয়ে যে একটিমাত্র কলপ্রসূ দার্শনিক মতাদর্শ বিকাশ লাভ করেছিল- যা সাধারণভাবে মার্কসবাদ নামে পরিচিত।"[১]

বদরুদ্দীন উমর মার্কসবাদের বিষয়গততাকে প্রধান করে দেখেছেন। তাঁর কথায় "মানুষের ইচ্ছা, তার উদ্দেশ্যমূলক কর্ম ও চিন্তাধারা সামাজিক বিকাশের ওপর প্রভাব বিস্তার করলেও এই 'ইচ্ছা অনিচ্ছা' উদ্দেশ্য ও চিন্তাধারা কোন নিয়ম বহির্ভূত স্বাধীন ব্যাপার নয়।"[২] তাঁর এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি ইতিহাসে মানবিক ক্রিয়ার ভূমিকা ও স্বাধীনতাকে অনেকটা অস্বীকার করেছেন। তাই তাঁর মধ্যে এক ধরণের নির্ধারণবাদী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

বদরুদ্দীন উমর মার্কসীয় দর্শন নিয়ে লিখেছেন কম। 'সংস্কৃতি' পত্রিকায় "মার্ক-সীয় দর্শন" নামে একটি লেখা যা পরবর্তীতে কলকাতা থেকে 'মার্কসীয় দর্শন ও সংস্কৃতি' নামক গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর মার্কসীয় দর্শন নিয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা। এছাড়াও বিভিন্ন সময় বিক্ষিপ্তভাবে দর্শন নিয়ে লিখেছেন। মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্ব নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে সামাজিক প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন জ্ঞান হচ্ছে মধ্যযুগীয় প-ণ্ডিতী ও খামখেয়ালী দার্শনিক কল্পনা। তিনি জ্ঞানের যথার্থতা নির্ণয়ে জ্ঞানের সামাজিক অনুশীলনের কথা বলেছেন। বদরুদ্দীন উমর মার্কসীয় দর্শনকে যথার্থভাবে তুলে ধরার পাশাপাশি তিনি এ দর্শনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের সমাজ অর্থনীতি ও রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী গবেষণাধর্মী লেখালেখি করেছেন।

---

১. বদরুদ্দীন উমর, মার্কসীয় দর্শন ও সংস্কৃতি, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৯।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বাংলাদেশে মার্কসীয় ভাবধারাকে সহজবোধ্যভাবে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক। মার্কসীয় চিন্তার আলোকে তিনি বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, নৈতিক সমস্যা ও সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী লেখার বৈশিষ্ট হল তাঁর রচনা সহজ সরল এবং সাধারণের বোধগম্য। তাঁর লেখার লক্ষ্য সম্ভবত সাধারণ মানুষ বলেই তিনিতত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করেন না। তাঁর লেখায় বুদ্ধিদীপ্ততার সাথে হৃদয়ানুভূতির একটা স্পর্শ লেগে থাকে। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় তিরিশ। এছাড়া পত্র-পত্রিকায় তার প্রচুর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি শ্রেণী সংগ্রামে আস্থাবান, শ্রেণী বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার, তাঁর অধিকাংশ লেখায় এ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মনে করেন, "... প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে ও করবে একটি শক্তিই, সে হচ্ছে মানুষে মানুষে বৈষম্য। শ্রেণী সত্য ছাপিয়ে উঠতে চাইবে অন্য সকল সত্যকে।"[১] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর 'অনতিক্রম্য বৃত্ত' গ্রন্থে "দার্শনিক দারিদ্র" নামক প্রবন্ধে দর্শন নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। পরোক্ষভাবে তিনি মার্কসীয় দর্শন নিয়ে কথা বলতে চেয়েছেন। তাঁর মতে "বাস্তবতার উপর ভিত্তি করেই অবস্থান দর্শনের।"[২] দর্শনকে তিনি সামাজিক সত্তা থেকে উৎসজাত চৈতন্য হিসেবে দেখছেন। তার মতে দর্শন জীবনেরই ব্যাখ্যা, জীবনের বাইরে নয় দর্শন।

বাংলাদেশে দর্শন চর্চাকে তিনি বিজ্ঞান ও বাস্তবতা বর্জিত 'কমল' হিসেবে চিহ্নিত করে দর্শন বিরোধী মনে করেন। তার মতে বাংলাদেশে দর্শন চর্চায় প্রাচুর্যবান 'কমল',

---

১. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আশির দশকে বাংলাদেশ, ভাষা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১০।

২. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অনতিক্রম্য বৃত্ত, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ২২।

Dhaka University Institutional Repository

অলস জীবনের ও চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে, যারা দর্শন চর্চা করেন তাঁদের শ্রেণী চরিত্রই দর্শনে প্রতিফলিত হয়েছে । সেই শ্রেণীর আলস্য ও পরিবর্তন ভীরুতাই বড় হয়ে উঠেছে দর্শনে । সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী দর্শনকে শ্রেণীর দর্শন হিসেবে দেখেছেন । বাংলাদেশে চর্চিত দর্শন মানুষের বস্তুগত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন বলে সমালোচনা করেছেন ।[১] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মার্কসীয় দর্শন নিয়ে পরোক্ষভাবে কথা বলেছেন । একেত্রে তাঁর অবস্থান অনেকটা অস্পষ্ট । তাঁর অধিকাংশ রচনাই সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতি নিয়েই । এসব রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট ।

আবদুল মতীন

ডঃ আবদুল মতীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক । বাংলাদেশে যারা মার্কসীয় দর্শন নিয়ে লিখেছেন তাদের থেকে আবদুল মতিনের পার্থক্য হল তিনি যথার্থ দার্শনিক, যৌক্তিক দিক থেকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নিয়ে আলোচনা সমালোচনা করেছেন। বাংলাদেশে গতানুগতিক যুক্তিবিদ্যার সাথে দ্বান্দ্বিক যুক্তিবিদ্যার সম্পর্ক, বিরোধ এবং দ্বান্দ্বিক যুক্তিবিদ্যার যথার্থতা নিয়ে তেমন কোন গভীর আলোচনা হয়নি । এ বিষয়ে আবদুল মতীন "মার্কসবাদ ও দ্বান্দ্বিক যুক্তিবিদ্যা" শীর্ষক এক প্রবন্ধে এ বিষয়ক গভীর দার্শনিক ও যৌক্তিক আলোচনা তুলে ধরেন ।

আবদুল মতীন মনে করেন দ্বান্দ্বিক যুক্তিবিদ্যা বলে কোন স্বতন্ত্র যুক্তিশাস্ত্র নেই । এবং এর সাথে গতানুগতিক এরিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যার কোন বিরোধ নেই । তাঁর মতে, "এর[দ্বান্দ্বিক যুক্তি প্রক্রিয়া] ভেতরে মূল্যবান মর্মবস্তু থাকা সত্ত্বেও আমার ধারণা জন্মেছে যে, সঠিক অর্থে এ কোন যুক্তিবিদ্যা নয়, একে যুক্তিবিদ্যা বলে দাবী করা কিংবা গতানুগতিক যুক্তিবিদ্যার সংগে এর বিরোধ দেখানো এক ধরণের ভাব-বিশৃংখলা মাত্র।"[২]

---

১. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অনতিপ্রসন্ন বৃত্ত, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৭, গ্রন্থের পৃষ্ঠা-২০, ২২ দ্রষ্টব্য ।

২. আবদুল মতীন, "মার্কসবাদ ও দ্বান্দ্বিক যুক্তিবিদ্যা" মানব বিদ্যা বক্তৃতা, উচ্চতর মানব বিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৪৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল মতীন মনে করেন চিন্তার তিনটি মৌল নীতির(Laws of thought) এরিস্টটলীয় 'বিরুদ্ধতার নিয়ম'(Law of contradiction)কে চিন্তার শৃংখলার দিক থেকে নাকচ করা সম্ভব নয়। বিরুদ্ধতার নিয়ম আকারগত যুক্তিবিদ্যার মূল ভিত্তি হওয়ার কারণে যে সকল মার্কসবাদী বিরুদ্ধতার নিয়মকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বর্জন করেন তিনি তাদের সমালোচনা করেন।

আবদুল মতীন আকারগত যুক্তিবিদ্যাকে বর্জন না করেও গতি ও পরিবর্তন ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব কিনা, বিরুদ্ধতার নিয়মকে স্বীকার করে বাস্তব জগতের আপাত বিরোধপূর্ণ ব্যাপারগুলোকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এ প্রসংগে তিনি পোলিশ দার্শনিক এডাম শ্যাফ (Adam Schaff) এর দৃষ্টিভংগী তুলে ধরেন এবং সমর্থন করেন। আবদুল মতীন মনে করেন যে, মার্কসবাদীরা 'Opposite','Contradiction', 'struggle' এবং 'Unity', শব্দগুলির মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। বিরুদ্ধতা (Contradiction) মূলতঃ একটি যৌক্তিক ধারণা: কোন বচনের নিষেধক বচন একই সাথে সত্য হতে পারেনা। মার্কসবাদীরা পরস্পর বিরোধীতা(Opposition) এবং বিরুদ্ধতা(Contradiction) এ দু'টি ধারণার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন বলে তাঁর ধারণা। যুক্তিবিদ্যা ও বস্তুতত্ত্বের সামঞ্জস্য বিধানে এডাম শ্যাফ 'যৌক্তিক' বিরুদ্ধতা ও 'দ্বান্দ্বিক' বিরুদ্ধতা('Logical' and 'Dialectical' Contradiction) এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য করে মনে করেন বাস্তব জগতের বিরোধ স্বীকার করলে তাতে আকারগত যুক্তিবিদ্যার অপর্যাপ্ততা প্রমানিত হয়না। আবদুল মতীন এডাম শ্যাফের এ মতের সমর্থক, এবং তিনি মনে করেন যে আকারগত যুক্তিবিদ্যার সাথে দ্বান্দ্বিক যুক্তির কোন বিরোধ নেই।

আবদুল মতীন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বিভিন্ন সূত্রগুলো নিয়ে আলোচনায় কিছু প্রশ্ন তোলেন। পরিমানগত পরিবর্তন থেকে গুনগত পরিবর্তন নিয়মের সমালোচনায় তিনি বলেন, "এ নিয়মের দৃষ্টান্ত হিসেবে যে সব ব্যাপার উল্লেখ করা হয় সেগুলি সমজাতীয় নয়।

Dhaka University Institutional Repository

সেগুলোর যৌক্তিক কাঠামোতে প্রকারভেদ আছে, এবং সেই প্রকারভেদ উপেক্ষা করা বিভ্রান্তিকর অতি সরলীকরণের নামান্তর।"[১] তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখান, যেমন পানির বরফে পরিবর্তন হল তাপমাত্রার হ্রাস পরিবর্তনের ফল, কিন্তু অক্সিজেন থেকে ওজনের গুনগত ভিন্নতার কারণ উপাদানের সংখ্যাগত ভিন্নতা।

বস্তুজগতের নিয়ম একই নিশ্চয়তায় সামাজিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা সে বিষয়ে তঃ মতীন প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তার মতে প্রকৃতির নিয়মাবলীর আলোকে সামাজিক পরিবর্তনকে সূত্রবদ্ধ করায় ত্রুটি ঘটার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। আবদুল মতীন লেনিনের একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরে তার সমালোচনা করেন। তিনি লেনিনের এই উদ্ধৃতিটি তুলে ধরেন,

Dialectics is the teaching which shows how opposites can be and how they happen to be (how they become) identical - under what conditions they are identical, becoming transformed into one another .. . (Lenin collected works, Vol.I, p. 414)

লেনিনের এ কথার সমালোচনায় আবদুল মতীন বলেন, "এ উক্তি নিতান্তই বিভ্রান্তিকর। আসলে দুই বিপরীত বৈশিষ্ট্য কখনো এক হয় না, পরস্পরের ভিতরেও প্রবেশ (Interpenetrate) করে না।"[২] "বস্তুতঃ দুই জিনিস কখনো এক হয় না - কেবল দুই বা ততোধিক 'নাম' বা 'বর্ণনা' একই বস্তুতে প্রযোজ্য হতে পারে। কাজেই বিপরীতের ঐক্য (Unity) বা অভিন্নতা দিয়ে যদি (উপরোক্ত অর্থে) 'যোগসূত্র' ছাড়া অন্য কিছু বুঝাই তা হলে সেটা মিছক শব্দের খেলা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।"[৩] আবদুল মতীন মার্কসবাদের সামাজিক বিরোধকে (Contradiction) না বলে সংঘাত (confliet) বলার পক্ষে মত দেন। মার্কসবাদে প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিরোধকে সমজাতীয় হিসেবে

---

১. আবদুল মতীন, "মার্কসবাদ ও দ্বান্দ্বিক যুক্তিবিদ্যা", পৃ. ৬৫।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯, ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

দেখাকে তিনি অতি দুর্বল সাদৃশ্যানুমান বলে চিহ্নিত করেন ।

আবদুল মতীন মনে করেন মার্কসবাদে contradiction আকারগত ও দ্বান্দ্বিক এ দু' অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে । তিনি মনে করেন মার্কসবাদীরা মনে করে তত্ত্ব বাস্তবতারই প্রতিচ্ছবি বিধায় জগৎ সম্পর্কীয় নির্ভুল তত্ত্বে বিরুদ্ধতা থাকবে । এই ধারণাকে তিনি এক উদ্ভট তত্ত্বীয় অবস্থান হিসেবে চিত্রায়িত করেন । তাঁর মতে 'contradiction' শব্দটি হেগেল ও মার্কসের মধ্যে দ্ব্যর্থক ব্যবহারে, অসতর্ক শব্দ প্রয়োগ, অঘোষিত শব্দার্থ থেকে, এক বড় বিশৃংখলা তৈরী হয়েছে । এক্ষেত্রে আবদুল মতীন যৌক্তিক ও ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোন থেকে দ্বন্দ্বতত্ত্বের পর্যালোচনা করেন । হেগেল দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে যৌক্তিক প্রকার (category) অর্থে তাৎপর্যময় । কিন্তু তা সুতন্ত্র রকমের ক্ষেত্রে মার্কসের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রয়োগ, কত-টুকু যথার্থ তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ।

যুক্তিবিদ্যা প্রত্যক্ষপর নিরপেক্ষ, কিন্তু দ্বন্দ্ববাদ অভিজ্ঞতামূলক হিসেবে যুক্তিবিদ্যা নয় বরং বিজ্ঞান হিসেবে দেখার পক্ষে তিনি মত দেন । আবদুল মতীন দু'টি যুক্তিশাস্ত্রের অস্তি-ত্বের বিরোধী । মার্কসীয় দ্বান্দ্বিকতাকে তিনি সুতন্ত্র একটি যুক্তিবিদ্যা বলে মনে করেন না । তিনি গতানুগতিক যুক্তিবিদ্যা ও দ্বান্দ্বিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের পক্ষপাতী । তাঁর এ অব-স্থান এখনো বিতর্কিত । তবে এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন বাংলাদেশে এই প্রথম তিনি করেছেন । এদিক থেকে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

আবদুল মতীনের মতে দ্বান্দ্বিক যুক্তিবিদ্যা, এই ভানু বা বিতর্কসাপেক্ষ যুক্তি-বিদ্যার সঙ্গে সমাজবাদী বা সাম্যবাদী মতাদর্শকে বেঁধে দেওয়ার ফলে এই মতাদর্শের ক্ষতি হয়েছে । অবশ্য দ্বান্দ্বিক অনিবার্যতা মার্কসবাদী আন্দোলনে উৎসাহ ও আস্থা যোগাতে পারে, কিন্তু অপর দিকে, এর ফলে সমাজবাদী মতাদর্শের ক্ষতি হয় দুইভাবে । প্রথমে, এর ফলে সমাজবাদীকে অনর্থক অমার্কসবাদীর সংগে 'তত্ত্বীয়' বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে হয় । দ্বিতীয়তঃ, এর ফলে দ্বান্দ্বিক যুক্তিবিদ্যার দুর্বলতা সমাজবাদী মতাদর্শকেও সংশয়ের বিষয়ে পরিণত করে । সমাজবাদ যদি সর্বোত্তম মতাদর্শ হয় তাহলে তার নিজস্ব মূল্যের ভিত্তিতেই তাকে দাঁড়াতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় ।

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল মতীন মনে করেন না যে, মানব-সমাজের বিকাশ কড়াকড়িভাবে কোন যৌক্তিক নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁর মতে, এর মধ্যে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, বিবেক-বুদ্ধি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ইত্যাদির একটা ভূমিকা আছে। সেজন্য তাঁর ধারণা এই যে, সমাজ গঠনের জন্য কোন ভাল মতাদর্শই যথেষ্ট নয়, তার জন্য ব্যক্তি-মানুষের সুশিক্ষা ও চরিত্র গঠনেরও প্রয়োজন আছে। [১]

আবদুল মতীন তাঁর "Humanism and the Future of Mankind" নামক প্রবন্ধে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান ব্যক্ত করেছেন। তিনি মানবতাবাদে বিশ্বাসী - ধর্ম বিরোধী নন, তবে তাঁর সে মানবতাবাদ ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ। তাঁর প্রত্যাশা হলো মানবতাবাদী সমাজ-ব্যবস্থার অর্থনৈতিক দিকটা হবে সমাজবাদী (বা সাম্যবাদী) আর রাষ্ট্রীয় দিকটা হবে গণতান্ত্রিক। তিনি যে মানবতাবাদী সমাজ ব্যবস্থা কল্পনা করেন তা "Will naturally lend itself to a Pattern of Socio-Economic order which is at once Socialist and democratic and is ultimately of the nature of a world-Government both in spirit and dimension." [২] বিশ্ব শান্তির জন্যে বিশ্বরাষ্ট্রের মতো কিছু-একটা প্রয়োজনও. তিনি এ ক্ষেত্রে ব্যক্ত করেছেন। আবদুল মতীন সমাজ-বাদী অর্থ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতি তাঁর মনোভাব যে অনুকূল নয় এ প্রবন্ধে তা প্রকাশ করেছেন। তাই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা কিভাবে হবে এ প্রশ্নে তিনি কোন চূড়ান্ত উত্তরের সন্ধান পাননি বলে মত ব্যক্ত করেছেন।

আবদুল মতীন মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে 'Historical determinism' হিসেবে আখ্যায়িত করে এ সম্পর্কে তাঁর সংশয় প্রকাশ করেছেন এই ভাবে, "Who knows the dialectics of nature will be ruled by humanist or Marxist expectations ? Is the historical necessity a logical one ?" [৩] এ ক্ষেত্রে তাঁর মতে ইতিহাসের ঘটনাবলী হলো 'Factual' এবং এগুলো হলো 'Contingent' ইতিহাসে কোন 'Necessary fact' নেই।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, আবদুল মতীন সমালোচনামূলক ও যৌক্তিক দিক থেকে মার্কসবাদকে বিবেচনা করেছেন। এতে করে তিনি মার্কসবাদকে গ্রহণ ও ক্ষেত্র বিশেষে মার্কসবাদের ত্রুটি, সমালোচনা তুলে ধরতে চেয়েছেন।

---

১. ডঃ আবদুল মতীন, "সমাজ গঠনের মূল মন্ত্র", যুক্তির আলোকে, বুক সোসাইটি, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৭৫, দ্রষ্টব্য

২. Abdul Matin, "Humanism and the Future of Mankind," Philosophy and Progress, Inaugural volume:July 1981, Dev centre for Philosophical studies, Dacca University, Dacca, Bangladesh.p. 4.

৩. Ibid, p. 11

Dhaka University Institutional Repository

আবুল কাশেম ফজলুল হক

আবুল কাশেম ফজলুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক। তিনি এককালে প্রত্যক্ষভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি মার্কসবাদ, মার্কসীয় দর্শন নিয়ে বেশ কিছু পুস্তক পুস্তিকা রচনা করেছেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: 'রাজনীতি ও দর্শন' (১৯৮৯), 'আমাদের সমাজের অভ্যন্তরে বিরাজিত দীর্ঘস্থায়ী সংকট নিরসনের লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব' (১৯৮৮), 'যুগ সংক্রান্তি নীতি জিজ্ঞাসা' (১৯৮০), 'কালের যাত্রার ধ্বনি' (১৯৭৩), 'মাওসেতুঙের জ্ঞান তত্ত্ব' (১৯৮৭)।

আবুল কাশেম ফজলুল হক মনে করেন, বাংলাদেশে মুক্তি সংগ্রামের জন্য তেমন কোন জ্ঞানগত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়নি। তাঁর মতে, "আমাদের দেশে মুক্তিকামী জনগণের সংগ্রামে জ্ঞানগত আয়োজনের ব্যাপারটি অবহেলিত হয়ে আসছে, এমনকি সাফল্যের শর্ত হিসেবে জ্ঞানগত প্রস্তুতির অপরিহার্যতা সম্পর্কে উপলব্ধিও দেখা যাচ্ছে না, বরং প্রয়োজনীয় জ্ঞানগত প্রস্তুতির বিরুদ্ধে direct action - এর মহিমা কীর্তিত হয়ে আসছে।"[১] তিনি মনে করেন যে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অনুশীলন ও দর্শন চর্চা এ দু'য়ের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ ঘটেছে। তিনি এ দু'য়ের সংযোগ প্রয়াসী। তাঁর মতে "এ দেশে ব্যবহারিক রাজনীতির সংগে কোন প্রকার গভীর চিন্তারই কোন যোগসূত্র আজও স্থাপিত হয়নি।"[২] তাঁর ধারণা বাঙালীর রাজনীতির মধ্যে দর্শনের প্রভাব কম। বাঙালী স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিচালিত হয়। তাঁর ভাষায়, "বাঙালীর রাজনীতিতে বরং দর্শনের প্রভাব ও পরিচালনা কম দেখা যায়। রাজনীতি ক্ষেত্রে সব কিছুই স্বতঃস্ফূর্ততার স্রোতে ভেসে যায়।"[৩]

---

১. আবুল কাশেম ফজলুল হক, রাজনীতি ও দর্শন, লোকায়েত পাঠকেন্দ্র, ঢাকা, বাংলাদেশ ১৯৮৯, পৃ. ৬

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

আবুল কাশেম ফজলুল হক চিন্তার গোড়ামীর বিপক্ষে, তিনি মার্কসবাদী ধারার অভ্যন্তরে চিন্তার গোড়ামীকে বিপদজনক ভেবেছেন। তাঁর ভাষায়, "... ধর্মীয় মোল্লা-তন্ত্রের চেয়ে 'গণতন্ত্রী' ও 'মার্কসবাদী', ধারার মোল্লাতন্ত্র মোটেই কম বিপদজনক নয় ...।"[১] এর মধ্যদিয়ে তিনি চিন্তার সৃজনশীলতার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নৈতিকতার সংকট, বিরোধের অনুপস্থিতি একটি বড় সমস্যা। এ প্রসংগে তিনি বলেন, "বাংলাদেশের রাজনীতি ব্যাধিগ্রস্থ ও দূষিত হয়ে পড়ার সবচেয়ে মৌলিক কারণগুলোর মধ্যে একটি হল রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে নৈতিক সচেতনতার এবং নৈতিক অনুশীলনের অনুপস্থিতি।"[২] এই অনুপস্থিতি তিনি অবলোকন করেছেন ধর্ম-ভিত্তিক, গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী সকলের মধ্যেই। নীতিবিজ্ঞানের যে সকল মানবিক সমস্যাকে বিবেচনা করা হয় সে সবের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোর কোন গভীর দৃষ্টিপাত নেই বলে তিনি অভিযোগ তুলেছেন। আবুল কাশেম ফজলুল হক বাংলাদেশের প্রগতিশীল দলগুলির মধ্যে মানবীয় গুনাবলীর অভাব লক্ষ্য করেছেন। তাঁর ভাষায়," বাংলাদেশের সমাজে যে সব দল ও গোষ্ঠী প্রগতিশীল ও সৃষ্টিশীল বলে আত্মপরিচয় দেয়, দীর্ঘকাল যাবৎ তাদের মধ্যে মানবীয় গুনাবলী সম্পর্কে সচেতনতার একান্ত অভাব দেখা যায়। অথচ মহত্তর মানবীয় গুনাবলীর অনুশীলন ত্যাগ করে শুধু আর্থ-সামাজিক রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের কর্মসূচী নিয়ে কিংবা গৎবাধা কেতাবি বক্তব্য নিয়ে কোনো দল বা গোষ্ঠী সমাজ প্রগতির সংগ্রামে সফল হতে পারে না।"[৩] আবুল কাশেম ফজলুল হক বিবেকবোধ থেকে চালিত হয়ে ন্যায়, সুন্দর, কল্যাণ ইত্যাদি শ্রেয়বোধ অর্জনের তাগিদ অনুভব করেছেন। তাঁর কাছে "বিবেক হল আমাদের জাগ্রত চেতনার অন্তর্গত সেই শক্তি যা আমাদেরকে ন্যায়, সুন্দর ও কল্যাণের পথে চলতে এবং অন্যায় অসুন্দর ও অকল্যাণের পথ থেকে বিরত থাকতে তাড়না দেয়।"[৪]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

৩. আবুল কাশেম ফজলুল হক, আমাদের সমাজের অভ্যন্তরে বিরাজিত দীর্ঘস্থায়ী সংকট নিরসনের লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব, ৬, নীলক্ষেত রোড, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৩।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল কাশেম ফজলুল হক ইতিহাসে মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও প্রিয়াপরতার গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন। তিনি নির্ধারণবাদী নন। তাঁর মতে "সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সাধারণত মানুষ নিষ্ক্রিয় থাকেনা, এবং কোন মানবীয় পরিবর্তনই সাধারণত সম্পূর্ণরূপে মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছা নিরপেক্ষভাবে ঘটেনা। 'ইতিহাসের অচেতন শক্তি' বলে যে শক্তিকে নির্দেশ করা হয়, সামাজিক ইতিহাসে সেই শক্তি সম্পূর্ণ অন্ধ কিংবা সম্পূর্ণ অজ্ঞ অথবা সম্পূর্ণ অচেতন থাকেনা, সার্বভৌম কিংবা নিরঙ্কুশও হয়না। যাকে বলা হয় 'মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ অনিবার্যতা', মানুষের ইতিহাসে তাও সৃষ্টি হয় বহুলাংশে মানুষেরই কর্মফলরূপে- হয় নিজের, না হয় অপরের, নতুবা উভয় পক্ষের কর্মফল। ইতিহাসে 'আপতন' বলে যে যে সব ঘটনাকে নির্দেশ করা হয়, সামাজিক ইতিহাসে সেইসব ঘটনাও কার্যকারণ নিয়মের ও মানবীয় নিয়ন্ত্রন সীমার সম্পূর্ণ বাইরে নয়। প্রকৃতি ও সমাজ নিরন্তর বিকশিত হয়ে চলেছে। এই বিকাশ ধারায় মানুষ নিতান্তই পরিবেশের ও আপন প্রবৃত্তির দাস নয়, সে তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে প্রকৃতি ও সমাজকে প্রভাবিত করতে পারে, সেই সঙ্গে আত্ম-শক্তিকেও ইচ্ছা অনুযায়ী পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করতে পারে।"[১]

নেতৃত্ব সম্পর্কে আবুল কাশেম ফজলুল হকের ধারণায় যৌক্তিকতা লক্ষ্যণীয়। তিনি বলেন, "যে জনগণ যখন যেমন নেতৃত্বের যোগ্য নয় সেই জনগণ নিজেরা নিজেদের জন্য নিজেদের মধ্য থেকে তখন ঠিক সেই রকম নেতৃত্বই তৈরী করে। নেতৃত্বের দোষ-গুনের মধ্যে জনসাধারণের দোষ-গুনের প্রতিফলন থাকে। আবার জনসাধারণের মানসিকতা সৃষ্টিতে ও আচরণ নিয়ন্ত্রণে নেতাদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।"[২]

আবুল কাশেম ফজলুল হক তাঁর 'মাওসেতুঙের জ্ঞানতত্ত্ব' গ্রন্থে মাওসেতুঙের জ্ঞানতত্ত্ব ও মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি বাংলাদেশে মাওসেতুঙ চিন্তাধারার বিকাশের দিকটিও কিছুটা তুলে ধরেন। বাংলাদেশে মাওসেতুঙ চিন্তার অনুশীলন সম্পর্কে বলেন, "তখন (১৯৬৩-৬৪) থেকে মার্কসবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের কারও

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

কারও লেখায় মাওসেতুঙের জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ক রচনাবলির উল্লেখ ও তাঁর চিন্তাধারার প্রতি সমর্থনের - বলা যায় বিচার বিবেচনাহীন, মোহমুগ্ধ, উগ্র সমর্থনের পরিচয় পাওয়া যায়।"[১]

আবুল কাশেম ফজলুল হক মাওসেতুঙের জ্ঞানতত্ত্বকে মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্বেরই বিকাশ বলে মনে করেন। তাঁর মতে, "মাওসেতুঙের জ্ঞানতত্ত্ব আসলে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন কর্তৃক প্রবর্তিত জ্ঞানতত্ত্বেরই বিকশিত, সংহত ও সুশৃংখল রূপ।"[২]

আবুল কাশেম ফজলুল হক তাঁর এ গ্রন্থে মাওসেতুঙের জ্ঞানতত্ত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি মাওসেতুঙের জ্ঞানতত্ত্বকে সমাজ বিপ্লবের সাথে সম্পর্কিত জ্ঞানতত্ত্ব বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্বে অনুশীলনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাঁর মতে, "মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্ব আসলে যতটা 'জ্ঞানতত্ত্ব' (Theory of knowledge, epistemology) ততটাই 'অনুশীলনতত্ত্ব' (Theory of practice, praxis). Practice বা Praxis-মধ্যে সর্বদাইKnowledge এর ব্যাপারটি অনুর্ভুক্ত করা হয়। এ-জন্যই মার্কসীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রে, মাওসেতুঙের চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও, যাকে বলা হচ্ছে এবং আমরাও বলছি 'জ্ঞানতত্ত্ব', তাকে 'জ্ঞানতত্ত্ব'/ না বলে 'অনুশীলনতত্ত্বও' বলা যায়।"[৩] আবুল কাশেম ফজলুল হকের মতে, "মাওসেতুঙের চিন্তাধারা মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-এর চিন্তাধারার পুনরাবৃত্তি নয়, একই ধারায় নবতর বিকাশ।"[৪]

আবুল কাশেম ফজলুল হক মনে করেন বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের শুরু করতে হবে বাস্তব থেকে, "বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতাত্ত্বিক বিচারের সূচনাবিন্দু সব সময় বস্তু বা বাস্তব, বস্তু থেকে আরম্ভ করে তার পর নীতি তত্ত্ব আদর্শ ইত্যাদি বিচার কিংবা নির্ণয় কিংবা উদ্ভাবন করা হয়।"[৫] তিনি কেতাবী দৃষ্টিভংগীর বিরোধিতা করেন।

---

১. আবুল কাশেম ফজলুল হক, মাওসেতুঙের জ্ঞান তত্ত্ব অক্ষর, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১২।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪ ও ৩৫।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসংগে তিনি বলেন, "কেতাবের ভাব থেকে যারা বিচার আরম্ভ করেন - কেতাব মনুসংহিতা, কিংবা ত্রিপিটক, কিংবা বাইবেল, অথবা মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন বা মাওসেতুঙের কোন গ্রন্থ, যাইহোক - তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ভাববাদী, তাদের কোন গোষ্ঠী নিজেদেরকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অনুসারী বলে পরিচয় দিলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ভাববাদী। মাওসেতুঙ মার্কসবাদের নামে কর্মরত এই ধরণের ভাববাদিতার তীব্র বিরোধিতা করেছেন।"[১]

আবুল কাশেম ফজলুল হক মাওসেতুঙের জ্ঞানতত্ত্বে আইনস্টাইনের প্রভাব রয়েছে বলে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন। মাওসেতুঙ সম্পর্কে তিনি মনে করেন যে, "মাওসেতুঙের চিন্তা-ধারার বৈশিষ্ট লক্ষ্য করে তাঁর মনকে বলা যায় মার্কসীয় ও পাশ্চাত্য প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ এক প্রতিভাদীপ্ত, সুবিকশিত পরিশীলিত, পরিমার্জিত চীনামন।"[২]

পরিশেষে, আবুল কাশেম ফজলুল হক বাংলাদেশে জ্ঞানগত পরিস্থিতির উল্লেখ পূর্বক একটি দিক নির্দেশনা দিতে চেয়েছেন, "অধঃপতিত বাঙলাদেশে শ্রম সাপেক্ষ জ্ঞানতাত্ত্বিক ও দার্শনিক মূলগত প্রশ্ন সমূহকে এড়িয়ে গিয়ে শুধুমাত্র অন্ধ অনুকরণ, মেঠো বক্তৃতা, কায়েমি শক্তির মালিকানাধীন দৈনিক-সাপ্তাহিকে রম্য রচনা বিবৃতি ও সাক্ষাৎকার প্রকাশ, পারম্পর্যহীন অগভীর অদূরদর্শী অবিমৃষ্যকারী বক্তব্য-সংবলিত প্রচারপত্র বিতরণ, বিচার, বিবেচনাহীন উত্তেজনা সৃষ্টি ও প্রজ্ঞাবর্জিত কর্মপদ্ধতির সাহায্যে উন্নত জীবন প্রতিষ্ঠা কি কস্মিনকালেও সম্ভবপর হতে পারে ? বাংলাদেশের জন্য আমরা মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্বকে কিংবা মাওসেতুঙের চিন্তাধারাকে গ্রহণ করার, কিংবা অনুকরণ করার অথবা অনুসরণ করার প্রস্তাব করছিনা। আমরা ভাবছি সংশ্লেষণ বা Synthesisএর কথা।"[৩]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯ ও ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল কাশেম ফজলুল হক একজন সৃজনশীল মার্কসবাদী চিন্তাবিদ। তিনি মার্কসবাদের শাস্ত্রবদ্ধ অনুকরণের বিরোধী, তিনি এ দেশের বাস্তবতায় মার্কসীয় চিন্তার একটা সংশ্লেষণ ঘটানোর পক্ষপাতী। তিনি কেবল রাজনীতি, দর্শন নয়, এ দর্শন ধারণকারী রাজনিতিক নেতৃত্বের নৈতিকতার বিষয়টি সামনে নিয়ে এসেছেন। সমাজিক রূপান্তরের জন্যে নেতৃত্বের বিষয়ে তিনি লিখেছেন অনেক।

রংগলাল সেন

ডঃ রংগলাল সেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। রংগলাল সেন প্রধানত সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে মার্কসীয় দৃষ্টিতে লিখেছেন। তাঁর প্রধান রচনা হলো -'Political Elites in Bangladesh'.

"মার্কসের মানবতত্ত্ব" (দ্বাদশ সংখ্যা, পৌষ ১৩৮৭, ডিসেম্বর ১৯৮০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা) প্রবন্ধে রংগলাল সেন কিছু দার্শনিক আলোচনা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "বুর্জোয়া সমাজ বিজ্ঞানীদের প্রচারনার ফলে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যেন বস্তুবাদী মার্কসের মনে মানুষের স্থান মোটেই ছিলনা, এ ধারণাটি মূলতঃ মিথ্যা।"[১] এ প্রবন্ধে তিনি মানব প্রত্যয় সম্পর্কে মার্কসের সাথে হেগেলের পার্থক্য তুলে ধরেন। মার্কসের মানব তত্ত্বে শ্রমের কেন্দ্রীয় অবস্থান, শ্রমের মধ্যদিয়ে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি তুলে ধরেন। রংগলাল সেনের মতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের ফলে মানুষ ও প্রকৃতির দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে। তখন মানুষের প্রাক ইতিহাস Pre history পর্ব শেষ হয়ে সত্যিকারের সত্য মানুষের মানবিক ইতিহাস True human history শুরু হবে। এতে করে মানব বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটবে বলে তিনি মনে করেন। রংগলাল সেন মার্কসকে মানবতাবাদী বিজ্ঞানী হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে মার্কস মানুষের ব্যক্তি সত্তার বিকাশে গুরুত্ব দিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব

---

১. রংগলাল সেন - "মার্কসের মানব তত্ত্ব" - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, দ্বাদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৮০, পৃ. ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

(individuality) ও অনন্য সত্তার (Uniqueness) বিকাশকে একটা চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মানুষকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই মার্কসের মানব তত্ত্বের মূল লক্ষ্য।

ডঃ সেনের মতে মার্কসের দর্শন মূলতঃ মানবতাবাদ ও প্রকৃতিবাদ তথা বিজ্ঞানের সমন্বয়। মার্কস তার ইতিহাস সংএশন ধারণায় মানুষকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়ার কারণে তিনি একে ইতিহাসের নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বলা যেতে পারে বলে মনে করেন। রংগলাল সেন বলেন, "প্রকৃত প্রস্তাবে, মার্কসের শ্রম ও পুঁজি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক categories নয়, এরা Anthropological categories ও বটে। সে জন্য মার্কসের বস্তুবাদী দর্শনে 'মানুষ' ও তার বিকাশের প্রশ্নটিই প্রাধান্য পেয়েছে।"[১] রংগলাল সেন মনে করেন মার্কস-মানব প্রকৃতির রূপায়নে সমাজ সংস্কৃতির প্রভাবকে মেনে নিলেও সমাজতাত্ত্বিক আপেক্ষিকতায় (Sociological relativism) বিশ্বাসী নন। তাঁর মতে মার্কস মানুষকে স্রষ্টা-তই একটি অনন্য সাধারণ 'মনাস্তাত্ত্বিক সত্তা" হিসেবে সনাক্ত করেছেন। মানব প্রকৃতি সম্পর্কে ফ্রয়েড এবং মার্কসের পার্থক্য From এবং Direction এর মধ্যে বলে তিনি মনে করেন।

মার্কসের মানবতত্ত্ব নিয়ে বাংলাদেশে আলোচনা হয়েছে কম। মার্কসের মানব তত্ত্বের দিকটি বাংলাদেশে অনালোচিত। এক্ষেত্রে রংগলাল সেন মার্কসীয় মানবতত্ত্বের দিকটি যথার্থ-ভাবেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। রংগলাল সেন মার্কসের একটা মানবীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

---

১. প্রাগুক্ত, প. ২২।

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ আবদুল জলিল মিয়া

ডঃ আবদুল জলিল মিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষক। তিনি "Marxist view of religion"(Second General Conference,Bangladesh Darshan Samite, Rajshahi, March 9-11, 1975) প্রবন্ধে কমিউনিষ্ট জীবন দর্শনকে যৌক্তিক নয়, গোড়া বলে অবহিত করেন। তাঁর মতে আধ্যাত্মিকভাবে বিকশিত আত্মার পক্ষে মার্কসীয় মতকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাঁর মতে সত্য কেবল বস্তুতে নয়, সত্য সুন্দর শুভকে বাদ দিয়ে মানুষ চলতে পারে না। ডঃ আবদুল জলিল মিঞা আধ্যাত্মবাদী অবস্থান থেকে মার্কসবাদের সমালোচনা করতে চেয়েছেন। মার্কসবাদে সত্য, সুন্দর শুভের ধারণা নেই - একথা যথার্থ নয়, তবে মার্কসীয় সত্য, সুন্দর ও শুভের ধারণা ভাববাদ, আধ্যাত্মবাদের সত্য, সুন্দর শুভের ধারণা থেকে পৃথক। এই তথ্যটি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

হায়দার আকবর খান রনো

হায়দার আকবর খান রনো বাংলাদেশে কমিউনিষ্ট আন্দোলনে অন্যতম ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে মার্কসবাদী তাত্ত্বিক হিসেবে পরিচিত। তিনি বাংলাদেশের ওয়ার্কাস পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলি হল : (১) 'মার্কসবাদের বিকাশ : সমস্যা ও তত্ত্ব' (১৩৮৩ বাংলা), (২) 'মার্কসবাদের প্রথম পাঠ' (১৯৮৭), (৩) মার্কসবাদ ও সশস্ত্র সংগ্রাম (১৯৮২)। এছাড়াও তার রচিত কিছু রাজনৈতিক পুস্তিকা রয়েছে। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখেছেন। রনো তার 'মার্কসবাদের প্রথম পাঠ' গ্রন্থের একটি অধ্যায় জুড়ে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। রনোর দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সম্পর্কিত ধারণায় আঠারো শতকীয় যান্ত্রিক ও স্থূল বস্তুবাদের পরিচয় মেলে। যেমন তিনি বলেছেন, "এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে তা সবই বস্তু বা পদার্থ।"[১] এটা যথার্থ মার্কসীয় বস্তুবাদী অবস্থান নয়।

---

১. হায়দার আকবর খান রনো - মার্কসবাদের প্রথম পাঠ, গণসাহিত্য প্রকাশনী,ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭, পৃ. ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুযায়ী বস্তু আদি । বস্তু থেকে চিন্তা, বিমূর্ততা উৎসজাত, কিন্তু তা বস্তু নয় । তাই স্পষ্টতই তাঁর লেখায় এক ধরণের স্থূল যান্ত্রিক বস্তুবাদিতার পরিচয় পাওয়া যায় । কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরলেই তা স্পষ্ট হবে ।

"বস্তুতঃ মস্তিষ্ক হল মননের ইন্দ্রিয় । সর্বোচ্চ বস্তু মনুষ্য মস্তিষ্কসহ উন্নতমানের জীবদেহ বিশিষ্ট মানুষ নিজেই একটা বস্তু । এই মানুষের সমবায়ে গঠিত মনুষ্য সমাজ ব্যাপক অর্থে বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয় ।"[১]

"সমাজ নিজেই একটা বস্তু ।"[২] "প্রতিভার জন্ম হয়েছে বস্তু থেকে ।"[৩]
"মার্কসবাদ চিন্তাকে একেবারে উড়িয়ে দেয় না ।"[৪]

উপরোক্ত উদ্ধৃতির পর্যালোচনায় তাঁর যান্ত্রিক বস্তুবাদিতা স্পষ্ট হয়ে উঠছে । এ আলোচনার এক জায়গায় তিনি মস্তিষ্ককে ইন্দ্রিয় হিসেবে দেখেছেন । কিন্তু মস্তিষ্ক কোন ইন্দ্রিয় নয় । 'মানুষ নিজেই একটা বস্তু' রনো এ বক্তব্য ফরাসী যান্ত্রিক বস্তুবাদীদের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । 'সমাজ নিজেই একটা বস্তু' - মার্কসের কাছে সমাজ প্রাকৃতিক বস্তু নয় । মার্কসের মধ্যে সমাজকে বিশ্লেষণের একটা বস্তুবাদী ধারণা ছিল । কিন্তু সমাজকে তিনি বস্তু হিসেবে দেখেন নি । 'প্রতিভার জন্ম হয়েছে বস্তু থেকে', 'মার্কসবাদ চিন্তাকে একেবারে উড়িয়ে দেয় না' - হায়দার আকবর খান রনোর উপরোক্ত উদ্ধৃতি প্রমাণ করে যে রনো সব কিছুকে বস্তুতে পর্যবসিত (Reduce) করেছেন । মানুষ, সমাজ, প্রতিভা সব কিছুই প্রাকৃতিক বস্তু হয়ে উঠেছে তাঁর মধ্যে । সব কিছুকে বস্তু হিসেবে দেখা আর বস্তুবাদী বোধ বা দৃষ্টিভংগী থাকা এক কথা নয় । মার্কসের মধ্যে আমরা বস্তুময়তা এবং বস্তুবাদী বোধের সৃজনশীল অনন্যতা দেখতে পাই । মার্কস যান্ত্রিকভাবে সব কিছুকে বস্তুতে পর্যবসিত করেন নি ।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯ ।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১ ।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১ ।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০ ।

Dhaka University Institutional Repository

রনো বস্তুর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। এ লেখার অনেক জায়গায় তিনি বস্তুর স্বাধীন অস্তিত্বকে স্বীকার করেও আবার বলেছেন," যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে যার অস্তিত্ব পাওয়া যায় তাই বস্তু।"[১] বস্তুর এ সংজ্ঞা বস্তুবাদ সম্মত নয়। বরং রনোর এ বক্তব্যের সাথে বার্কলির 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষনির্ভর' (Esse est percipi) অথবা যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের অবস্থানের সাথে মিল খুজে পাওয়া যাবে। বস্তুবাদ অনুযায়ী বস্তুর অস্তিত্ব ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতার উপর নির্ভরশীল নয়। বস্তু স্বাধীনভাবেই অস্তিত্বশীল। হায়দার আকবর খান রনোর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট হল তাঁর রচনা সহজ সরল বোধগম্য। রনো তাঁর লেখা সহজ সরল করতে গিয়ে মার্কসীয় অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে অনেক ক্ষেত্রে ধারণাগত বিকৃতি ঘটিয়েছেন। মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে তাঁর রচনায় যান্ত্রিক বস্তুবাদিতার পরিচয় মেলে।

আনিসুজ্জামান

আনিসুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে অধ্যাপনারত। তিনি মার্কসীয় দর্শন বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সেগুলি হল: ১. বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (দর্শন ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুন ১৯৮৩ বাংলাদেশ দর্শন সমিতি), 'বিচার তত্ত্ব' (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন, ১৯৮৯। তিনি বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ প্রবন্ধে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে বস্তুবাদ হিসেবে চিহ্নিত করার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি বস্তুর অ-বস্তুকরণের (Dematerialization of matter) প্রসংগ উত্থাপন করে বস্তুকে শক্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। সাম্প্রতিক কালের বিজ্ঞান যে রহস্যময়তা তৈরী করেছে তাতে বস্তুবাদ কথাটি কতটুকু যথার্থ সে সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। মার্কস দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ পদটি ব্যবহার করেন নি, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অভিধার জন্যে তিনি এঙ্গেলসকে দায়ী করেন।

---

১. হায়দার আকবর খান রনো, মার্কসবাদের প্রথম পাঠ, পৃ. ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

মার্কসের অবদানের কথা স্বীকার করতে গিয়ে তিনি মনে করেন আইনষ্টাইনের অনেক পূর্বেই মার্কস প্রচ্ছন্নভাবে সনাতনী ত্রি-মাত্রিকতার (Three dimension) উর্ধ্বে নিয়ে তার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট গতিময়তা সৃষ্টি করেছিলেন । মন বা সচেতনতা বস্তুরই উন্নততর বিকাশ । আনিসুজ্জামান মনে করেন, "এখানে এসেই তিনি [মার্কস] বস্তু-বাদকে ছাড়িয়ে যাওয়া সুরু করলেন ।"[১]

আনিসুজ্জামান মনে করেন ইতিহাস পরিবর্তনে মার্কস মানুষের সচেতনতার স্বীকৃতি দেয়ায় বস্তুবাদ আর বস্তুবাদ থাকেনি । তাঁর মতে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ একটা ভিন্নতর দৃষ্টি-ভংগী, একটা নবতর দর্শন ও জীবনবোধ, যা কোনক্রমেই বস্তুবাদের সমগোত্রীয় নয় । তাঁর মতে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, বস্তুবাদ বা ভাববাদ নয় । এহলো একটা তৃতীয় ধরণের দার্শনিক মতবাদ । এই বলে আনিসুজ্জামান তাঁর আলোচনায় মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে এক ধরণের রহস্যময়তা তৈরী করেছেন ।

হারুন রশীদ

হারুন রশীদ এককালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে অধ্যাপনায় নিয়োজিত । মার্কসীয় দর্শন নিয়ে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন ।[১]

---

১. হারুন রশীদের প্রবন্ধগুলি হল : (১) " Humanistic Approach in Sartres Existentialism" (২) "Limits of Empiricism: The crisis of Modern Empiricism" (৩) "Social Reality of Science" (৪) " মার্কসীয় দৃষ্টিতে দর্শনের উৎপত্তি, স্বরূপ ও এম্মবিকাশের ধারা " (৫) ধর্ম দর্শন ও বিজ্ঞান : মার্কসীয় দৃষ্টিভংগী " (৬) "The Problem of Alienation in Marxism" (৭) " The ontology of Man in Marxism".

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য ।

Dhaka University Institutional Repository

"ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান : মার্কসীয় দৃষ্টিভংগী" নামক প্রবন্ধে তিনি ধর্ম দর্শন বিজ্ঞানকে মার্কসীয় দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করে মানব জ্ঞানের ইতিহাসকে ভাববাদ ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্বের ইতিহাস হিসেবে দেখেছেন, যা সামাজিক দ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন বলে তিনি মনে করেন। তার মতে মার্কসের হাতেই দর্শন বিজ্ঞান ভিত্তিক হয়ে উঠেছে। "মার্কসীয় দৃষ্টিতে দর্শনের উৎপত্তি, স্বরূপ ও এর বিকাশের ধারা" প্রবন্ধে দর্শনকে বস্তুজগত সম্পর্কিত মানুষের চেতনার প্রতিফলন হিসেবে দেখেছেন। দর্শনকে তিনি যুগের বাস্তবতার প্রতিফলন বলে মনে করেন। এ প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন গ্রীক লৌকিক বস্তুবাদ ও যান্ত্রিক বস্তুবাদের সাথে মার্কসীয় বস্তুবাদের পার্থক্য তুলে ধরেণ এবং দ্বৈতবাদের সমালোচনা করেন। এ সব সত্ত্বেও তাঁর মতে চিন্তার ইতিহাসে ভাববাদের গুরুত্ব রয়েছে। তিনি মনে করেন, ভাববাদী দর্শনের অস্বীকার আদিম ধারণার সামিল" Limits of Empiricism : The Crisis of Modern Empiricism" প্রবন্ধে হারুন রশীদ অভিজ্ঞতাবাদ, বুদ্ধিবাদ এবং কান্টের বিচারবাদকে মার্কসীয় দর্শনের আলোকে পর্যালোচনা করেন। এ প্রবন্ধে তিনি যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী আর্নেস্টমাখের সমালোচনা করেন। "The Social Reality of Science" প্রবন্ধে তিনি বিজ্ঞানের সাথে সমাজ রাজনীতি ও অর্থনীতির সম্পর্ক তুলে ধরেণ। তাঁর মতে, "Today Under capitalism science as the instrument of the bourgeoise class is working against humanity." [১] প্রবন্ধে তিনি বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকে মানবতার বিপক্ষে দাঁড় করানোর দায়ে অভিযুক্ত করেন। জ্ঞান বিজ্ঞানকে পুঁজির দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে তিনি মার্কসীয় দর্শন ও সামাজিক বিপ্লবের মধ্যদিয়ে বিজ্ঞানকে সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করার প্রস্তাব করেন। তাঁর মতে বিজ্ঞান নিজেই তার লক্ষ্য হতে পারেনা।

---

১. A.K.M. Haroon Rashid, "Social Reality of Science", Bangladesh Journal of Philosophy, Vol-2, November, 1986, p. 151.

Dhaka University Institutional Repository

"The Problem of Alienation " প্রবন্ধে হারুন রশীদ মনে করেন ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার সাথে বিচ্ছিন্নতার ধারণা গভীরভাবে যুক্ত । পুঁজিতন্ত্র আত্মবিযুক্ত মানুষ (Self alienated man) তৈরী করে এবং বিমানবীকরণ (De humanization) ঘটায় । বিচ্ছিন্নতার অবসানের জন্যে তিনি ব্যক্তিগত মালিকানার বদলে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন । "Humanistic Approach in Sartre's Existentiatism " প্রবন্ধে হারুন রশীদ জ্যাঁ পল সার্তের অস্তিত্ববাদকে চরম বিষয়ী(subjective) স্বাতন্ত্র্যবাদী ও ইতিহাসবোধ বিযুক্ত বলে সমালোচনা করেন । জ্ঞানের ক্ষেত্রে সার্ত বিষয় এবং বিষয়ীর মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেনি বলে তিনি মনে করেন । সার্তের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ধারণাকে বুর্জোয়া দর্শন বলে হারুন রশীদ সমালোচনা করেছেন । সার্তের ভাবাদর্শকে (Ideology) তিনি মার্কসীয় দর্শনের অধীনস্থ কোন কোন ভাবাদর্শ মনে করেননি । সার্তকে মার্কসবাদী হিসেবে হারুন রশীদ স্বীকার করেন না ।

"The ontology of man in Marxism " প্রবন্ধে হারুন রশীদ মনে করেন, মার্কসবাদের কেন্দ্রীয় অবস্থানে রয়েছে মানুষ । তিনি বাস্তব মানুষ সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন । মানুষ ও প্রকৃতির দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক, মানুষ ও প্রাণীর পার্থক্য, প্রজাতি সত্তা হিসেবে মানুষ, শ্রম প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে মানুষের মূর্ত হয়ে ওঠা, সক্রিয় প্রাকৃতিক সত্তা (Active natural being) এবং বিষয়ী ও বিষয় হিসেবে মানুষ, ইত্যাদি বিশ্লেষণাত্মকভাবে তুলে ধরেছেন । তিনি এ প্রবন্ধে মানুষের ভিত্তি মানুষের নিজের মধ্যেই 'The root of man is man himself ' মার্কসের এ বক্তব্যকে বিপ্লবী ও মৌলিক হিসেবে গ্রহণ করে তার বিস্তারিত আলোচনা করেন । ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য নিয়ে মার্কস আলোচনা করেননি, সাধারণ মানব প্রত্যয় নিয়ে মার্কস আলোচনা করেছেন । মার্কস সমালোচকদের এ বক্তব্যের জবাবে তিনি মনে করেন, মার্কস ব্যক্তিকে প্রজাতি সত্তার অংশ হিসেবে ' Generic sense '- এ দেখেছেন । মার্কস ব্যক্তিকে (Individual) সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নয়, সামাজিক ব্যক্তি (Social individual) হিসেবে দেখেছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি কোন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নয়, সামাজিক সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। ব্যক্তির উত্থানের সাথে মার্কসের ধারণার কোন বিরোধ নেই বলে হারুন রশীদ মনে করেন। পুঁজিতন্ত্রের 'বিচ্ছিন্নতা' উল্লেখ করে তিনি মনে করেন মার্কসের মানুষের ধারণা (Ontology of human) বুঝার জন্যে বিদ্যমান শোষণের প্রেক্ষিতে এবং সকল প্রকার শোষণ থেকে মানুষের মুক্তির বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। কাঠামোবাদী (Structuralist) অ্যালথুসারের 'Class humanism' এবং 'Personal humanism'এর ধারণাকে নাকচ করে হারুন রশীদ মার্কসের মানবতা বোধকে সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদ (Socialist humanism) হিসেবে বিধৃত করেন।

হারুন রশীদ তাঁর রচনায় নব্য মার্কসবাদী দৃষ্টিভংগীর বিরোধিতা করে চিরায়ত মার্কসবাদী অবস্থানকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। হারুন রশীদ মার্কসীয় দর্শন নিয়ে লিখেছেন অনেক। তিনি মৌলিক মার্কসীয় চিন্তাকে তুলে ধরেছেন তাঁর রচনায়।

অনিল মুখার্জি

অনিল মুখার্জি বাংলাদেশে মার্কসীয় আন্দোলনে একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হল (১) 'সাম্যবাদের ভূমিকা'
(২) 'হাতে খড়ি'
(৩) 'স্বাধীন বাংলাদেশ সংগ্রামের পটভূমি'।

অনিল মুখার্জি তার 'সাম্যবাদের ভূমিকা' গ্রন্থে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সম্পর্কিত তাঁর লেখাটুকু মূলতঃ স্ট্যালিনের 'Dialectical and Historical Materialsm' থেকে গৃহীত। এ সম্পর্কে তিনি বলেন "... দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, প্রায় সম্পূর্ণটাই কমরেড স্ট্যালিনের লেখা 'Dialectical and Historical

Dhaka University Institutional Repository

Materialsm ' - নামক পুস্তিকা হইতে গৃহীত।"[১] তথাপি মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কিত অনিল মুখার্জির 'সাম্যবাদের ভূমিকা' গ্রন্থটি বহুল প্রচারিত। এর মধ্যে কিছু যান্ত্রিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন তিনি বলেছেন "প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে মার্কসীয় ব্যাখ্যা যেমন দ্বন্দ্বমূলক ও বাস্তব, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে, মানব ইতিহাস ও সমাজজীবন সম্বন্ধে ইহার বিচার বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, ধারণা ও মতামত, ঠিক তেমনই।"[২] প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও মানব ইতিহাস ও সমাজজীবন সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ধারণা ঠিক এরকম মনে করার মধ্য দিয়ে তিনি যান্ত্রিকতা ও সরলীকরণের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এগুলি সমগোত্রীয় নয়। মার্কস তার দর্শনকে সমাজ ইতিহাসে প্রয়োগ করেছেন কিন্তু সমাজ, ইতিহাসকে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মতো সমগোত্রীয় ভাবেন নি, মার্কস তার দর্শনকে সকল ক্ষেত্রে 'সমভাবে' প্রযোজ্য মনে করেন নি।

এম.এম. আকাশ

এম.এম. আকাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনারত। তাঁর অধিকাংশ লেখা অর্থনীতি বিষয়ক। তিনি মার্কসীয় দর্শন নিয়ে দু'টি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধ দু'টি হল : (১) "বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব - হেগেল ফয়ারবাখ এবং মার্কস," (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঊনবিংশ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৯১, জুন ১৯৮৪) । (২) "দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ" (সমাজ নিরীক্ষণ /৯ অক্টোবর ১৯৮৩) ।

"বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব - হেগেল ফয়ারবাখ এবং মার্কস" প্রবন্ধে তিনি 'বিচ্ছিন্নতার ধারণা মার্কস কি করে হেগেল ও ফয়ারবাখের রহস্যময়তা থেকে উদ্ধার করেন তা আলোচনা করেন। পুঁজিতান্ত্রিক বিনিময় ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে যে বিচ্ছিন্নতা ঘটে তা তিনি

---

১. অনিল মুখার্জি, সাম্যবাদের ভূমিকা, তৃতীয় বাংলা সংস্করণ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৩, গ্রন্থকারের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা থেকে।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

তুলে ধরেছেন। তিনি নব্য মার্কসবাদীদের কর্তৃক তরুন মার্কস ও পরিণত মার্কসের মধ্যে বিভক্তিকরণের বিরোধিতা করেন। এম.এম. আকাশ তাঁর "দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' প্রবন্ধে বিশ্বদৃষ্টিভংগী, বস্তুবাদ বনাম ভাববাদ, অধিবিদ্যা ও ডায়ালেকটিকস, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সাধারণ নিয়মাবলী, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্ব, মার্কসীয় দর্শনের এ সকল বিষয়ে আলোচনা করেন। আকাশ তাঁর এসব রচনায় মার্কসীয় দর্শনকে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

সৈয়দ হাশেমী

সৈয়দ হাশেমী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক। তাঁর (১) "মার্কসীয় দ্বান্দ্বিকতা ও অর্থনীতি" (সমাজ নিরীক্ষণ, ৬/১৯৮২, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(২) "তরুন মার্কস পরিণত মার্কস"বিতর্ক" (সমাজ নিরীক্ষণ/১৭ আগষ্ট ১৯৮৫, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

এ দু'টি প্রবন্ধে মার্কসীয় দর্শন বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন এবং নব্য মার্কসবাদীদের কিছু প্রশ্ন সামনে তুলে ধরেন।

সৈয়দ হাশেমী 'মার্কসীয় দ্বান্দ্বিকতা ও অর্থনীতি' প্রবন্ধে দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের যান্ত্রিক (Mechanical) এবং পূর্ব নির্ধারণকৃত (Predeterministic) ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেন। তিনি স্ট্যালিনের 'দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' প্রবন্ধকে মার্কসের বক্তব্যের অপব্যাখ্যা বলে মন্তব্য করেন। হাশেমী নির্ধারণবাদী মার্কসবাদীদের নেতিবাচক সমালোচনা করেন।

সৈয়দ হাশেমী নব্য মার্কসবাদী আলথুসার এবং কলেত্তির বক্তব্য উল্লেখ পূর্বক হেগেলীয় দ্বান্দ্বিকতাকে মার্কসীয় বস্তুবাদে স্থাপনে যান্ত্রিকভাবে উল্টে দেয়ার(inversion) জন্যে এঙ্গেলসকে অভিযুক্ত করেন। হাশেমী মনে করেন যে এঙ্গেলস মার্কসীয় চিন্তা থেকে

Dhaka University Institutional Repository

সরে এসেছেন, এঙ্গেলস এর মধ্যে অতিসরলীকরণ ঘটেছে। তিনি বলেন হেগেলের ভাববাদী উপসংহার ঈশ্বরে পরিণতি লাভ করেছে। তাকে এড়িয়ে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে হেগেলের দ্বান্দ্বিক কাঠামোটি ব্যবহার কতটুকু যুক্তিযুক্ত হয়েছে - এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

হাশেমী নেতির নেতিকরণ সূত্র যা এঙ্গেলস হেগেলের কাছ থেকে নিয়েছেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এই গ্রহণের মধ্যে ভাববাদের ছোঁয়াচ লেগে রয়েছে কিনা এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। হেগেলের দ্বন্দ্ববাদের কাঠামোটি চক্রাকার, পরম কারণমূলক (Teleoligical) ভাববাদী। হেগেলের দ্বন্দ্ববাদের ভিত্তি নেতির নেতিকরণ হলো পরম কারণমূলক। কিন্তু মার্কসবাদ পরম কারণমূলক নয়, সেহেতু হেগেলের নেতির নেতিকরণ সূত্রটি মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদে কতটুকু ব্যবহারযোগ্য তা প্রশ্ন সাপেক্ষ বলে সৈয়দ হাশেমী অ্যালথুসার কলেক্টিভের সাথে ঐক্যমত ঘোষণ করেছেন। সৈয়দ হাশেমী বলেন "যেহেতু মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদ পরম কারণমূলক (Teleological) নয় সেহেতু মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদ 'নেতির নেতিকরণ' সূত্র কতখানি ব্যবহার করতে পারে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।"[১]

সৈয়দ হাশেমী তার "তরুন মার্কস/পরিণত মার্কস' বিতর্ক" প্রবন্ধে নব্যমার্কসবাদী অ্যালথুসার কর্তৃক মার্কসের তরুন বয়সের চিন্তাকে ভাববাদর্শ ও পরিণত বয়সের চিন্তাকে বিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে তরুন মার্কস ও পরিণত মার্কসের জ্ঞানতাত্ত্বিয় সম্বন্ধচ্যুতির (The epistemological break) ধারণাটি তিনি নাকচ করেন। সৈয়দ হাশেমীর উত্থাপিত প্রশ্ন নব্য মার্কসবাদী বলে পরিচিত কাঠামোবাদী লুইস অ্যালথুসার ও কলেক্টিভ কর্তৃক উত্থাপিত। এ প্রশ্নগুলি তিনি নতুন করে আমাদের সামনে তুলেছেন। সব বিষয়ের নিষ্পত্তি এখনো ঘটেনি। এ প্রশ্নগুলি আমাদেরকে নতুন করে এ-বিষয়ে চিন্তা করতে প্রণোদিত করে।

---

১. সৈয়দ হাশেমী, "মার্কসীয় দ্বান্দ্বিকতা ও অর্থনীতি", সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা ৬/১৯৮২ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

আলী হোসেন

আলী হোসেন ১৯৭৭ সালে 'মার্কসীয় দর্শন'[১] নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। আলী হোসেনের রচনার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হলো তিনি দর্শনের ইতিহাস বিকাশের ধারা আলোচনার মধ্যদিয়ে মার্কসীয় দর্শনের দার্শনিক প্রেক্ষিত তুলে ধরতে চেয়েছেন এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থখানি মার্কসের দর্শনকে বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক।

আবদুল হালিম

আবদুল হালিম ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি এককালে বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। আবদুল হালিমের রচিত গ্রন্থগুলি হল - (১) 'ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ পরিচিতি' (১৯৭৩), (২) 'সমাজতন্ত্রের পরিচয়' (১৩৭৯), (৩) 'ইতিহাসের রূপরেখা'। আবদুল হালিম তার 'ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ পরিচিতি' গ্রন্থে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

আবদুল হালিমের লেখায় এক ধরণের যান্ত্রিকতা ও সরলীকরণের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন তিনি বলেছেন, "মার্কসবাদের আরও অভিনবত্ব এইখানে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কেবল জড়জগতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, পরন্তু জড়জগৎ, জীবজগৎ এবং মানব সমাজ সম্পর্কে সমানভাবে প্রযোজ্য।"[২]

আবদুল হালিমের উপরোক্ত বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি 'বস্তু' কথাটির পরিবর্তে 'জড়' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'বস্তু জগৎ'কে 'জড় জগৎ' বললে 'দ্বান্দ্বিক

---

১. আলী হোসেন, মার্কসীয় দর্শন, নভেম্বর - ১৯৭৭, প্রকাশনা সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, ১৯৬, জগন্নাথ সাহা রোড, ঢাকা।

২. আবদুল হালিম, ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ পরিচিতি, প্রকাশ ভবন, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ.১।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুবাদ'কে 'জড়বাদ' বলা সম্ভব। এ বক্তব্যের মধ্যে এক ধরণের যান্ত্রিক বস্তুবাদী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

উপরে উল্লেখিত উদ্ধৃতিতে দেখা যায় আবদুল হালিম মার্কসের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে জড় জগৎ, জীবজগৎ ও মানব সমাজের ক্ষেত্রে 'সমানভাবে প্রযোজ্য' মনে করেছেন। কিন্তু 'জড়', জীব ও মানব সমাজ সমগোত্রীয় নয়। মার্কস জীবজগৎ, বস্তুজগৎ, মানব সমাজ সকলক্ষেত্রে তার পদ্ধতি প্রযোজ্য মনে করলেও 'সমানভাবে প্রযোজ্য' বলে মনে করেন নি। এ ধরণের সরলীকরণ ও যান্ত্রিকতা মার্কসের চিন্তায় ছিলনা।

আবদুল হালিম এ গ্রন্থে দ্বান্দ্বিক যুক্তিবিদ্যা ও গতানুগতিক যুক্তিবিদ্যা (Formal Logic) নিয়ে বেশ কানিকটা আলোচনা করেছেন। আবদুল হালিম মনে করেন প্রচলিত যুক্তিবিদ্যা মার্কসবাদ অস্বীকার করে না। প্রচলিত যুক্তিবিদ্যাকে স্বীকার করলে মার্কসবাদ অপ্রমাণিত হয় না। তবে আবদুল হালিম গতানুগতিক যুক্তিবিদ্যাকে স্বীকার করে নিয়ে দ্বান্দ্বিক যুক্তিবিদ্যাকে একটি স্বতন্ত্র যুক্তিবিদ্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

আবদুল হালিমের ধারণা হলো বাস্তবের 'দ্বৈত চরিত্র' গতানুগতিক যুক্তিশাস্ত্রে প্রতিফলিত হয় না বলে এ দিয়ে সত্যজ্ঞান লাভ করা যায় না। এ কারণে প্রচলিত যুক্তিবিদ্যা অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত। ডায়ালেকটিক্যাল বস্তুবাদ বাস্তব জগতের দ্বৈত বৈশিষ্ট উদঘাটন করে সত্য দিতে পারে বলে তিনি মনে করেন।[১] আবদুল হালিম এ বক্তব্য প্রদান করে কার্যত গতানুগতিক যুক্তিবিদ্যাকে নাকচ করতে চেয়েছেন। চিন্তার নিয়ম (Laws of thought) হিসেবে এরিষ্টটলীয় যুক্তিবিদ্যার যথার্থতা এবং বস্তুজগতের বিষয়গত দ্বন্দ্ব (Objective Contradiction) এ দু'য়ের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। আবদুল হালিম বলেন "এরিষ্টটলীয় চিন্তায় একটি বস্তু 'ক' শুধুই 'ক' এবং 'ক' ব্যতীত আর কিছুই নয়।

---

১. দ্বান্দ্বিক ও গতানুগতিক যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে আবদুল হালিমের 'ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ পরিচিতি', গ্রন্থের পৃ. ১১,৪৬, ৪৯,৫০,৫১ দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ প্রত্যেকটা বস্তুর নিজস্ব বিশিষ্ট ধর্ম আছে। তার মধ্যে ঐ বিশিষ্ট ধর্মের বিরোধী অন্য কোন ধর্ম থাকতে পারেনা,... অথচ মার্কসবাদ স্পষ্ট তুলে ধরেছে যে, একই বস্তুর মধ্যে বিপরীত ধর্মী গুনের উপস্থিতিই প্রকৃতির সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়।"[১] আবদুল হালিম এরিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যার দ্বিতীয় নিয়ম 'বিরুদ্ধতার নিয়ম' (Law of contradiction) কে যথার্থভাবে না বুঝেই তাকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন। এরিস্টটলের দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী কোন বচন এবং তার বিরুদ্ধ বচন একই সময়ে যুগ্মভাবে সত্য হতে পারে না। এ নিয়মটিকে এরিস্টটল চিন্তার নিয়ম হিসেবে দেখেছিলেন। এরিস্টটলের বিরুদ্ধতার নিয়ম মেনেও বাস্তব জগতের দ্বন্দ্ব বা দ্বৈত চরিত্রকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। আবদুল হালিম কর্তৃক এরিস্টটলীয় গতানুগতিক যুক্তিবিদ্যাকে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোটা হলো এরিস্টটল ও মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে যান্ত্রিকও ত্রুটি পূর্ণ উপলব্ধি থেকে উৎসজাত। আসলে দ্বান্দ্বিক যুক্তিবিদ্যা বলে স্বতন্ত্র কোন যুক্তি বিদ্যা মার্কসীয় বিশ্লেষণে পাওয়া যাবে না বলে মনে হয়। উপরোক্ত কারণে আবদুল হালিমকে একজন স্থূল যান্ত্রিক বস্তুবাদী বলে মনে হয়।

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম এককালীন বামপন্থী ছাত্রনেতা ও ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা। তিনি প্রধানত একজন সক্রিয় রাজনীতিক। তাঁর রচিত "মার্কসবাদ : একটি জীবন্ত মতাদর্শ" (১৯৯১) নামক পুস্তিকায় তিনি মার্কসীয় দর্শন নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। এ পুস্তিকায় তিনি মার্কসবাদের সৃজনশীলতার গুরুত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি বস্তু থেকে চেতনার উদ্ভবের বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে চৈতন্য যে আবার বস্তু জগতের ওপর একটা স্বাধীন ভূমিকা রাখে এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটি তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষায়, " বস্তু জগতের

---

১. আবদুল হালিম, ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ পরিচিতি, পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

বিবর্তনের ধারাতেই মানুষ ও মানুষের বুদ্ধি ধণ্ডিকে ভিত্তি করে চেতনা জগতের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু মার্কসবাদ এখানেই এ সম্পর্কে তার বক্তব্যের ইতি টানে না... বস্তুজগত থেকে চেতনা জগতের উৎপত্তি হলেও এবং তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকলেও, চেতনা জগত আবার স্বাধীনভাবে বস্তুজগতের ওপর উল্টো ক্রিয়া করে। যান্ত্রিক বস্তুবাদী ধারণার সাথে এখানেই মার্কসবাদের মৌলিক পার্থক্য।"[১] এই পুস্তিকার এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা সমূহ শুধু অস্তিত্বমানই নয়, সে সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান অর্জন সম্ভব।"[২] 'সত্তা সমূহ' কথাটিতে বহুত্ববাদীতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মার্কসীয় দর্শন একত্ববাদী। সেলিমের মধ্যে এক ধরণের দ্বৈতবাদী প্রবনতাও লক্ষ্য করা যায়। যেমন তিনি বলেছেন "মার্কসবাদী মতাদর্শের আরেকটি ভিত্তিমূলক প্রতিপাদ্য হলো বস্তুজগত হোক বা চেতনা জগতের ক্ষেত্রেই হোক সব সত্তার অস্তিত্ব গতিময়।"[৩] তিনি আবারো বলেন "মার্কসবাদের সার্বজনীনতা আনুঃসম্পর্ক ও গতিময়তার সূত্র সব সত্তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা বস্তু জগতের মধ্যেই হোক অথবা চেতনা জগতের ক্ষেত্রেই হোক.... বস্তু জগতের মতো চেতনা জগত ও অনন্য গতিময়তার বৈশিষ্ট সম্পন্ন।"[৪] তার 'সব সত্তা' হলো বহুত্ববাদ। আর বস্তুজগত আর চেতনা জগতের মধ্যে তিনি যেন একটা বিচ্ছেদ সাধন করে দু'টি জগত, দু'টি সত্তা হিসেবে বস্তুজগত ও চেতনা জগতকে ভাগ করেছেন। এ-কারণে তার মধ্যে একধরণের বস্তু ও চেতনার দ্বৈতবাদী বিভাজন লক্ষ্য করা যায়।

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম নিয়তিবাদ, ইচ্ছাবাদ ও গোড়া যান্ত্রিক ছক বাধা ব্যাখ্যার কবল থেকে মার্কসবাদকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। তিনি মার্কসবাদের সৃজনশীল বিচার মূলক দিকের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বাংলাদেশে মার্কসবাদ চর্চার ক্ষেত্রে স্থূল, যান্ত্রিক, চিন্তাকেই আধিপত্যশীল বলে বর্ণনা করে এই ধারার বিরোধিতা করেছেন।

---

১. মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, মার্কসবাদ একটি জীবন্ত মতাদর্শ, মার্কসবাদ চর্চা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৩।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল মতিন খান

আবদুল মতিন খান বাংলাদেশের লেখক শিবিরের সদস্য। তিনি তাঁর 'দ্বন্দ্ব ও পারমিতা' (১৯৮৮) নামক গ্রন্থে মার্কসীয় দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি একজন মার্কসবাদী ধারার লেখক। আবদুল মতিন খান 'দ্বন্দ্ব পারমিতা' গ্রন্থে "ভাববাদ ও বস্তুবাদ" এবং "মার্কস ও তার দ্বন্দ্ববাদ" অধ্যায়ে মার্কসীয় দর্শনের ওপর আলোকপাত করেছেন। উল্লেখিত প্রথম প্রবন্ধে তিনি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে পার্থক্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেণ। তিনি বস্তুবাদ বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলিও আলোচনা করেছেন এক্ষেত্রে।

বস্তু ও চেতনার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে তার মধ্যে যথার্থভাবেই বস্তুবাদী একত্ববাদের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি চেতনার ভিত্তি হিসেবে বস্তুকে মনে করলেও চেতনাকে তিনি বস্তু মনে করেননি। তিনি স্থূল বস্তুবাদীদের মতো করে সব কিছুকে বস্তুতে পর্যবসিত করেননি। এক্ষেত্র তাঁর মতে, "চৈতন্যকে কোনএমেই মগজ থেকে পৃথক করা যায়না... তবে চৈতন্য বস্তু নয়।"[১] আবদুল মতিন খান মানুষের সৃজনশীলতায় চৈতন্যের অনেকটা স্বাধীন ভূমিকার কথা বলেছেন। আবদুল মতিন খান একই গ্রন্থের "মার্কস ও তার দ্বন্দ্ববাদ" অধ্যায়ে প্রসঙ্গএমে দর্শন নিয়ে কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে তিনি মার্কসের উত্থান ও তার তত্ত্বের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। আবদুল মতিন খান - এর মধ্যে মার্কসবাদ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একটা বিচারমূলক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তিনি বস্তুতান্ত্রিক একত্ববাদী।

---

১. আবদুল মতিন খান, দ্বন্দ্ব পারমিতা, কৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

ফরহাদ মজহার

ফরহাদ মজহার বাংলাদেশে একজন মার্কসীয় চিন্তাবিদ। তিনি সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাহিত্য নিয়ে লিখেছেন। মার্কসীয় দর্শন নিয়ে তাঁর দু'একটি প্রবন্ধ রয়েছে।

মার্কসীয় দর্শন বিষয়ক রচনায় মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনকে স্থূলতা ও যান্ত্রিক বস্তুবাদিতা থেকে রক্ষা করে মার্কসের বস্তুবাদকে পরিশীলিত বিকশিত বস্তুবাদ হিসেবে তুলে ধরেন। ফরহাদ মজহার মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রচলিত দ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা যা বিষয় ও বিষয়ীর, বস্তু ও চিন্তার দ্বিখণ্ডীকরণ করে তিনি এর বিরুদ্ধে। তিনি মার্কসের বস্তুবাদের একত্ববাদী (Monist) অবস্থান তুলে ধরেন। তিনি বস্তু ও চিন্তার দ্বিখণ্ডীকরণের বিরোধী। দ্বিখণ্ডীকরণকে তিনি স্থূল ও যান্ত্রিক উত্তরোচিত বস্তুবাদ হিসাবে মনে করেন। তাঁর ভাষায়,"মোটা দাগের বস্তুবাদ যখন বস্তু ও চেতনার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক অনুধাবন না করে একদিকে চেতনা এবং অপরদিকে বস্তুকে আলাদা করে জগৎকে দ্বিখণ্ডিত করে নেয় তখনই মুশকিলে পড়তে হয়।"[১] ফরহাদ মজহার চিন্তা, বস্তু প্রকৃতির ব্যাখ্যায় মার্কসের সাথে অনেকটা স্পিনোজার অনুসারী। তাঁর মতে, "বস্তু = চৈতন্য বা মানুষ = প্রকৃতি।"[২]

ফরহাদ মজহার মনে করেন জ্ঞানের (Congition) ক্ষেত্রে, জানার প্রয়োজনে পদ্ধতিগত দরকারে বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে একটা পার্থক্য প্রণয়ন করে চিন্তা। চিন্তা এভাবেই সত্তাকে জানে। তিনি মনে করেন, "মানুষের পর্যায়ে... প্রকৃতিকে তার মানবীয়তা কিম্বা চিন্তাশীলতা থেকে আলাদা করা যায় না মানুষ বা চিন্তাশীল প্রকৃতি একই সংগে, অতএব, বস্তু এবং চিন্তা।"[৩] তিনি মনে করেন চিন্তার বৈষয়িক অস্তিত্ব হিসেবে প্রকৃতি বা বস্তু বর্তমান।

---

১. ফরহাদ মজহার, "কাসেদ আলী কি ভাবতেন: ব্যক্তিগত আলাপের আলোকে একজন অগ্রজ কমিউনিস্টের রচনাবলীর প্রাথমিক পাঠ", চিন্তা, পাক্ষিক, ১ম বছর ৪র্থ সংখ্যা, ১৫ অক্টোবর, ১৯৯১, পৃ. ৩২।

২. ফরহাদ মজহার, "বস্তু = চৈতন্য বা মানুষ = প্রকৃতি: কতিপয় আপ্তবাক্য," অনিরুদ্ধ, পঞ্চম সংকলন, চারিত্র নেই, ৫৭৫, পেয়ারা বাগ, মগবাজার, ঢাকা, পৃ. ৫৮।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

ফরহাদ মজহার সব কিছু বস্তুতে পর্যবসিত করার বিরোধী। একে তিনি ইতরোচিত বস্তুবাদ হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং একে প্রতিক্রিয়াশীল বলে মত দেন, যার সাথে মার্কসের চিন্তার কোন মিল নেই বলে তিনি মনে করেন। চিন্তা বস্তুদিয়ে তৈরী এ ব্যাখ্যায় ইতরোচিত বস্তুবাদ প্রাণবন্ত বলে তিনি মন্তব্য করেন। তাঁর মতে ইতরোচিত বস্তুবাদ যা উপস্থিত সব কিছুকে 'বস্তু' উপাধি দেয়। অপর দিকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের কাছে 'উপস্থিতিই যে-কোন সত্তার বাস্তবতা প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট' বলে তিনি মনে করেন। তেমনি প্রকৃতির উপস্থিতিই প্রকৃতির বাস্তবতা প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট। প্রকৃতি বস্তু, ইলেকট্রোমেগনেটিক ওয়েভ না অন্য কিছু দিয়ে তৈরী তা অদরকারী। প্রকৃতি আছে কিনা এই উপস্থিতিবোধ সকল সময়েই কোন না কোন চৈতন্যের বোধে। উপস্থিতি, কি করে চৈতন্য বা মানুষের কাছে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে তিনি তা আলোচনা করেন। এথেকে তিনি বলেন, "উপস্থিতিবোধ একই সংগে চিন্তা ও বস্তুজগতের কিম্বা মানুষ ও প্রকৃতির উপস্থিতি ব্যক্ত করে।"[১]

ফরহাদ মজহারের মার্কসের বস্তুবাদী দর্শন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা দ্বান্দ্বিক একত্ববাদী। যান্ত্রিক দ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা, ও স্থূল বস্তুবাদিতার বিরুদ্ধে মার্কসের একত্ববাদী, বিকশিত ও পরিশীলিত বস্তুবাদকে সৃজনশীল বিচারমূলকভাবে তুলে ধরেছেন তিনি তাঁর রচনায়।

নুরুল হুদা মির্জা

নুরুল হুদা মির্জা প্রবীন বামপন্থী রাজনীতিক। তার রচিত গ্রন্থটি হলো 'মার্কসবাদের অ-আ-ক-খ' (শ্রাবণ- ১৩৮১)। এই গ্রন্থে তিনি "ভাববাদ বনাম বস্তুবাদ" নামে একটি ক্ষুদ্র অধ্যায়ে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বস্তুর স্বাধীন

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

অস্তিত্বের বিষয়টি তুলে ধরে মায়াবাদ ও ভাববাদের বিরোধিতা করেন। নুরুল হুদা মির্জার মধ্যে সব কিছুকে বস্তু হিসেবে দেখবার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন তিনি বলেছেন, "গাছ পালা কীট পতঙ্গ, জীবজন্তু, মানুষ এই বস্তুর ভেতর পড়ে।"[১] তিনি তার দর্শন সম্পর্কিত এ রচনায় মার্কসীয় দর্শনের বিভিন্ন দিকও তুলে ধরেন,। মানব মন, বস্তুর গতিময়তা এসব বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন।

নুরুল কবীর

নুরুল কবীর এককালীন বামপন্থী ছাত্র নেতা। বর্তমানে সাংবাদিকতার সাথে জড়িত। তিনি 'গণতান্ত্রিক মুক্তি আন্দোলন: মানুষের সৃজনশীল উত্থান প্রসঙ্গে'[২] নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি গণতান্ত্রিক মুক্তি আন্দোলনের দার্শনিক তাৎপর্য মার্কসীয় দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। মানব প্রত্যয় সম্পর্কে মার্কসীয় অবস্থান, মানুষের সৃজনশীল উত্থানের প্রয়োজনীয়তা, ধর্মীয় মৌলবাদ - এ সকল বিষয়ে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের আলোকে আলোচনা সমালোচনা ও মার্কসীয় অবস্থান তুলে ধরেন। এ ছাড়াও মার্কসীয় অবস্থান থেকে তিনি নারীমুক্তির প্রসংগটি তুলে ধরেছেন তার উল্লেখিত গ্রন্থে।

ম. আখতারুজ্জামান

ম. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক। তিনি বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির এককালীন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। মার্কসবাদ ও মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে তিনি 'সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন: বর্তমান প্রেক্ষাপট' (১৯৯১) পুস্তিকায় আলোচনা করেছেন।

---

১. নুরুল হুদা মির্জা, মার্কসবাদের অ আ ক খ, দ্বিতীয় বর্ধিত সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৮১, চলন্তিকা বই ঘর, বাংলা বাজার, ঢাকা, পৃ. ১১।

২. নুরুল কবীর, গণতান্ত্রিক মুক্তি আন্দোলন, মানুষের সৃজনশীল উত্থাপন প্রসংগে, নদী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

ম. আখতারুজ্জামান প্রমান করার চেষ্টা করেন যে মার্কসবাদ কোন বিজ্ঞান নয়। মার্কসবাদের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও পদ্ধতি নেই। এ ক্ষেত্রে তিনি আরোহ পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে দেখাতে চেষ্টা করেন যে বিজ্ঞান অনুসৃত অরোহ পদ্ধতি মার্কসবাদের পদ্ধতি নয়। তাই মার্কসবাদের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও পদ্ধতি নেই। এ প্রসংগে তিনি বলেন, "(১) দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি মূলত দর্শনে ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে এর কোনো ব্যবহার নেই। (২) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যতটা নির্ভরযোগ্য ও কার্যকর, তেমনটা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে দেখা যায়নি, বরং অনেক ক্ষেত্রে তার বিপরীতটিই লক্ষ্য করা গেছে। সুতরাং দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সমকক্ষ তা প্রমানিত হয়নি। একথাও প্রমাণিত হয়নি যে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দ্বারা সমর্থিত। সুতরাং মার্কসবাদকে বস্তুবাদী বলা গেলেও বৈজ্ঞানিক মতবাদ বলাটা যুক্তিযুক্ত নয়।"[১] ম. আখতারুজ্জামান মার্কসীয় বস্তুর ধারণার সমালোচনা করে বলেন "বস্তুর যে ধারণা নিয়ে মার্কসীয় বস্তুবাদের তত্ত্ব রচিত, তা আর প্রচলিত নেই।"[২]

ম. আখতারুজ্জামান যেভাবে আরোহ পদ্ধতির অনুকল্প, পরীক্ষণ পর্যবেক্ষণ, তত্ত্ব, প্রাকৃতিক নিয়ম বা আইন, মতবাদ- অর্থাৎ আরোহ পদ্ধতির এসকল সুরের উল্লেখ পূর্বক যেমনিভাবে বিজ্ঞানকে দেখেছেন তাতে বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগীর প্রকাশ ঘটেছে। এভাবে দেখলে কেবলমাত্র প্রকৃতি বিজ্ঞান ব্যাতীত আর কিছুকেই বিজ্ঞান বলা যায় না। ব্যাপক অর্থে যে কোন নিয়মতান্ত্রিক, পদ্ধতিমূলক (Systematic) জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলা হয়। 'সমাজ বিজ্ঞান' কথাটি গৃহীত। ব্যাপকতর অর্থে সমাজ বিজ্ঞানও একটি বিজ্ঞান। মার্কসের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট ধারণাকে ইতিহাস বিজ্ঞান বলা হয়ে থাকে। কেননা তিনি ইতিহাস বিশ্লেষণের একটি বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির প্রবর্তন করেন তার ঐতিহাসিক বস্তুবাদে।

---

১. ম. আখতারুজ্জামান, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন: বর্তমান প্রেক্ষাপট, ৩৮, এইচ ঈসা খান রোড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১, পৃ. ২।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া বিজ্ঞানের পদ্ধতি নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। সাম্প্রতিককালের পদার্থ বিজ্ঞানের কোয়ান্টাম থিওরী কার্যকারণ নিয়মকে অস্বীকার করছে। কার্যকারণ নিয়মকে অস্বীকার করলে অনিবার্যতার প্রশ্ন থাকেনা। আবশ্যিকতা বা অনিবার্যতা না থাকলে বিজ্ঞান অসম্ভব হয়ে পড়ে। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা বিজ্ঞানের প্রচলিত আরোহমূলক কার্যকারণ নিয়মকে এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে নড়বড়ে করে দিয়েছে। বিজ্ঞানের অরোহ পদ্ধতি নিয়ে বিজ্ঞানের দার্শনিকেরা প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। কার্ল পপার অরোহ পদ্ধতির সমালোচনা করে একে সন্তোষজনক কোন পদ্ধতি বলে স্বীকার করেন নি। "তিনি দেখিয়েছিলেন আরোহী পদ্ধতি প্রয়োগ করতে গেলে এক অনুহীন পরম্পরার উদ্ভব হয়- যার সমাধান সম্ভব নয়, এবং পরিনামে সমাধান ব্যতিরেকেই একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়।"[১]

বিজ্ঞান দার্শনিক ফায়ারাবেন্ড বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কঠোর অনমনীয় পদ্ধতির তীব্র বিরোধিতা করেছেন। ফায়াবেন্ডের মতে,"বিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা, আসলে বিজ্ঞান তার থেকে অনেক ভিন্ন প্রকৃতির।"[২] বিজ্ঞানের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন ফায়ারাবেন্ড। তিনি মনে করেন বিজ্ঞানের কোন সন্তোষজনক ধরাবাধা পদ্ধতি নেই। তাঁর মতে বিজ্ঞান "... কি অনমনীয় ও কঠিন নিয়ম দিয়ে নির্ধারিত হওয়া উচিত? উত্তরে নিজেই জানালেন : এর উত্তর হবে একটা দৃঢ় ও প্রতিধ্বনিত 'না'।"[৩]

উপরের আলোচনা থেকে একথা বলা সম্ভব যে বিজ্ঞান সম্পর্কে ম. আখতারুজ্জামানের দৃষ্টিভংগী সংকীর্ণ ও ছক বাধা। বিজ্ঞান সম্পর্কে এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী থেকেই তিনি মার্কসবাদ ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বিজ্ঞান সম্মততা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তাছাড়া মার্কসবাদ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান কি বিজ্ঞান নয় এটা কোন মৌলিক ও জরুরী বিতর্ক নয়। তাই বলা যায় যে, ম. আখতারুজ্জামানের মার্কসবাদ সমালোচনার ভিত্তি হচ্ছে বিজ্ঞান সম্পর্কে তার সংকীর্ণ শাস্ত্রবদ্ধ জ্ঞান।

---

১. গালিব আহসান খান, 'বিজ্ঞান, পদ্ধতি ও প্রগতি', বিবিধ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ২৩।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

কাসেদ আলী

কাসেদ আলীর পিতৃপ্রদত্ত নাম কিউ.কিচ.এম. জহুর । কাসেদ আলী তার ছদ্ম নাম। কাসেদ আলী নামেই তিনি পরিচিত । চল্লিশের দশক থেকেই কাসেদ আলী উপমহাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে সম্পর্ক রাখতেন । তিনি একজন সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন । ১৯৬৭ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন । ১৯৯০ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সাম্যবাদী দলের সাথে যুক্ত ছিলেন । তার রচিত গ্রন্থগুলি হলো : (১) 'উপমহাদেশে শ্রেণী ও সমাজ' (২) 'জনগণতন্ত্র' (৩) 'সংস্কৃতি সিরিজ' । এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময় 'শিক্ষা' ও 'গণশক্তি' পত্রিকায় লিখেছেন । তিনি তাঁর 'সংস্কৃতি সিরিজ-১, এ মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন ।

শরীফ হারুন

শরীফ হারুন ঢাকার রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের যুক্তিবিদ্যার শিক্ষক । তিনি বিভিন্ন সময় মার্কসীয় দর্শন নিয়ে লিখেছেন । তাঁর রচিত গ্রন্থটি হল- (১) দর্শনের ইতিহাস এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (১৯৮২) । এছাড়াও তিনি বিভিন্ন গ্রন্থের অনুবাদক । তিনি তাঁর 'দর্শনের ইতিহাস এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ' গ্রন্থে মার্কসীয় দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সেই সাথে দর্শনের ইতিহাসের বস্তুবাদী দৃষ্টিকোন থেকে একটা আলোচনা করেছেন । তাঁর মতে, "আজকের বিচারে দর্শন সম্পর্কিত দৃষ্টিভংগির প্রশ্নে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ এবং ইতিহাস সম্পর্কিত দৃষ্টিভংগির ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ আয়ত্ত না করে, সত্যিকার অর্থে 'দর্শনের ইতিহাস' লেখা সম্ভব নয় ।"[১]

---

১. শরীফ হারুন, দর্শনের ইতিহাস এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, উচ্চারণ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. প্রসঙ্গ কথা ।

Dhaka University Institutional Repository

শরীফ হারুন দর্শনের ইতিহাসকে মার্কস প্রণীত সামাজিক সুর বিভাগের দিক থেকে ভাগ করেছেন। এভাবে তিনি দাস যুগে দর্শন, সামন্তযুগে দর্শন, পুঁজিবাদী যুগে দর্শন, সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ এবং পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের যুগে দর্শন – এইভাবে দর্শনের ইতিহাসকে চারটি যুগে ভাগ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর মতে "সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া হতে পুরোপুরি বিছিন্ন থেকে বা বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করে, দর্শনের ইতিহাস যেহেতু বিচার করা যায় না, সেহেতু তাকে বিচার করতে হবে সমাজ পরিবর্তনের বিভিন্ন সুর বিন্যাসের ভিত্তিতে মূলতঃ, দেশ বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে নয়।"[১]

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস দর্শনের ভিত্তি হিসেবে সামাজিক সত্তার কথা বললেও তাঁরা সামাজিক সুর দিয়ে দর্শনের ইতিহাসকে বিভক্ত করেন নি। গ্রীক দর্শন, চিরায়ত জার্মান দর্শন' ইত্যাদি দর্শনের ইতিহাসকে বিভক্ত করার প্রচলিত ক্যাটাগরি তাঁরা ব্যবহার করেছেন। দর্শনের ইতিহাসকে শরীফ হারুন যেভাবে ভাগ করেছেন তা এই আলোকে প্রশ্ন সাপেক্ষ। শরীফ হারুনের মধ্যে এক ধরণের সরলীকরণ লক্ষণীয়। যেমন তিনি বলেছেন, "... সমাজ ও বস্তুকে যেসব দার্শনিকেরা চিন্তা চেতনার চেয়ে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন, তাঁরাই কাজ করেছেন গতিশীলতার পক্ষে। এবং যারা চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়েছেন বস্তুর চেয়ে বেশী এবং তার ভিত্তিতে সমাজকে বিচার করেছেন, তারা স্বাভাবিক – ভাবেই সামাজিক বাস্তবতা ও পরিবর্তনকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।"[২] তাঁর বক্তব্য খুবই যান্ত্রিক। যেন মনে হয় বস্তুবাদীরা চিন্তাকে গুরুত্ব দেননা, কিংবা সবই যেন বস্তু। তিনি মনে করেন দর্শনের ইতিহাস বিচার করতে হবে সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে, সমাজে একটি বিশেষ দর্শন কোন শ্রেণীর পক্ষে তা দিয়ে, দর্শন কি সামাজিক পরিবর্তনের অনুরায় নাকি পক্ষে তা দিয়ে। এ প্রসংগে তিনি বলেছেন, "বিচার করতে হবে, বিশেষ সমাজে অবস্থানরত বিশেষ দার্শনিক বস্তুকে প্রাধান্য দিয়ে...।"[৩]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

এ কথার অর্থ দাড়ায় বিচারের মানদণ্ড হলো বস্তু । এ হলো এক অর্থহীন কথা । যার মধ্যে আঠারো শতকীয় যান্ত্রিক বস্তুবাদের প্রবনতা তীব্রভাবে লক্ষণীয় । এ মত সব কিছুকেই স্থূলভাবে বস্তুতে পর্যবসিত করতে চায় ।

শরীফ হারুনের মতে মার্কসীয় দর্শন মানবতাবাদী । তাঁর ভাষায়, "মার্কসীয় দর্শন আজকের যুগের বিচারে সবচেয়ে বেশী মানবতাবাদী । এবং যেসব দর্শন বিশেষভাবে মানবতাবাদী বলে গণ্য, তাদের মধ্যে বেশী যৌক্তিক । তাই তাকে বলা চলে যৌক্তিক মানবতাবাদ বা দার্শনিক মানবতাবাদ । আর, এ দার্শনিক মানবতাবাদের সাথে সাধারণ মানবতাবাদের যে মৌলিক পার্থক্য, তা হল যুক্তির উপস্থাপনার । অর্থাৎ সাধারণ মানবতাবাদ যদিও মানবকল্যাণের নিমিত্তে, তবুও এর মধ্যে রয়েছে যুক্তির চেয়ে আবেগের প্রাধান্য । তাই, মানবতাবাদী দর্শনকে যুক্তিপূর্ণ, সামঞ্জস্যপূর্ণ তথা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ও ফলপ্রসূ করার জন্য, একে দাঁড় করানো দরকার যুক্তির তথা দার্শনিক দৃষ্টিভংগির উপর । আর, আমার উপলব্ধির ভিত্তিতে তাই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদই দার্শনিক মানবতাবাদী দর্শন ।"[১]

মার্কস এঙ্গেলস নিজেদেরকে মানবতাবাদী দাবী করেননি । মার্কসবাদ প্রচলিত অর্থে মানবতাবাদ নয় । মানবতাবাদ হলো একটি বুর্জোয়া অবস্থান । মানবিকতা, মানবীয়তা আর মানবতাবাদ এক নয় । মার্কসের মানুষ সম্পর্কিত ধারণা প্রচন্ড মানবীয় । কিন্তু মানুষ থেকে মার্কস তার আলোচনা শুরু করেননি, নৈর্ব্যক্তিক বিষয়নিষ্ঠ উৎপাদন ও উৎপাদন সম্পর্ক থেকে মার্কস শুরু করেছিলেন । এ প্রসংগে মার্কস বলেন "... যা দিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু, তা হচ্ছে বস্তুগত উৎপাদন ।"[২] মার্কস উৎপাদন থেকে শুরু করেছেন । উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যদিয়ে মার্কস মানুষকে আবিস্কার করেতে চেয়েছেন, মানুষের মুক্তির দিশা খুঁজেছেন । কিন্তু মার্কসের লক্ষ্য ছিল মানুষ । মার্কসের মানুষ ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট কালপর্বে

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১ ।
২. কার্ল মার্কস, অর্থশাস্ত্র পর্যালোচনার একটি ভূমিকা, ফরহাদ মজহার অনূদিত, প্রতিপক্ষ প্রকাশনা, ১৩৮৯ বাংলা, পৃ. ৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদন সম্পর্কে সম্পর্কিত মানুষ । এই মানুষকে মার্কস দেখেছেন ইতিহাসের ফলশ্রুতি হিসেবে । মার্কসবাদের সাথে সাধারণ মানবতাবাদের পার্থক্য 'যুক্তির উপস্থাপনার' বলে যে দাবী করেছেন শরীফ হারুন, তা সঠিক বলে মনে হয় না । প্রচলিত মানবতাবাদের সাথে মার্কসের ধারণার কেবল যুক্তির নয়, মর্মগত বিরোধ রয়েছে । কেননা মার্কস শুরু করেছিলেন বস্তুগত উৎপাদন দিয়ে । উৎপাদন সম্পর্ক আবিষ্কারের মধ্যদিয়ে মানুষের শ্রেণী সম্পর্ক নির্ধারণ করে, শ্রেণী সংগ্রামের পথে তিনি মুক্তি খুঁজেছেন মানুষের । মানবতাবাদের ধারণা ফরাসী বিপ্লব ও পুঁজিতন্ত্রের উত্থানের সাথে জড়িত । পুঁজিবাদের বিমূর্ত মানুষের ধারণার সাথে সম্পর্কিত । শরীফ হারুন মানবতাবাদকে দাঁড় করাতে চেয়েছেন 'যুক্তির' উপর । কিন্তু মার্কস মানুষের ধারণা দাঁড় করিয়েছেন সমাজের বস্তুগত উৎপাদন ও উৎপাদন সম্পর্কের ওপর । তাই মার্কসের অবস্থান থেকে শরীফ হারুনের অবস্থানের পার্থক্য অনেক ।

শরীফ হারুন সমাজের এশমিক পরিবর্তনের কথা বলেছেন । তাঁর মতে,".. সমাজের মধ্যে পরস্পর বিরোধী শ্রেণীর বিরোধ বা দ্বন্দ্ব ও ঐক্যমূলক প্রক্রিয়াই সৃষ্টি করেছে সমাজ বিকাশের প্রেরণা এবং এ প্রেরণাই সুগম করেছে সমাজের এশমিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ও ধারা ।"[১] শরীফ হারুনের 'সমাজের এশমিক পরিবর্তনের' ধারণা জারউইনের এশমিক পরিবর্তনের ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । কিন্তু মার্কসীয় মতে পরিমানগত পরিবর্তনের বৃদ্ধির ফলে এক পর্যায়ে উলম্ফনের মাধ্যমে গুনগত পরিবর্তন ঘটে । শরীফ হারুনের সমাজের পরিবর্তনের ধারণার মধ্যে উলম্ফন নেই । তাই এ ধারণা মার্কসীয় পরিবর্তনের ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় । শরীফ হারুন বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চা সম্পর্কে মনে করেন যে, এদেশে "... মার্কসীয় দর্শনের প্রসার ঘটেনি, প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব হয়নি প্রয়োজনীয় সৃজনশীলতার ভিত্তিতে ।"[২]

---

১. শরীফ হারুন, দর্শনের ইতিহাস এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, পৃ. ৯৫ ।

২. শরীফ হারুন, "বাংলাদেশে দর্শনঃ সাম্প্রতিক ধারা" বাংলাদেশে দর্শন, শরীফ হারুন সম্পাদিত, উচ্চারণ, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ৮৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

শরীফ হারুন মার্কসীয় দর্শন নিয়ে লেখার পাশাপাশি সাধারণ পাশ্চাত্য দর্শন ও অন্যান্য দর্শনকে বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিকোন থেকে পর্যালোচনা করতে চেয়েছেন । কিন্তু তাঁর মধ্যে এক ধরণের সরলীকরণের প্রবনতা লক্ষ্য করা যায় । এছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মৌলিক অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে স্থূল যান্ত্রিক বস্তুবাদিতার পরিচয় দিয়েছেন ।

বাংলাদেশের সর্বহারা পার্টি (অস্থায়ী পরিচালনা কমিটি)

বাংলাদেশের সর্বহারা পার্টি 'মাওসেতুং চিন্তাধারার পর্যালোচনা' (১৯৮৩) নামক এক পুস্তকে মাওসেতুঙের দার্শনিক অবস্থানকে মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয় । এ পুস্তকে মাওসেতুঙের জ্ঞানতত্ত্বকে সমালোচনা করে তাকে অভিজ্ঞতাবাদী জ্ঞানতত্ত্ব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় । তাঁদের ভাষায়" জ্ঞান সম্পর্কিত মাও এর দৃষ্টিভংগী অভিজ্ঞতাবাদী ।"[১] এছাড়া এ দলের মতে জ্ঞান সম্পর্কিত মাওসেতুঙের ধারণা অনৈতিহাসিক ।

মাওসেতুঙ তার দ্বন্দ্বতত্ত্বে প্রধান দ্বন্দ্বের যে ধারণা দেন এই পুস্তিকায় তারও সমালোচনা করা হয় । তাদের মতে " যে সব প্রয়োজনীয় সম্পর্ক বা দ্বন্দ্ব মিলে প্রক্রিয়াটি গঠন করে তাদের মধ্যে একটা প্রধান ও একটা গৌণ হতে পারে না ।"[২] মাওসেতুঙ মনে করতেন যখন দ্বন্দ্বের প্রধান দিকের পরিবর্তন হয় তখন সেই বস্তুর প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে । মাওসেতুঙের এ ধারণার সমালোচনা করে বলা হয়, " কোন দ্বন্দ্বের এক দিক অপর দিকের পরিবর্তন হয় না । কোন দ্বন্দ্বের নিরসনে এর উভয় দিকের পরিবর্তন আবশ্যক । দ্বন্দ্ব একটি সম্পর্ক তা' নিরসন হলে তার দুই দিকের কোনটিরই অস্তিত্ব থাকবে না - তার জায়গায় নতুন দু'টি দিক নিয়ে নতুন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবে ।"[৩]

---

১. মাওসেতুঙ চিন্তাধারার পর্যালোচনা, বাংলাদেশের সর্বহারা পার্টি (অস্থায়ী পরিচালনা কমিটি) ১৯৮৩, পৃ. ২৫ ।

২. প্রাগুক্ত, ৪৩ ।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বহারা পার্টির এই পুস্তিকায় মাওসেতুঙকে মার্কসীয় দর্শনের কতগুলি দিককে অতি-সরলীকরণ ও বিকৃতি সাধনের জন্যে দায়ী করা হয়। দ্বন্দ্বকে মাওসেতুঙ মার্কসীয় অবস্থান থেকে উপস্থাপন করতে পারেন নি বলে মন্তব্য করা হয়।

সর্বহারা পার্টির 'মাওসেতুং চিন্তাধারা' গ্রন্থের মধ্যেও কিছু যান্ত্রিকতা ও স্থূলতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে "ইচ্ছা বস্তুগত নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত। সুতরাং মানুষের কার্যকলাপ বস্তুগত (objective)।"[১] এ বক্তব্য মানুষের স্বাধীন সৃজনশীল ভূমিকার অস্বীকৃতি রয়েছে এবং সব কিছুকে বস্তুতে পর্যবসিত করার প্রবনতা লক্ষণীয়।

আনোয়ার কবীর

বাংলাদেশের সর্বহারা পার্টি (অস্থায়ী পরিচালনা কমিটি) রচিত 'মাওসেতুঙ চিন্তাধারার পর্যালোচনা' (১৯৮৩) গ্রন্থে মাওসেতুঙের দার্শনিক অবস্থানের যে সমালোচনা করা হয় তার জবাবে 'মাওসেতুঙ চিন্তা ধারার সপক্ষে' (১৯৮৪) গ্রন্থে বাংলাদেশের সর্বহারা পার্টি (সর্বোচ্চ বিপ্লবী পরিষদ) নেতা আনোয়ার কবীর সে সব অভিযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করেন। আনোয়ার কবীরের মতে মাওসেতুঙ মার্কসীয় বস্তুবাদকে আরো বিকশিত করেছেন। তাঁর ভাষায় "মাও মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্বকে শুধু সঠিকভাবে ধারণ করে তাকে ব্যাখ্যাই যে করেছেন তাই নয়। তিনি তাকে বিকশিতও করেছেন। মানুষের জ্ঞান কীভাবে একেকটি পর্যায় অতিক্রম করে ক্রমাগত গভীর হতে থাকে এ বিষয়ে মাও তার ব্যাখ্যায় জ্ঞানতত্ত্বকে বিকশিত করেছেন।"[২] আনোয়ার কবীর মাওসেতুঙের প্রধান দ্বন্দ্বের ধারণাকে দ্বন্দ্ববাদের বিকাশ হিসাবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে, "কমরেড মাওসেতুঙ দ্বন্দ্ববাদের যে দিকগুলোতে বিকশিত করেছেন তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্রধান দ্বন্দ্বের বিষয়।"[৩] আনোয়ার কবীর তার বক্তব্যের মধ্যদিয়ে মাওসেতুঙকেই সমর্থন করতে চেয়েছেন।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
২. আনোয়ার কবীর, মাওসেতুঙ চিন্তাধারার সপক্ষে, নবদিগন্ত প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ.২৫।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

জিয়াউদ্দিন

জিয়াউদ্দিন বাংলাদেশের সর্বহারা পার্টির (অস্থায়ী পরিচালনা কমিটি) এককালীন নেতা ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থটি হল 'মাওসেতুঙ চিন্তা ধারার বিপক্ষে' (১৯৮৯)। বইটি আনোয়ার কবীর রচিত 'মাওসেতুঙ চিন্তা ধারার সপক্ষে'-র বিরুদ্ধে প্রতিউত্তর হিসেবে রচিত। জিয়াউদ্দিনের বক্তব্যের সাথে 'মাওসেতুং চিন্তাধারার পর্যালোচনা' নামক গ্রন্থে মাওসেতুঙ সম্পর্কে যে সকল সমালোচনা রয়েছে তার সাথে জিয়াউদ্দিনের বক্তব্যের মিল রয়েছে। জিয়াউদ্দিন মাওসেতুঙের সমালোচনা করে বলেন "মাওর নিকট সকল সম্পর্কই দ্বন্দ্ব, মার্কসবাদে দ্বন্দ্ব ও সম্পর্ক এক বিষয় নয়।"[১] তিনি মাওসেতুঙের সমালোচনা করে বলেন, "পরিমান মানগত পরিবর্তন থেকে গুনগত পরিবর্তন দ্বন্দ্ববাদের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট যা মাওবাদে স্বীকৃত নয়।"[২] জিয়াউদ্দিন মাওকে সমালোচনা করে আরো বলেন যে "দ্বন্দ্ববাদের বৈশিষ্টগুলো হচ্ছে বস্তুকে বিশ্লেষণ করার অতি সাধারণ গাইড। এসবকে একটা ফর্মুলায় রূপ দিতে চাওয়া ভুল। মাও তা করতে গিয়ে সমগ্র দ্বন্দ্ববাদকেই বিকৃত করেছেন।"[৩] জিয়াউদ্দিন মাওসেতুঙের বহু দ্বন্দ্ব ও প্রধান দ্বন্দ্বের ধারণার সমালোচনা করেন। তাঁর ভাষায় "স্থগতির অবস্থান থেকে যখন কোন সমাজকে দেখা হয় তখন সেখানে একাধিক দ্বন্দ্ব বিরাজ করেনা। উদাহরণ স্বরূপ... বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিকে স্থগতির অবস্থান থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় বিশ্ব সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যে একটি সংগ্রাম প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে অন্যান্য যত দ্বন্দ্ব রয়েছে সেগুলো সবই অন্যঃসম্পর্কিতভাবে একটি দ্বন্দ্ব গঠন করেছে। তাই এক্ষেত্রে প্রধান দ্বন্দ্ব ও গৌণ দ্বন্দ্বের কথাগুলো অপ্রযোজ্য।"[৪] জিয়াউদ্দিন মাওসেতুঙের দার্শনিক অবস্থানগুলির ত্রুটিসমূহ তুলে ধরতে চেয়েছে তার রচনায়।

---

১. জিয়াউদ্দিন, মাওসেতুঙ চিন্তা ধারার বিপক্ষে, চেতনা প্রোডাক্টস এণ্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ২১।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চার এই আলোচনা থেকে মার্কসীয় দর্শন চর্চাকারীদের সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে তাদের দু'ভাগে বিভক্ত করা যায় : ১. শিক্ষক-বুদ্ধিজীবি, ২. মার্কসবাদী রাজনীতিক ।

শিক্ষক বুদ্ধিজীবিদের মার্কসীয় দর্শন সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ রচনাই গবেষণামূলক জার্ণালে অথবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুস্তক পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছে । এসব জার্ণাল ও গবেষণামূল পত্রিকা সাধারণত সীমিত আকারে প্রকাশিত হয় এবং সীমিত সংখ্যক শিক্ষক বুদ্ধিজীবীরাই সাধারণত তা পাঠ করেন । এসব জার্ণাল ও গবেষণামূলক পত্রিকায় প্রকাশিত মার্কসীয় দর্শন সংশ্লিষ্ট রচনায় বোধের গভীরতা ও পর্যালোচনামূলক দৃষ্টিভংগী থাকলেও বাংলাদেশে ব্যাপক সাধারণ মার্কসবাদী মহলের কাছে তা সাধারণত অপঠিত এবং অপরিচিত । বাংলাদেশের বিভিন্ন মার্কসবাদী রাজনৈতিক দলের ব্যাপক কর্মীসদস্যরাই সাধারণত মার্কসবাদ চর্চার সাথে জড়িত । কিন্তু শিক্ষক বুদ্ধিজীবীদের মার্কসীয় দর্শন সংশ্লিষ্ট রচনাবলী অধিকাংশই তাদের অজ্ঞাতে থেকে যাবার কারণে শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের মার্কসীয় দর্শন সংশ্লিষ্ট রচনাবলীর তেমন কোন প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া মার্কসবাদী প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ব্যাপক মহলে নেই বলেই মনে হয় ।

অপরদিকে মার্কসবাদী রাজনীতিকরা মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে লিখেছেন । কিন্তু তাদের সংখ্যা একেবারেই কম, তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মার্কসবাদী প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাপক মহলে মার্কসবাদী রাজনীতিকদের সীমিত সংখ্যক রচনাই বহুল পঠিত ও পরিচিত । এসব মার্কসবাদী রাজনীতিকরা বিভিন সময় সরাসরি এদেশের মার্কসবাদী আন্দোলন ও সংগঠনের নেতৃত্বে থাকার কারণে তারা বিভিন্ন মার্কসবাদী দলের সদস্যদের কাছে পরিচিত ও গ্রহণীয় হওয়ায় মার্কসবাদী প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্টরা সাধারণত তাদের রচনাই পাঠ করে থাকেন । অনেক ক্ষেত্রে এসব রচনা পাঠ করার জন্যে দলীয় পাঠ্যক্রমে এসব বই তালিকাভুক্ত রয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

মার্কসবাদী দলগুলির বিভিন্ন দলীয় প্রশিক্ষণে এসব রচনা অনুসরণ করা হয় । এবং দলীয় উদ্যোগে এসব বইয়ের মুদ্রণ, পুনরমুদ্রণও দেশব্যাপী দলের মাধ্যমে প্রচার প্রসার ও পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে ।

বাংলাদেশের মার্কসবাদী রাজনীতিকদের যে সকল রচনাবলী মার্কসীয় দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সাধারণত পঠিত হয়ে আসছে তা হল ঃ

১. অনিল মুখার্জি, সাম্যবাদের ভূমিকা

২. হায়দার আকবর খান রনো, মার্কসবাদের প্রথম পাঠ

৩. আবদুল হালিম, ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ পরিচিতি

৪. নুরুল হুদা মির্জা, মার্কসবাদের অ আ ক খ

এ অধ্যায়ে উল্লেখিত এ সকল রচনাবলীর পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছে যে এসব রচনার মধ্যে স্থূল বস্তুবাদ, জড়বাদ, যান্ত্রিকতা, অতিসরলীকরণ ইত্যাদি নানাবিধ ধারা ও প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় । এসব রচনাবলী ব্যাপক মার্কসবাদী রাজনৈতিক কর্মী ও সাধারণের পাঠের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদী মহলে যে মার্কসীয় দর্শন চর্চা হয়ে আসছে, সে চর্চার মধ্যে এসব রচনাবলীর মধ্যে যে দার্শনিক ধারা ও প্রবণতা রয়েছে তার প্রতিফল ঘটেছে । এসব রচনা পঠন পাঠনের মধ্যদিয়ে মার্কসীয় বস্তুবাদ সম্পর্কে বাংলাদেশে যে ধারণা গড়ে ওঠেছে তা' মার্কসবাদের নামে স্থূল বস্তুবাদ । এই স্থূল বস্তুবাদই বাংলাদেশে মার্কসীয় বস্তুবাদ, 'মার্কসবাদ' হিসেবে সমধিক পরিচিত এবং বাংলাদেশের মার্কসীয় দর্শন চর্চায় প্রধান আধিপত্যশীল ধারা ।

Dhaka University Institutional Repository

৫. উপসংহার

বাংলাদেশে মার্কসীয় চিন্তা ও রাজনীতির বিকাশ এবং মার্কসীয় দর্শন চর্চার ইতিহাস সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায় সমূহে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বোক্ত অধ্যায় সমূহের আলোচনা ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে কতিপয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সিদ্ধান্ত সমূহকে প্রধানত চারটি ভাগে সিদ্ধান্তের প্রকরণ অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়েছে। সিদ্ধান্তের প্রকরণগুলি হলো :

১. বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চার প্রধান দার্শনিক ধারাসমূহ ;

২. বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চার কতিপয় প্রবণতা ;

৩. বাংলাদেশে মার্কসবাদী রাজনীতির ইতিহাস পর্যালোচনা থেকে কতিপয় দার্শনিক সিদ্ধান্ত, এবং

৪. বাংলাদেশে মার্কসীয় মানবতাবাদ প্রসঙ্গে।

সিদ্ধান্তের উপরোল্লিখিত প্রধান চারটি প্রকরণের অধীনে একাধিক সিদ্ধান্তকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিম্নে সামগ্রিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে উপনীত সিদ্ধান্ত-সমূহকে তুলে ধরা হল :

১. বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চার প্রধান দার্শনিক ধারাসমূহ

চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চা সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে সে ভিত্তিতে বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চার প্রধান দার্শনিক ধারাসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চার পর্যালোচনার মধ্যদিয়ে এদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চার বিভিন্ন ধারাসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চায় কয়েকটি ধারা বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চার প্রধানত তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। ধারাগুলো হল ঃ

ক ঃ বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চার নামে স্থূল বস্তুবাদ (Vulgar Materialism) বা যান্ত্রিক বস্তুবাদী একটি ধারা বিদ্যমান। এই স্থূল বস্তুবাদী ধারা সব কিছুকে বস্তুতে পর্যবসিত (Reduce) করতে চায়। সব কিছুকে বস্তুতে পর্যবসিত করার দৃষ্টিভংগী হলো আঠারো শতকের ফরাসী বস্তুবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা হলো স্থূল বস্তুবাদ। বাংলাদেশে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সম্পর্কে আলোচনাকালে আমরা দেখেছি যে অনেকের মধ্যেই সবকিছুকে বস্তুতে পর্যবসিত করার প্রবণতা বিরাজমান। স্থূল বস্তুবাদ হলো একটি বুর্জোয়া মতাদর্শ। মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুতান্ত্রিক দর্শন স্থূলবস্তুবাদ থেকে ভিন্ন, এবং স্থূল বস্তুবাদ থেকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের পার্থক্য অনেক। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন এই স্থূল বস্তুবাদের বিপক্ষে ছিলেন। সব কিছুকে বস্তুতে পর্যবসিত করে একটা সরল সূত্রে ফেলে ব্যাখ্যা করার যে প্রবণতা বাংলাদেশের মার্কসবাদীদের মধ্যে বেশ প্রবল তা আসলে স্থূল বস্তুবাদ, যা আদৌ মার্কসীয় বস্তুবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বাংলাদেশে এই স্থূল বস্তুবাদই মার্কসবাদ বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ হিসেবে সমধিক পরিচিত ও প্রচলিত। বাংলাদেশের মার্কসবাদী রাজনীতিতেও এই স্থূল বস্তুবাদিতার শক্তিশালী প্রভাব বিদ্যমান। স্থূল বস্তুবাদিতার রাজনৈতিক অভিপ্রকাশ হিসেবে বাংলাদেশের মার্কসীয় রাজনীতিতে অদৃষ্টবাদ, ঐতিহাসিক নির্ধারণবাদ, শাস্ত্রবদ্ধতা, যান্ত্রিকতা বিরাজমান এবং চিন্তারক্ষেত্রে রয়েছে সৃজনশীলতার দৈন্য। বাংলাদেশে মার্কসীয় বস্তুবাদের নামে প্রচলিত স্থূলবাদ এখানকার মার্কসবাদী সংগ্রামকে দুর্বল করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

খ. বাংলাদেশে মার্কসীয় বস্তুবাদের নামে একটি দ্বৈতবাদী ধারাও বিদ্যমান । দ্বৈত-বাদও একধরণের স্থূলবস্তুবাদ । দ্বৈতবাদীরা বস্তু ও চেতনার, বিষয় ও বিষয়ীর, মানুষ ও প্রকৃতিকে আলাদা করে, খণ্ডীকরণ করে । বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চাকারীদের মধ্যে একটা দ্বৈতবাদী প্রবণতা লক্ষ্যণীয় । এ ক্ষেত্রে অনেকেই বস্তু ও চেতনাকে, মানুষ ও প্রকৃতিকে দু'টি সত্তা, দু'টি জগৎ হিসেবে দেখেছেন । মার্ক-সীয় মতে প্রকৃতির অভ্যন্তর থেকেই মানুষের অভ্যুদয় । চিন্তা বস্তুর বিকাশের ফল । মানুষের পর্যায়ে এসে প্রকৃতি মানুষ হয়ে উঠছে । মানুষ চিন্তা করে, অতএব মানুষের পর্যায়ে প্রকৃতি চিন্তাশীল । এ পর্যায়ে প্রকৃতি বা বস্তুকে তার মানবীয়তা কিংবা চিন্তা-শীলতা থেকে পৃথক করা যায় না । এক্ষেত্রে মানুষ বা চিন্তাশীল প্রকৃতি হলো একই সাথে বস্তু ও চিন্তা । অতএব মানুষ একই সাথে বস্তু ও চিন্তা এবং বিষয় ও বিষয়ী । কিন্তু চিন্তার বিষয়গত ভিত্তি হলো প্রকৃতি বা বস্তু ।

বাংলাদেশে মানুষ ও প্রকৃতি, বস্তু ও চেতনাকে দ্বিখণ্ডিত করার যে প্রবণতা দেখা যায় তা মার্কসীয় নয় । মার্কসীয় দর্শন হলো বস্তুতান্ত্রিক একত্ববাদ । এই বস্তুবাদী একত্ববাদ মানুষ ও প্রকৃতি, বস্তু ও চৈতন্য, বিষয় ও বিষয়ীকে দ্বিখণ্ডিত করে না । তবে এ ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার তা হলো এই যে, জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রয়োজনে অনেক সময় বহির্জগৎ বা প্রকৃতির সাথে মানুষের একটা পার্থক্য করা হয় । এই পৃথকীকরণ কেবল কৃত্রিম ও জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রয়োজনে এবং বহির্জগৎকে অনুধাবনের লক্ষ্যেই । কিন্তু এই খণ্ডিকরণ প্রকৃত নয় ।

বাংলাদেশে কেউ কেউ মার্কসবাদের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের কথা বলেছেন । সমন্বয়-বাদীরাও দ্বৈতবাদী । কেননা দ্বৈত সত্তাকে স্বীকার করলেই কেবল সমন্বয়ের প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে ।

Dhaka University Institutional Repository

গ . বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চার অন্যতম আরেকটি ধারা হচ্ছে মার্কসীয় বস্তুতান্ত্রিক একত্ববাদী ধারা । এই ধারাটিই প্রকৃত মার্কসীয় ধারা । তবে এই ধারা বাংলাদেশে দুর্বল । এই ধারা স্থূলবস্তুবাদের মতো যেমন সব কিছুকে বস্তুতে পর্যবসিত করেনা, তেমনি মানুষ ও প্রকৃতির, বস্তু এবং চেতনার খণ্ডিকরণও করে না ।

২ . বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চার কতিপয় প্রবণতা

বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চার উপরোল্লেখিত তিনটি প্রধান ধারার বাইরেও বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চায় আরো কিছু প্রবণতা লক্ষ্যণীয় । চতুর্থ অধ্যায়ের পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রবণতাগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ঃ

ক ঃ বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চাকারী অনেকের মধ্যেই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে প্রকৃতি জগৎ ও সমাজ জীবনে 'সমভাবে' প্রযোজ্য বলে মনে করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রকৃতিজগৎ ও সমাজ সম প্রকৃতির নয় বলে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ এই উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য নয় । দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ প্রকৃতি ও সমাজ জীবনে উভয় ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য এমন দাবী মার্কস-এঙ্গেলসও করেন নি । 'সমভাবে প্রযোজ্য' বলে দেখাটা হলো অতিসরলীকরণ, এর মধ্যে একটি শ্রেণী বিভ্রান্তি (Categorical mistake) ঘটে, যান্ত্রিকভাবে সব কিছুকে একই শ্রেণীভুক্ত করা হয় । সামাজিক ঘটনাবলী এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সমধর্মী নয় । প্রাকৃতিক ঘটনাবলীতে অনিবার্যতার বিষয়টি অনেক বেশী মাত্রায় থাকে । কিন্তু সামাজিক ঘটনাবলীতে আপেক্ষিকতার মাত্রা বেশী । বাংলাদেশে মার্কসবাদীদের মধ্যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে প্রকৃতি ও সমাজে সমভাবে প্রযোজ্য বলে ধরে নেওয়ার কারণে সমাজ ভাবনায়, সামাজিক পরিবর্তনের প্রশ্নে এক-ধরণের অনিবার্যতার যান্ত্রিক অদৃষ্টবাদী, পূর্ব নির্ধারণবাদী প্রবণতাসহ বিভিন্ন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় । ফলে এদেশে মার্কসবাদের নামে প্রাকৃতিক নির্ধারণবাদের মতো করেই একটি ঐতিহাসিক নির্ধারণবাদ চলে আসছে ।

Dhaka University Institutional Repository

খ : বাংলাদেশে মার্কসবাদের নামে একটি সংকীর্ণ অর্থনীতিবাদী (Economism) নির্ধারণবাদী (Determinism) প্রবণতা রয়েছে । এবং এই ধারা বেশ শক্তিশালী। এই ধারা ইতিহাসে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা, চিন্তা ও মানবিক ক্রিয়াপরতার ভূমিকাকে অস্বীকার করে । এই ধারা চিন্তার স্বাধীনতাকে সামাজিক সত্তা দিয়ে যান্ত্রিকভাবে আষ্টে পৃষ্ঠে বেধে দেয় । ইতিহাসের পরিবর্তনকে বিষয়নিষ্ঠ নিয়মের অনিবার্যতায় পর্যবসিত করে ইতিহাসে মানবিক ক্রিয়াপরতা ও ইচ্ছার স্বাধীনতাকে পুরোপুরি নাকচ করে । মার্কসবাদ পূর্ব নির্ধারণবাদ বা সংকীর্ণ অর্থনীতিবাদ নয় । মার্কসের চিন্তার মধ্যে এক্ষেত্রে একটি দ্বান্দ্বিক সৃজনশীল পারস্পরিক অনন্যতা রয়েছে । সামাজিক সত্তা, ইতিহাস এবং মানবিক ক্রিয়াপরতা, চিন্তার মধ্যে পারস্পরিক দ্বান্দ্বিক সৃজনশীল মার্কসীয় ব্যাঞ্জনাকে উপলব্ধি না করতে পারায় বাংলাদেশে মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নামে এক ধরণের ঐতিহাসিক অদৃষ্টবাদ বা ঐতিহাসিক নির্ধারণবাদ চালু রয়েছে ।

গ : বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চাকারীদের মধ্যে অনেকেই 'বস্তুবাদ' 'বস্তু' শব্দগুলির পরিবর্তে 'জড়বাদ' 'জড়' কথাগুলি ব্যবহার করেছেন । এটা কেবল শব্দগত ব্যাপার নয় । এর মধ্যদিয়ে তাদের দার্শনিক অবস্থানও ব্যক্ত হয়েছে । 'বস্তু'কে জড় বললে তার মধ্যে আর প্রাণের উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না । মার্কসবাদীরা যেহেতু বস্তুর বা প্রকৃতির অভ্যন্তর থেকেই প্রাণের ও চৈতন্যের উৎপত্তির কথা বলেন তাই 'বস্তু' শব্দটিকে 'জড়' দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যায় না । জড় কথাটির সাথে আঠারো শতকের যান্ত্রিক বস্তুবাদী ধারণার সাযুজ্য রয়েছে । জড়ের ধারণার কারণেই ফরাসী বস্তুবাদসহ অন্যান্য বস্তুবাদ জড় দিয়ে প্রাণ, মন, মানুষকে ব্যাখ্যা করতে পারেনি । মার্কসবাদ হলো বস্তুবাদ, জড়বাদ নয় । বাংলাদেশের মার্কসবাদের নামে জড়বাদীরাও তাই মার্কসীয় বস্তুবাদী নয় ।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ : বাংলাদেশে মার্কসবাদীদের মধ্যে 'বস্তু' অভিধাটিকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি রয়েছে। অনেকেই এক্ষেত্রে পদার্থ বিদ্যায় প্রচলিত ডেকার্টের বিস্তৃতির ধারণার উপর নির্ভরশীল বস্তুর ধারণা দিয়ে বস্তুকে বুঝে থাকেন। আবার কেউ কেউ বস্তুকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা দিয়ে সংজ্ঞায়িত করেন। যার সাথে বার্কলির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভরতার সাদৃশ্য রয়েছে। এই উভয় ধারণা থেকে কেউ কেউ বস্তুর অ-বস্তুকরণের প্রশ্ন (De materialisation of matter) উত্থাপন করে মার্কসের বস্তুবাদকে নাকচ করতে চেয়েছেন। কিন্তু মার্কসীয় মতে মূল কথা হলো প্রকৃতির উপস্থিতি। প্রকৃতির উপস্থিতিই প্রকৃতির বাস্তবতা প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট। প্রকৃতি কি দিয়ে গঠিত তা প্রকৃতির বাস্তবতা বা উপস্থিতির প্রমাণের জন্যে অপ্রয়োজনীয়। তাই বস্তুর অ-বস্তুকরণের প্রসঙ্গও প্রকৃতি জগতের বাস্তবতা নাকচ করার ক্ষেত্রে অবান্তর।

ঙ : বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চাকারীদের মধ্যে যুক্তিশাস্ত্রের দিক থেকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে কম। তবুও এ ক্ষেত্রে দু'টি ধারা লক্ষণীয় : (১) একদল মনে করেন গতানুগতিক এরিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যার সাথে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বিরোধাত্মক। তাই তারা দ্বান্দ্বিক যুক্তিবিদ্যা নামে স্বতন্ত্র একটি যুক্তিবিদ্যার কথা বলেছেন। বাংলাদেশের অধিকাংশ মার্কসবাদীরা এই ধারার অনুসারী বলেই মনে হয়। (২) অপর দিকে কেউ কেউ মনে করেন এরিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সাথে বিরোধাত্মক নয়। এরিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যাকে স্বীকার করে নিয়েও গতি ও পরিবর্তনের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদসম্মত ব্যাখ্যা সম্ভব। এরা মনে করেন এরিস্টটলীয় চিন্তার নিয়মকে (Laws of thought) অস্বীকার করলে আমরা চিন্তার ক্ষেত্রে এক বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়তে বাধ্য। এই ধারার মতে যুক্তিবিদ্যা একটিই। দ্বান্দ্বিক যুক্তিবিদ্যা বলে কোন স্বতন্ত্র যুক্তিবিদ্যা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

চ: বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন নিয়ে যারা লিখেছেন তাদেরকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়- (১) শিক্ষক বুদ্ধিজীবি (২) রাজনীতিক। শিক্ষক বুদ্ধিজীবিদের রচনাবলী ব্যাপক মার্কসবাদী মহলে অপরিচিত এবং বহুল পঠিত নয়। বাংলাদেশের মার্কসীয় দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে মার্কসবাদী রাজনীতিকদের রচনাবলীই বহুল পঠিত। মার্কসবাদী রাজনীতিকদের মার্কসীয় দর্শন সংক্রান্ত রচনায় যে স্থূলবস্তুবাদিতা রয়েছে তা বাংলাদেশের মার্কসীয় দর্শন চর্চায় প্রধান হয়ে উঠেছে।

ছ: বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন সংক্রান্ত রচনাবলীর সংখ্যা যেমন কম তেমনি অধিকাংশ রচনাবলীর মধ্যে দ্বান্দ্বিক বস্তুতান্ত্রিক সঠিক বোধের দুর্বলতা ও অগভীরতা লক্ষ্যণীয়, তা অতি সরলীকরণ ও যান্ত্রিকতার দোষে দুষ্ট। অতিসরলীকরণে অনেক ক্ষেত্রেই মৌলিক ধারণার বিকৃতি ঘটেছে। এর কারণ হিসেবে মনে হয় এই যে, পাশ্চাত্য দর্শনের দীর্ঘ ইতিহাস আত্মস্থ না করেই, দর্শনের সমস্যাবলীর সাথে সম্যকভাবে পরিচিত না হয়েই মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে খণ্ডিত দার্শনিক বোধের কারণে সরলীকরণ ও বিকৃতি ঘটেছে। এছাড়াও অধিকাংশ রচনাবলীর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়নি বলে মনে হয়েছে।

৩. বাংলাদেশে মার্কসবাদী রাজনীতির ইতিহাস পর্যালোচনা থেকে কতিপয় দার্শনিক সিদ্ধান্ত

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশে মার্কসবাদী রাজনীতির ইতিহাস ও মার্কসীয় চিন্তার বিকাশ আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায় দু'টির পর্যালোচনার ভিত্তিতে রাজনৈতিক ইতিহাস ও মার্কসীয় চিন্তার বিকাশ এবং চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশে মার্কসীয় দর্শন চর্চার ইতিহাস পর্যালোচনায় থেকে যে সকল দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তা হলো:

ক: বাংলাদেশে মার্কসবাদ প্রধানত একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় হিসেবে গৃহীত ও চর্চা হয়েছে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ হিসেবে অর্থাৎ দর্শন হিসেবে মার্কসবাদ গ্রহণ ও চর্চা হয়েছে কম। এছাড়াও ধর্মীয়বোধ এখানে দ্বান্দ্বিক বস্তুতান্ত্রিক চিন্তার বিকাশকে ব্যাহত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

খ : মার্কসবাদের অন্যতম দিক হলো দর্শন, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ । কিন্তু বাংলাদেশের মার্কসবাদী রাজনীতিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মার্কসবাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক নিয়ে সক্রিয়তা দেখিয়েছেন । মার্কসীয় দর্শন তাঁদের কাছে তেমন প্রাধান্য লাভ করেনি । ফলশ্রুতিতে এখানকার মার্কসবাদী রাজনীতির মধ্যে দ্বান্দ্বিক বস্তুতান্ত্রিক বোধের দৈন্য রয়েছে । এতে করে বাংলাদেশের মার্কসবাদীদের মধ্যে স্থূলবস্তুবাদিতা, যান্ত্রিকতা, সরলীকরণ, স্বতঃস্ফূর্ততা, অদৃষ্টবাদিতা, নির্ধারণবাদীতা, অনুকরণীয়তা, শাস্ত্রবদ্ধতা প্রভৃতি নানা লক্ষণ দেখা যায় ।

গ : বাংলাদেশের মার্কসবাদীদের মধ্যে মার্কসবাদের নামে আধিপত্যশীল স্থূলবস্তুবাদী ধারণার কারণে তাঁদের চিন্তার পদ্ধতির মধ্যেও একটি স্থূল যান্ত্রিক প্রকরণ গড়ে উঠেছে । ফলে বাংলাদেশের মার্কসবাদী ধারার মধ্যে চিন্তা সৃজনশীল, পর্যালোচনামূলক ও চিন্তাশীল একটি শক্তিশালী ধারা হয়ে ওঠেনি বলে মনে হয় ।

৪. বাংলাদেশে মার্কসীয় মানবতাবাদ প্রসঙ্গে

পূর্বোক্ত অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা যায় বাংলাদেশে মার্কসবাদ হিসেবে একটি মানবতাবাদী ধারা বিদ্যমান । এই ধারা মার্কসবাদকে মানবতাবাদ হিসেবে বিধৃত করতে চায় । মানবতাবাদ মূলত পুঁজিতন্ত্রের আবির্ভাবের সাথে জড়িত একটি মতাদর্শ । ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়েই এই মানবতাবাদী মতাদর্শের বিকাশ ঘটেছিল । মার্কসবাদ প্রচলিত বুর্জোয়া মানবতাবাদ নয় । মার্কসবাদ ভিন্ন ধরণের মানবতাবাদ কিনা এ নিয়ে অবশ্য মার্কসবাদীদের মধ্যেও বিতর্ক রয়েছে । মানবীয়তা, মানবিকতা আর মানবতাবাদ এক কথা নয় । মার্কসের চিন্তার মধ্যে প্রচণ্ড মানবীয়তা বা মানবিকতা লক্ষণীয় । মার্কস শুরু করেছিলেন উৎপাদন ও উৎপাদন সম্পর্ক থেকে । কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল মানুষ । বাংলাদেশে মার্কসবাদ হিসেবে একটি মার্কসীয় মানব-

Dhaka University Institutional Repository

তাবাদীধারা মার্কসবাদীদের মধ্যে বেশ প্রভাবশালী ।

উপরোক্ত উপসংহারের ভিত্তিতে তিনটি চূড়ান্ত ও প্রধান সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি । সিদ্ধান্ত তিনটি হলো :

১. বাংলাদেশে মার্কসবাদ প্রধানত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ হিসেবে গৃহীত হয়েছে । মার্কসবাদ দর্শন হিসেবে গ্রহণ ও চর্চা হয়েছে কম ।

২। বাংলাদেশে মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ চর্চার ক্ষেত্রে স্থূল বস্তুবাদ, দ্বৈতবাদ, ও একত্ববাদ এই তিনটি ধারা বিদ্যমান । বাংলাদেশে মার্কসীয় বস্তুবাদ চর্চার নামে স্থূল বস্তুবাদ চর্চা হয়েছে বেশী । বাংলাদেশে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের নামে এই স্থূলবস্তুবাদই হলো প্রধান আধিপত্যশীল ধারা ।

৩. বাংলাদেশে মার্কসবাদের নামে স্থূল বস্তুবাদী ধারার প্রাধান্যের কারণে চিন্তার পদ্ধতির মধ্যেও একটি যান্ত্রিক প্রকরণ গড়ে ওঠেছে । ফলে বাংলাদেশের মার্কসীয় চর্চার মধ্যে স্থূল বস্তুবাদীতার প্রভাবে তার রাজনৈতিক প্রতিফলন হিসেবে মার্কসবাদী রাজনীতিতে ঐতিহাসিক নির্ধারণবাদ, অদৃষ্টবাদ, যান্ত্রিকতা, সরলীকরণ, শাস্ত্রবদ্ধতা, গোঁড়ামী, অনুকরণীয়তা প্রভৃতি নানাবিধ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় । ফলে বাংলাদেশের মার্কসবাদী ধারার মধ্যে চিন্তার সৃজনশীল পর্যালোচনামূলক, চিন্তাশীল ধারা শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি বলে মনে হয় ।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, বাংলাদেশে মার্কসবাদ ও মার্কসীয় দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে নানাবিধ ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও বাংলাদেশে মার্কসবাদ একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ধারা হিসেবে বিদ্যমান । বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে, শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামে মার্কসবাদ দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করতে পারে । বাংলাদেশের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বাস্তবতার সাথে মার্কসবাদের সৃজনশীল মিথস্ক্রিয়ার (Interaction) মধ্যে দিয়ে এ দেশে মার্কসবাদ সম্ভাবনাময় হয়ে উঠতে পারে বলে মনে হয় ।

****

Dhaka University Institutional Repository

Bibliography

Books

Ahmed, E., Bangladesh Politics, Centre for Social Studies, Dhaka, 1980

Ahmed, E.,(edited), Society and Politics in Bangladesh, Academic Publishers, Dhaka, 1989

Althusser, L., Lenin and Philosophy and other Essays, Trans. by Ben Brewster, Monthly Review Press, New york and London,1971

Althusser, L., For Marx, Trans by Ben Brewster, Penguin Books Ltd., Great Britain, 1969

Banerjee, S., India's Simmering Revolution, The Naxalite Uprising, Zeed Books Ltd., London, 1984

Bonar, J., Philosophy and Political Economy, London, George Allen & Unwin, New.york, Humanities Press, 1967

Chattopadhyaya, D. , Marxism and Indology, K.P.Baggchi & Company Calcutta, New Delhi, 1981

Dhaka University Institutional Repository

Descartes, R., Discourse on Method, Translated by Arthur Wollaston, The Penguin Classics, Penguin Books Ltd., Great Britain, 1964

Dev, G.C., Aspirations of the common Man, The University of Dacca, 1963

Dev. G.C., Idealism: A New Defence and a New Application, Dacca University, 1958

Edwards, P.,(editor in chief), The Encyclopedia of Philosophy, Macmillan Publishing Co ., Inc. The Free Press, Newyork, Collier Macmillan Publishers, Re printed edition,London, 1972

Engels, F., Dialectics of Nature, Progress Publishers Moscow, 1976

Femia, V.J., Gramci's Poitical Thought,Clarendon Press, Oxford, 1981

Franda, M., Bangladesh : The First Decade,South Asian Publishers Pvt. Ltd.,New Delhi, Madras, 1982

Frolov, I., Dictionary of Philosophy, Progress Publishers, Moscow, English Translation, 1984

Fromm, E., Socialist Humanism, Allen Lane, The Penguin Press, London, 1967

Dhaka University Institutional Repository

Ghose, S., Socialism and Communism in India, Allied Publishers, Calcutta, 1971

Gramsci, A., Slection From the Prison Note Books, Lawrence and wishart, London, 1982

Hegel, F.W.G., Science of Logic, Translated by W. H. Johnston, and L.G Struthers, Vol.one, London: Newyork, George Allen & Unwin Ltd., New york: The Macmillan Company,1961

Hegel, F.W.G., The Philosophy of History, William Benton publishers, Encyclopaedia of Britannica, Inc. 1952

Jahan, R., Bangladesh Politics: Problems and Issues, University Press, Bangladesh, 1980

Kant, I., Critique of pure Reason, Trans. by Norman Kemp Smith,London, Macmillan and Co., Ltd., 1964

Laushey,M.D., Bengal Terrorism and The Marxist Left, Firma K.L. Mukhupadhyay Calcutta,1975

Lenin, V.I., Materialism and Empirio-criticism, Foreign Languages press, Peking, 1976

Lukács G. , History and class consciousness, Marlin Press, London, 1971

Dhaka University Institutional Repository

Lukács G. — The ontology of Social Being, Tran. by David Fernbach, Merlin Press, London, 1978

Magill, N. F., — Master Pieces of world Philosophy, London: George Allen and Unwin Ltd., 1963

Maniruzzaman, T., — Radical Politics and the Emergence of Bangladesh, Bangladesh Books International Ltd., 1975

Maniruzzaman, T., — Bangladesh Revolution and its Aftermath, Bangladesh Books International Ltd., Dacca, 1980

Marcuse, H., — Soviet Marxism, London: Routledge and Kegan Paul, 1968

Marcuse, H., — Reason and Revolution, London: Routledge and Kegan Paul Ltd., 1955

Marx, K., — "The Holy Family" Karl Marx Frederick Engels collected works, Vol. 4, Progress Publishers, Moscow, 1975

Dhaka University Institutional Repository

Marx, K ., German Ideology, Progress Publishers, Moscow, 1975

Marx, K ., Karl Marx Frederick Engels Collected Works, Vol.I, Progress Publishers, Moscow, 1975

Marx, K ., Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, Progress Publishers, Moscow, 1977

Mikhailov, F.T., Riddle of the Self, Progress Publishers, Moscow, 1980

Mortimer, J.A., Aristotle for Everybody, Macmillan Publishing Co., Inc., Newyork, 1977

Popper, R.K., Objective Knowledge, Revised a Evolutionary Approach, Clarendon Press, Oxford, London, 1986

Russell, B., History of Western Philosophy, London, George Allen and Unwin, 1975

Schaff, A., "Marxist Dialectics and the Principle of contradiction" Readings on Logic, Irving M.Copi and James A.Gould edited, Macmillan Publishing co., Inc., Newyork, 1972

Sen Gupta, P., Naxalbari and Indian Revolution, Research India Publication, Calcutta,1983

Dhaka University Institutional Repository

Somerville, J., and Persons, L.H.,(edited) — Dialogues on the Philosophy of Marxism, Green wood Press, West Port, Connecticut, London, 1974

The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 2,Encyclopaedia Britannica, Inc.,U.S.A. 15th edition,1981

Thilly, F., — A History of Philosophy, India Central Book Depot Allahabad, India, 1965

Windmiller, M., and Oversteet,G.D., — Communism in India, University of Callifornia Press, Berkely and Los Angeles, 1958,

Wood, W. A., — Karl Marx, Routledge & Kegan Paul, London, Boston and Henley, 1981

Dhaka University Institutional Repository

Articles

Haq.A.F., "Constitution -Making in Bangladesh", Bangladesh Politics, Emajuddin Ahmed edited, Centre for social studies, Dhaka, 1980

Matin, A., "Humanism and the Future of Mankind", Philosophy and Progress, Inaugural Volume: July 1981, Dev centre for Philosophical Studies, Dacca University, Dacca, Bangladesh

Mia Abdul, J., "Marxist View of Religion" Second general Conference Bangladesh Darshan Samite, Rajshahi, March, 1975

Rashid, H.A.K.M., "Social Reality of Science" Bangladesh Journal of Philosophy, Vol. 2, November, 1986

Rashid, H.A.K.M, "Humanistic Approach in Sartre's Existentialism" The Rajshahi University Studies, part-A, XIII : 1985

Rashid, H.A.K.M., "Limits of Empiricism: The crisis of Modern Empiricism" Bangladesh Journal of Philosophy, Vol.1, December, 1985

Dhaka University Institutional Repository

Rashid, H.A.K.M., "The Problem of Alienation in Marxism", Philosophy and Progress, Dev centre for Philosophical studies, Dhaka University, Vol. Vii & VII, No:8, June-December, 1988,Dhaka.

Rashid, H.A.K.M, "The ontology of Man in Marxism", Dhaka University Studies, Part-A, Vol. 47, No.1, January, 1990, Dhaka.

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ পঞ্জী

গ্রন্থ

অনিল মুখার্জি, সাম্যবাদের ভূমিকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩

অমল সেন, কমিউনিষ্ট আন্দোলনে আদর্শগত বিতর্ক প্রসঙ্গে, ঢাকা, ১৯৮৫

আনোয়ার কবীর, মাওসেতুঙ চিন্তা ধারার সপক্ষে, নব দিগন্ত প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪

আবু মাহমুদ, মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

আবদুল মতীন, মুক্তির আলোকে, বুক সোসাইটি, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৭৫

আবদুল মতিন খান, দ্বন্দ্ব পরিমিতা, কৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮

আবদুল হালিম, ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ পরিচিতি, প্রকাশ ভবন, ঢাকা, ১৯৭৩

আবুল কাশেম ফজলুল হক, আমাদের সমাজের অভ্যন্তরে বিরাজিত দীর্ঘস্থায়ী সংকট নিরসনের লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব, ঢাকা, ১৯৮৮

আবুল কাশেম ফজলুল হক, মাওসেতুঙের জ্ঞান তত্ত্ব, অক্ষর, ঢাকা, ১৯৮৭

আবুল কাশেম ফজলুল হক, রাজনীতি ও দর্শন, লোকায়ত পাঠকেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮৯

আবু জাফর মোস্তফা সাদেক, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলন, চলন্তিকা বইঘর, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৮৭

আমিনুল ইসলাম, আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪

Dhaka University Institutional Repository

আলী হোসেন, মার্কসীয় দর্শন, ১৯৬ জগন্নাথ সাহা রোড, ঢাকা, ১৯৭৭

ওয়াকিল আহমদ সম্পাদিত, বাঙালী চিন্তাধারার আধুনিক যুগ, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯০

কো. আন্দ্রোনভা ও অন্যান্য, ভারত বর্ষের ইতিহাস, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৬

কল্যাণ সুন্দরম্, বাংলা সাহিত্যে বস্তুবাদের এক বিকাশ, কলিকাতা, ১৯৮৮

কার্ল মার্কস, পুঁজি, খণ্ড ১, অংশ ১ ও ২, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৮

কার্ল মার্কস, "ফ্রান্সের গৃহ যুদ্ধ", কার্ল মার্কস-ফ্রেডারিক এঙ্গেলস রচনা সংকলন, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৫

কার্ল মার্কস, "ফয়েরবাখ সম্বন্ধে থিসিস সমূহ", কার্ল মার্কস-ফ্রেডারিক এঙ্গেলস রচনা সংকলন, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২।

কার্ল মার্কস, "কমিউনিষ্ট পার্টির ইশতেহার", কার্ল মার্কস-ফ্রেডারিক এঙ্গেলস রচনা সংকলন, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২

কার্ল মার্কস, অর্থশাস্ত্র পর্যালোচনার একটি ভূমিকা, ফরহাদ মজহার অনূদিত, প্রতিপক্ষ প্রকাশনা, ঢাকা, ১৩৮৯ বাংলা

খোকা রায়, সংগ্রামের তিন দশক, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬

গেওর্গি প্লেখানভ, মার্কসবাদের মূল সমস্যা, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞান চক্রবর্তী, ঢাকা জেলার কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অতীত যুগ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭

গালিব আহসান খান, বিজ্ঞান, পদ্ধতি ও প্রগতি, বিবিধ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০

চিন্মোহন সেহানবীশ, রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৪৭৩

জে, ভি, ষ্ট্যালিন, দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, প্রকাশ ভবন, ঢাকা, ১৯৭৮

জগলুল আলম, বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনীতির গতিধারা, প্রতীক প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯০

জিয়াউদ্দিন, মাওসেতুঙ চিন্তাধারার বিপক্ষে, চেতনা পোডাক্টস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৯

দেবেন শিকদার, বাঙলাদেশে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সমস্যা, বুলবুল প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৮৮

মিতাই দাস, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৮৬

নির্মল সেন, লেনিন থেকে গরবাচেভ, ঢাকা, সন দেয়া নেই

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ১৯৮২

নরুল হুদা মির্জা, মার্কসবাদের অ আ ক খ, চলমিকা বইঘর, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৩৮১ বাংলা

নুরুল কবীর, গণতান্ত্রিক মুক্তি আন্দোলন: মানুষের সৃজনশীল উত্থান প্রসঙ্গে, নদী প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯১

Dhaka University Institutional Repository

নলিনী দাস, স্বাধীনতা সংগ্রামে দীপান্তরের বন্দী, প্রকাশ ভবন, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৭৫

ফ্রান্সিস বেকন, "নোভাম অর্গানম" বিজ্ঞানের দার্শনিক, স্যাকস কামিৎস ও রবার্ট এন লিনস্কট সম্পাদিত, সরদার ফজলুল করিম অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, "ল্যুদভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান", কার্ল মার্কস ফ্রেডারিক এঙ্গেলস রচনা সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, এন্টি ডুরিং, সরদার ফজলুল করিম অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, "ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র" কার্ল মার্কস ফ্রেডারিক এঙ্গেলস রচনা সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২

বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "সাম্য", বঙ্কিম রচনাবলী, শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৩৮৪ বাংলা

বদরুদ্দীন উমর, মার্কসীয় দর্শন ও সংস্কৃতি, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৬

বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, দ্বিতীয় খণ্ড, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৩৮২ বাংলা

বশীর আল হেলাল, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

Dhaka University Institutional Repository

ভ, ই, লেনিন, "কার্ল মার্কস", মার্কস-এঙ্গেলস-মার্কসবাদ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৬৯

ভ,ই, লেনিন, "করণীয় কী ?" ভ,ই, লেনিন নির্বাচিত রচনাবলী, খণ্ড-১, বারো খণ্ড, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৯

ভ্লাদিমির পুচকভ, বাংলাদেশের রাজনীতিক গতিধারা (১৯৭১-১৯৮৫), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮

ম, আখতারুজ্জামান, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন: বর্তমান প্রেক্ষাপট, ঢাকা, ১৯৯১

মাওসেতুঙ, মাওসেতুঙ, রচনাবলীর নির্ধারিত পাঠ, বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, পিকিং, ১৯৭৯

মার্কস-এঙ্গেলস, ধর্ম প্রসঙ্গে, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮১

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, মার্কসবাদ একটি জীবন্ত মতাদর্শ, মার্কসবাদ চর্চা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১

মুজফ্ফর আহমদ, আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, বাংলাদেশ সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৭৭

মুজফ্ফর আহমদ, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ, প্রতিপক্ষ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৮৯

মনিসিংহ, জীবন সংগ্রাম, প্রথম খণ্ড, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১

মনিসিংহ, জীবন সংগ্রাম, দ্বিতীয় খণ্ড, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

মরিস কর্ণফোর্থ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৭।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছিন্নপত্র, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৯৭৫

লরেন্স লিফশুলৎস, অসমাপ্ত বিপ্লব তাহেরের শেষ কথা, মনীর হোসেন অনূদিত, কর্ণেল তাহের সংসদ, ঢাকা, ১৯৮৮

শরীফ হারুন (সম্পাদিত), "বাংলাদেশে দর্শন সাম্প্রতিক ধারা" বাংলাদেশে দর্শন, উচ্চারণ, ঢাকা, ১৯৮১

শরীফ হারুন, দর্শনের ইতিহাস এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, উচ্চারণ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮২

শাহরিয়ার কবীর (সম্পাদিত), মওলানা ভাসানী, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৭

সাঈদ-উর রহমান, পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ভাষা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৩

সাঈদ-উর রহমান, পূর্ব বাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৩

সুকুমার মিত্র, ১৮৫৭ ও বাংলাদেশ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৬০

সুপ্রকাশ রায়, ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম, কথা ও কাহিনী, কলিকাতা, ১৯৮৩

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অমতিএবনু বৃত্ত, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৭

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আশির দশকে বাংলাদেশ, ভাষা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫

সুশোভন সরকার, প্রসঙ্গ ইতিহাস, নাভানা, পি ১০৩ পিন্সেপ স্ট্রীট, কলকাতা, ১৯৮৩

সৈয়দ আবুল মকসুদ, তাসানী, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, ১৯৮৬

হুমায়ুন আজাদ, ভাষা আন্দোলন, সাহিত্যিক পটভূমি, গ্রন্থমালা-৫, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯০

হাসান আজিজুল হক (সম্পাদিত), গোবিন্দ চন্দ্র দেব রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৯

হাসান উজ্জামান, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন, ভাষা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪

হায়দার আকবর খান রনো, মার্কসবাদের প্রথম পাঠ, গণসাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধ

আনিসুজ্জামান, "বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ" দর্শন, বাংলাদেশ দর্শন সমিতির মুখপত্র, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুন, ১৯৮৩

আবদুল হাই ঢালী, "বাংলাদেশে মার্কসবাদ : ইতিহাসের আলোকে একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন," বাংলাদেশ দর্শন পত্রিকা, ৪র্থ খণ্ড-১৯৮৮-৮৯, বাংলাদেশ দর্শন কংগ্রেস

আবদুল মতীন, "মার্কসবাদ ও দ্বান্দ্বিক যুক্তিবিদ্যা" মানববিদ্যা বক্তৃতা - ১৯৮৮, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

আমজাদ হোসেন, "বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন" সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ২১ নভেম্বর সংখ্যা, ১৯৮৬

এম,এম, আকাশ, "দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ" সমাজ নিরীক্ষণ, ৯/অক্টোবর, ১৯৮৩, সমাজ নিরীক্ষণ গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

এম,এম, আকাশ, "বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব - হেগেল ফয়েরবাখ এবং মার্কস," ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, উনবিংশ সংখ্যা, জুন, ১৯৮৪

ফরহাদ মজহার, "বস্তু = চৈতন্য বা মানুষ = প্রকৃতি : কতিপয় আপ্তবাক্য" অনিন্দ, পঞ্চম সংকলন, ঢাকা, তারিখ ও সন নেই।

ফরহাদ মজহার, "কাসেদ আলী কি ভাবতেন : ব্যক্তিগত আলাপের আলোকে একজন অগ্রজ কমিউনিস্টের রচনাবলীর প্রাথমিক পাঠ" চিন্তা, পাক্ষিক, ১৫ অক্টোবর, ১৯৯১

Dhaka University Institutional Repository

রংগলাল সেন, "মার্কসের মানব তত্ত্ব" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, দ্বাদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৮০

বদরুদ্দীন উমর, "বিশ্ব প্রতিবিপ্লবের দ্বিতীয় কেন্দ্র" সংস্কৃতি, সংখ্যা-২২, নভেম্বর, ১৯৮১

শিবনারায়ণ রায়, "মানবেন্দ্রনাথ রায়ঃ ভাবুক বিপ্লবীর জীবন চর্যা", শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ এম এন রায়, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা সম্পাদিত, পরিবর্তন প্রকাশনী সংস্থা, ঢাকা, ১৯৮৭

সুশোভন সরকার, "বাংলা সাময়িক পত্রে যুগ বিপ্লবের প্রথম দর্শক" প্রসঙ্গ ইতিহাস, মাভানা, পি ১০৩ প্রিন্সেপ স্ট্রীট, কলকাতা, ১৯৮৩

সৈয়দ হাসেমী, "মার্কসীয় দ্বান্দ্বিকতা ও অর্থনীতি", সমাজ নিরীক্ষণ, ৬/১৯৮২, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সৈয়দ হাসেমী, "তরুন মার্কস/পরিণত মার্কস' বিতর্ক", সমাজ নিরীক্ষণ, ১৭ আগষ্ট ১৯৮৫, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

হারুন রশীদ, "ধর্ম দর্শন ও বিজ্ঞানঃ মার্কসীয় দৃষ্টিভংগী", অন্বেষণ, ৩য় খন্ড, ৮ম বর্ষ, ১৯৮৭, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

হারুন রশীদ, "মার্কসীয় দৃষ্টিতে দর্শনের উৎপত্তি, স্বরূপ ও ক্রম-বিকাশের ধারা", ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ত্রিংশ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮

Dhaka University Institutional Repository

দলিলপত্র

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে রিপোর্ট, চতুর্থ কংগ্রেস, ঢাকা, ১৯৮৯

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস, সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম খানের স্বাগত ভাষণ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৩

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, খসড়া গঠনতন্ত্র, কেন্দ্রীয় কমিটি, পঞ্চম কংগ্রেস, অক্টোবর, ঢাকা, ১৯৯১

বাংলাদেশের সর্বহারা পার্টি (অস্থায়ী পরিচালনা কমিটি), মাওসেতুঙ চিন্তাধারার পর্যালোচনা, ১৯৮৩

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উত্থাপিত কতক বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের সুনির্দিষ্ট বিকল্প প্রস্তাবনা, ঢাকা, ১৯৯১

রাশেদ খান মেনন, সাধারণ সম্পাদকের রাজনৈতিক রিপোর্ট, (খসড়া), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, চতুর্থ কংগ্রেস, ঢাকা, ১৯৮৯

রাশেদ খান মেনন, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদকের প্রদত্ত বক্তব্য, কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলন, ৮ নভেম্বর, ঢাকা, ১৯৯১

Dhaka University Institutional Repository

বুলেটিন

নির্মল সেন, "সোভিয়েট ইউনিয়নে যা ঘটলো" সমাজবাদী, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের বুলেটিন, ২৯ আগষ্ট, ১৯৯১

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল, "মহান নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা আজও অম্লান", ভ্যানগার্ড, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বুলেটিন-৩৮ নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৯১

****

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

বাংলাদেশে বর্তমানে বামধারার ছাত্র সংগঠনসমূহ হলো :

১. বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন
২. বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রী
৩. সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট
৪. বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়ন
৫. বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন
৬. বাংলাদেশ ছাত্র লীগ (রহুল কুদ্দুস বাবু - আব্দুল কাইয়ুম)
৭. বাংলাদেশ ছাত্র লীগ (আব্দুস সাত্তার খান - গাজী শহীদুল্লাহ)
৮. জাতীয় ছাত্র দল
৯. ছাত্র ঐক্য ফোরাম (মোশরেফা মিশু)
১০. ছাত্র ঐক্য ফোরাম (আহমেদ ইকবাল খান)
১১. বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি
১২. গণতান্ত্রিক ছাত্র কেন্দ্র
১৩. বিপ্লবী ছাত্র সংঘ
১৪. জাতীয় ছাত্র আন্দোলন
১৫. বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন